চারপ্রহর

বিমল মিত্র

প্রকাশিকার নিবেদন

শ্রদ্ধেয় বিমল মিত্রের আকস্মিক প্রয়াণে আমি মর্মাহত। যাবার আগের দিনও কথা দিয়েছিলেন এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখবেন তিনি নিজেই। কিন্তু সে লেখার স্ব-ইচ্ছাবিরুদ্ধ অক্ষমতা যে তিনি এভাবে জানাবেন, তা কোন ক্রমেই অনুমান করতে পারিনি।

আমার সাথে তার শুধু প্রকাশিকার সম্পর্ক ছিল না, তাঁকে গুরুজন জ্ঞান করে তাঁর সমস্ত উপদেশকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি মাত্র। তিনিই এই বই এর চারটি নতুন উপন্যাসকে 'চারগ্রহর' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আশা করি পাঠক পাঠিকারা তার তাৎপর্য ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

অনেকদিন পরে সুলতানপুরে গেলাম। সেই সুলতানপুর! নাম বললে আপনারা কিছুই বুঝতে পারবেন না। বাঙলাদেশের যে-কোনও গ্রামের সঙ্গেই আপনারা সুলতানপুরের তুলনা করতে পারবেন। বাঙলাদেশের কোনও গ্রামে গেলেই যেমন দেখতে পাবেন হাড়-জিরজিরে ছেলের দল, দেখতে পাবেন ভুঁড়ি-পেট কিছু বেকার বুড়ো, কিম্বা ভাঙা একটা মন্দির, এই সুলতানপুরেও তাই। সুলতানপুরের সব কিছুরই দৈন্য-দশা।

তবু অনেকদিন পরে আবার সেই সুলতানপুরে গেলাম। যে বাড়িতে আমি আগে বহুদিন কাটিয়েছি সে বাড়িটার তখন আরো ভগ্নাবস্থা। বহুকাল ওখানে কেউ বাস করত না। গিয়ে দেখলাম বাড়িটার একটা ঘর তখনও খাড়া আছে।

গোলাম মোল্লা আমাদের পুরোণ প্রজা। বয়স হলেও তখন খুব শক্ত-সামর্থ্য আছে। সেই গোলামই আমার সব বন্দোবস্ত করে দিল। ঘরে ঝুল জমেছিল। তক্তপোষটার ওপর ধুলোর পাহাড় জমে উঠেছিল। বাড়িটার চারদিকে আশ্শ্যাওড়ার জঙ্গল কেটে সে একটা রাস্তা করে দিল

গোলাম জিজ্ঞেস করলে, আপনার খাওয়ার কী হবে ছোটবাবু?

আমি বললাম, তুমিই ডাল-ভাত দুটো ফুটিয়ে দাও—

গোলাম বললে, সে কি ছোটবাবু, আমি আপনার ডাল-ভাত ফুটিয়ে দেব?

বললাম, কেন, তাতে দোষ কি? আমি অত জাত-ফাত মানি না গোলাম।

গোলাম বললে, কিন্তু ধম্মো বলে তো একটা কথা আছে। আপনার ধম্মো গেলে পাপ হবে না?

বললাম, পাপ যদি হয় তো সে আমার পাপ হবে, তাতে তোমার কি?

গোলাম তবু রাজি হল না। সে কোথা থেকে এক বুড়ী বিধবাকে ডেকে তাকে দিয়েই রান্নার ব্যবস্থা করে দিলে। আমি তাকে টাকা দিলুম, সে চাল-ডাল-তেল-নুন-সবজি কিনে নিয়ে এলো। কিন্তু রান্না ছুঁলে না।

খবর পেয়ে একে একে অনেকে এলো। তাদের মুখে সব পুরোণ কালের কথা। আমার বাবা-ঠাকুর্দার আমলের পুরোণ ঐশ্বর্যের আর বিলাস-বৈভরের কাহিনী। আগে আমাদের বাড়িতে ঘোড়া ছিল. বাবা সেই ঘোড়ায় চড়ে কিভাবে মাঠের চাষ-বাস দেখতে যেতেন, আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে কী রকম গ্রামের মাতব্বরদের আড্ডা বসত. জাত-পাতের বিচার হত. সেই সব গল্প: বাবা এই চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে দু'ঘণ্টা ধরে গায়ে সরষের তেল মাখতেন, আর অশ্বিনী নাপিত পিছনে দাঁড়িয়ে তার মাথা টিপে দিত, গা-হাত টিপে দিত। আর এই যে বার-বাড়ির উঠোন, এখন যে-উঠোনে আশ্শাওড়া আর ভ্যারেণ্ডা গাছের জঙ্গল হয়েছে. এইখানে বাবা গোষ্ঠ কয়ালকে চাবুক মেরে ছিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, গোষ্ঠ কয়াল কে?

আজ্ঞে ছোটবাবু. গোষ্ঠ কয়াল হল গিয়ে শম্ভু কয়ালের ছেলে।

জিজ্ঞেস করলাম. গোষ্ঠ কয়াল কী করেছিল?

সে মুর্গী খেয়েছিল যে! হিন্দুর ছেলে মুর্গী খাবে এটা বড়বাবু কী করে সহ্য করবেন বলুন। বড়বাবু ছিল বলে তবু ছোটলোকরা একটু জব্দ ছিল তখন—

আমার বাবাকে সুলতানপুরের লোক বড়বাবু বলে ডাকত। বাবা ভোর বেলা উঠে মাঠে চলে যেতেন, যখন ফিরতেন তখন খাঁ খাঁ করত রোদ। পিছন পিছন গোলাম মোল্লা ফিরে আসত খালি গাড়ুটা হাতে করে। বাড়িতে এসে গোলাম মোল্লা মাটি দিয়ে ভালো করে মেজে গাড়ুটা পরিষ্কার করে রেখে দিত। পরের দিন আমার কর্তাবাবুর সঙ্গে সেটা মাঠে নিয়ে যেতে হবে তাকে।

তারপর তেল মাখার পালা। ভেতর বাড়ি থেকে সরষের তেল নিয়ে আসত গোলাম মোল্লা। প্রায় এক পোয়া তেল। বাবা চণ্ডী-মণ্ডপের ওপর একটা কাঠের পিঁড়িতে বাবু হয়ে বসতেন। আর গোলাম মোল্লা সেই সমস্ত তেলটা ঘষে ঘষে বাবার গায়ে মাখিয়ে দিতো।

কোন্ ঘরে—

রাজু মাতলার বউ হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

রাজুর বউয়ের কান্না শুনে বাবা ধমকে উঠলেন। বললেন, আবার শাঁকচুন্নির মতন নাকি-কান্না কাঁদছ! চুপ কর! বাড়িতে বসে কেবল কাঁদলেই চলবে! আমাকে একবার খবর দিতে পারলি নে তোরা? তোরা মানুষ না জানোয়ার, একটা লোক জ্বরে পড়ে কাতরাচ্ছে আর তোরা কিনা চুপ করে আছিস? কই, সে ব্যাটা কোথায়?

ঘরের ভেতরে রাজু মাতলা একটা খেজুর পাতার চাটাইয়ের ওপর অচৈতন্য হয়ে শুয়ে ছিল। বাবা সেখানে গিয়ে আবার ধমক দিলেন, এই ব্যাটা! কি হয়েছে তোর? ওঠ—

রাজু চোখ দুটো খুলল এতক্ষণে। চোখের সামনে বাবাকে যেন চিনতে পারলে। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

চোখের জল দেখে বাবা আরো ক্ষেপে গেলেন। বললেন, আবার কাঁদছিস হারামজাদা? জ্বর বাধিয়ে আবার কান্না? একটা খবর দিতে পারলিনে? আমি কি মরে গিয়েছিলুম?

রাজু মাতলার কানে বাবার গালাগালিগুলো গেল কিনা কে জানে। সে আরো কাঁদতে লাগল।

বাবা গোলাম মোল্লাকে ডাকলেন।

গোলাম মোল্লা আসতেই তাকে বললেন, এই, যা তো, একবার বিশ্বম্ভর কবিরাজকে ডাক তো। বল যেন সব কাজ ফেলে এক্ষুনি রাজু মাতলার বাড়িতে আসে—আমি এখানে অপেক্ষা করছি—

গোলাম দৌড়ে গেল বিশ্বম্ভর কবিরাজের বাড়িতে। বিশ্বম্ভর কবিরাজ তখন সুলতানপুরের নামজাদা কবিরাজ। আশে-পাশের দশখানা গ্রাম থেকে তার ডাক আসে। বাড়িতে সব সময়ই লোকের ভিড় লেগে থাকে। দূর থেকে একজন লোক এসেছিল তাকে তাদের গ্রামে নিয়ে যেতে। কবিরাজ মশাই তখন সে গ্রামে যাবার জন্য তৈরি। গাড়িতে উঠতে যাবে, এমন সময়ে গোলাম সেখানে গিয়ে হাজির।

বাবার নাম শুনে সব কাজ পড়ে রইল। সঙ্গে সঙ্গে রাজু মাতলার বাড়ি এসে হাজির। বাবাকে দেখে প্রণাম করলে, আমাকে ডেকেছেন কর্তা?

বাবা বললেন, এই দেখ কবিরাজ, ব্যাটা রাজুর কীর্তি। ব্যাটা জ্বর বাধিয়ে বসেছে আজ তিন দিন ধরে, ব্যাটা এমন হারামজাদা যে আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দেয়নি। ওর জ্বর হয়েছে, যত জ্বালা এখন আমার—

বিশ্বম্ভর কবিরাজ রাজুকে ভালো করে পরীক্ষা করে বললে, হুজুর এর কফাধিক্য হয়েছে, পাঁচন খাওয়াতে হবে—

বাবা বললেন, তা পাঁচন খাওয়াও তুমি।

বিশ্বম্ভর বললে, পাঁচন তৈরী করতে কিছু খরচ করতে হবে রাজুকে—

বাবা বললেন, রাজু কী করে খরচ করবে! খরচ করব আমি। তুমি খরচের কথা ভেবো না। ও ব্যাটার কি পয়সা আছে যে খরচ করবে? ওকে বেচলেও ওর পাঁচনের দাম উসুল হবে না। ও সব আমারই গচ্চা যাবে। তুমি বাড়িতে গিয়ে পাঁচন বানাও, পয়সার জন্যে ভেবো না। ওর জ্বর সারানো চাই, নইলে তোমার কবিরাজি ঘুচিয়ে দেব আমি। যাও—

বিশ্বম্ভর কবিরাজ উঠে দাঁড়াল। উঠে চলে যাচ্ছিল—

বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, চলে যাচ্ছ যে বড়? টাকা নেবে না?

থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বিশ্বম্ভর।

বাবা বললেন, এসো, আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে এসো—

বলে বাবা উঠলেন। উঠে বাড়ি এলেন। বিশ্বম্ভর কবিরাজও সঙ্গে সঙ্গে এলো। কবিরাজকে টাকা দিয়ে বললেন, রাজুর জ্বর যেন ছাড়া চাই। না ছাড়লে তুমি টের পাবে, হ্যাঁ—

কবিরাজকে টাকা দিয়ে বিদেয় করার পর হাত পা মুখ ধুয়ে আবার খেতে বসলেন। শুনেছি সেবার রাজুর অসুখ সারাতে বাবার সব সুদ্ধ একশো টাকার মতন খরচ হয়ে গিয়েছিল।

এ-সব ব্যাপার সুলতানপুরের সকলেরই শোনা। বিশেষ করে যাদের বয়েস হয়েছে তারা সবাই-ই জানে। এ ঘটনা যখন ঘটেছে তখন আমি ছোট ছিলাম। তখন আমিও গ্রামে থাকতাম।

আমাদের সুলতানপুরে তখন সভ্যতার খবর পৌঁছায়নি। আমরা থাকতাম পৃথিবীর জানালা-দরজা বন্ধ করে। পৃথিবীতে কি ঘটনা ঘটছে তা আমাদের কানে এসে পৌঁছত না।

একদিন এক ভদ্রলোক গ্রামে এলো। নতুন কেউ গ্রামে এলে তাকে প্রথমে আমাদের বাড়িতে আসতেই হত। এসে বাবার সঙ্গে দেখা করতে হত। ভদ্রলোকও এসে বাবাকে প্রণাম করলে।

বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মশাইয়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?

ভদ্রলোক বললে, কলকাতা থেকে—

এখানে আসার উদ্দেশ্য ?

ভদ্রলোক বললে, এখানে আমি একটা সভা করব, আপনাদের গ্রামে যেখানে হাট হয়, সেইখানে—

মশাইয়ের নাম ?

ভদ্রলোক বললে, বিনোদ মাইতি, আমরা জাতে মাহিষ্য।

বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, সভা কি নিয়ে হবে ?

বিনোদবাবু বললে, আমি স্বদেশী প্রচার করতে এসেছি—কংগ্রেস আমাকে পাঠিয়েছে।

—তার মানে ?

বিনোদবাবু বললে, তার মানে সভায় দাঁড়িয়ে গ্রামের লোককে আমি বিলিতি জিনিস ব্যবহার করতে বারণ করব। আমাদের দেশে বিলেতের ম্যানচেস্টার থেকে কাপড় আসে। আমাদের বাঙালী তাঁতীরা যে কাপড় তৈরী করে সে কাপড় কেউ পরে না। তারা উপোষ করে মরে। আর আমাদেব গরীব দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের পয়সা পরের দেশে চলে যায়। তাতে বিলেতের তাঁতীরা বড়লোক হয় আর আমাদের দেশেব গরীব লোকেরা আরো গরীব হয়ে যায়। এটা বন্ধ করতে হবে। এটা বন্ধ না হলে আমাদের সকলের ক্ষতি।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তা তুমি যে এসব কথা বলবে তাতে দেশের ইংরেজরা রেগে যাবে না ?

বিনোদবাবু বললে, তা তো রাগবেই !

রাগলে তখন তোমরা কি করবে ? ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে তোমরা পারবে ? ইংরেজদের গোবা সৈন্য-সামন্ত আছে, দারোগা-পুলিশ আছে, টাকা-পয়সা আছে। তারা যদি তোমাদের ধরে জেলে পোরে ?

বিনোদ বলল, তা তো পুরছেই। কলকাতার লোক বিলিতি কাপড় আগুনে পুড়িয়ে দিচ্ছিল দেখে ইংবেজদের পুলিশরা তাদের ধরে জেলে

পুরেছে। প্রায় দশ হাজার লোক এই জন্যে এখন জেল খাটছে। তবু তাতে কেউ ভয় পাচ্ছে না। গান্ধীজী বলেছেন···

বাবা বুঝতে পারলেন না। বললেন গান্ধীজী কে ?

বিনোদ বললে, আপনি গান্ধীজীর নাম শোনেননি ? সারা ভারতবর্ষের লোক নাম শুনেছে, আর আপনি তাঁর নাম শোনেননি ? তাঁকে আমরা মহাত্মা গান্ধী বলে ডাকি।

—কী করে সে ?

বিনোদ বলে, তিনি গুজরাটে থাকেন, বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে এসেছেন। কিন্তু ইংরেজদের আদালতে তিনি ব্যারিস্টারি করবেন না বলে এখন স্বদেশীর ডাক দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ. সুভাষচন্দ্র বোস, লাজপত্ রায়, গোখলে। দেশের সমস্ত বড় বড় লোক আছেন তাঁর সঙ্গে—

বাবা এঁদের কারোর নাম আগে শোনেননি। শুধু বাবা নন, আমাদের সুলতানপুরের কোন লোকই সে-সব নাম শোনেনি !

গ্রামে কোন নতুন লোক এলেই সেখানে মানুষের ভিড় হত। এমনিতে সুলতানপুরে সাধারণত কোন মনে রাখবার মতো ঘটনা ঘটত না। কারোর বাড়িতে কারো ছেলের কি মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্য হলেই তিন মাস আগে থেকে লোকেরা তাই নিয়ে আলোচনা করত। কাকে সে-বিয়েতে নেমন্তন্ন করা হল আর কাকে নেমন্তন্ন করা হল না, তাই নিয়েই সকলের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা চলত। তারপর আছে অন্নপ্রাশন কি উপনয়ন।

এই সব ঘটনা নিয়েই সুলতানপুরের লোক বিভোর হয়ে থাকত। পৃথিবীতে যে নিঃশব্দে কত বিরাট বিরাট ঘটনা রোজ ঘটে যাচ্ছে তার কোন খবর সুলতানপুরে পৌঁছত না। সুলতানপুরের লোক একমাত্র মাথা ঘামাত বৃষ্টি নিয়ে। যেবার চৈত্র মাসে একবারও বৃষ্টি হত না, সেবার মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে গিয়ে পূজো দিয়ে আসত মেয়েরা।

কিন্তু যদি বৈশাখ মাসেও বৃষ্টি না হত তো সুলতানপুরের লোকদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যেত। ধান বুনবে কি করে ? মানুষ খাবে কী করে ? এই-ই সকলের একমাত্র প্রশ্ন।

থালা থালা বাতাসা আর সন্দেশ নিয়ে মেয়েরা যেত পীরের দরজায়, আর বুড়ো শিবের মন্দিরে। তবুও কোন কোন বছরে বৃষ্টি

আসত না। তখন হত মুশকিল। এর পর যদি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বৃষ্টি না হত তো কান্নাকাটি পড়ে যেত। সুলতানপুরে এইটেই ছিল একমাত্র সমস্যা। বৃষ্টি হল কি হল না। চাষ-বাস হবে কি হবে না।

গ্রামের বারোয়ারিতলার মনোহর শার গাঁজা-আফিমের দোকান ছিল। বৃষ্টি যদি না হয় তো মনোহর শার দোকানে গাঁজা-আফিমের বিক্রি কমে যাবে। তার পকেটেও টান পড়বে। সুতরাং বৃষ্টির সঙ্গে মনোহর শার সম্পর্কও ছিল বড় ঘনিষ্ঠ।

আর ছিল শরৎ আড্ডির দেশী ভাঁটিখানা। দেশী মদের ব্যবসা করে শরৎ আড্ডি বেশ পয়সা কামিয়েছিল। শরৎ আড্ডির গলায় সোনার চেন ঝুলত। শরৎ আড্ডি ভোরবেলায় দোকানে এসে বসত আর তারপর যখন তার ছেলে ভুপেন এসে বসত তখন আড্ডির ছুটি। তখন শরৎ আড্ডি বাড়িতে খেতে যেত। চাষীদের মাঠে ফসল হলে শরৎ আড্ডির লাভ।

বৃষ্টি আসবে কিনা দেখবার জন্য শরৎ আড্ডি আকাশের দিকে চেয়ে দেখত। রাস্তা দিয়ে নিমাই যাচ্ছিল। শরৎ আড্ডি ডাকলে। বললে, ও নিমাই, কোথায় যাচ্ছ?

নিমাই শরৎ আড্ডির ডাক শুনে দাঁড়াল। বললে, আমাকে ডাকছেন আড্ডিমশাই?

শরৎ আড্ডি বললে, ক'দিন তোমার দেখা নেই কেন গো?

হাত তো এখন ফাঁকা আড্ডিমশাই, তাই আসতে পারিনি।

হঠাৎ হাত ফাঁকা হল কেন? অসুখ-বিসুখ হল নাকি?

আজ্ঞে না, বৃষ্টি হয়নি, ক্ষেত-খামারের কাজ বন্ধ।

সুলতানপুরের অনেক লোক ক্ষেত-খামারে কাজ করে দু-পয়সা কামাত। বৃষ্টি না হলে তাদেরও আকাল চলত। সন্ধ্যাবেলা খাটা-খাটুনির পর যে শরৎ আড্ডির দোকানে এসে একটু মৌজ করবে তারও উপায় নেই। বৃষ্টি না হলে যেমন রাজু মাতলাদের কেউ ডাকে না, তেমনি শরৎ আড্ডি কি মনোহর শারও অসুবিধে।

আবার এর ওপর যদি অতিবৃষ্টি হয় তো তাতেও সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসে। তখন অত কষ্টের ধান-পাট-সরষে-কলাই সব ডুবে যায়। তার সঙ্গে ডুবে যায় রাস্তা-ঘাট। বৃষ্টির সময়েই শরৎ আড্ডির দোকানে একটু কেনা-বেচা বাড়ে। তখন শরৎ আড্ডির দোকানের

সামনের দিকে এক কোণে এককড়ি তেলেভাজা ভাজতে বসে যেত।

এককড়ি সারা বছর ক্ষেত-মজুরের কাজ করে। তখন কিছু কামায়, তখন খোরাকিটাও সে পায় নিয়ম করে। কিন্তু বর্ষাকালে সে-সব কাজ বন্ধ। তখন তেলেভাজার দোকান দেয়। অনেক রাত পর্যন্ত তার দোকান খোলা থাকে। টিমটিমে একটা কেরোসিনের লম্ফর সামনে বসে সে বেগুনি, আলুর চপ, পেঁয়াজি ভাজে। যারা শরৎ আড্ডির দোকান থেকে বেরোয় তারা এককড়ির দোকানে গিয়ে উবু হয়ে বসে। এক-কড়ি তখন এক একটা করে তেলেভাজা ভাজে আর শালপাতার ওপর পরিবেশন করে।

দু'পয়সায় একটা আলুর চপ। তাও সবাই আপত্তি করে। বলে, দামটা বড্ড বেশি রেখেছ গো এককড়ি। এইটুকু টুকু আলুর চপ, তার দাম দু'পয়সা—

এককড়ি বলে, আলুর দামটা কী রকম বেড়েছে, তাই আগে বল। ভাবছি সামনের মাস থেকে আলুর চপ আরো ছোট করে দেব—

নিমাই বলে, তাহলে একেবারে ধনে-প্রাণে মরে যাব এককড়ি। মাঠে কাজ-কম্মো নেই, এই সময়ে তুমি কিনা আলুর চপটাও ছোট করে দেবে। তাহলে মাল খেয়ে সুখ কী বল তো?

এককড়ি বলে, আর তেল? তেলের দামটা কি রকম চড় চড় করে বাড়ছে, সেদিকে তোমাদের খেয়াল আছে? এত খেটে যদি পকেটে একটা পয়সাও না আসে তাহলে দোকান করে লাভটা কি? যদি দুটো পয়সা পকেটে না আসে তো ভূতের বেগার খাটতে যাব কেন? তোমরাই বল?

এরপর আর কারো আপত্তি করবার কিছু থাকে না। সবই মা মঙ্গলচণ্ডীর ইচ্ছে মনে করে সবাই তেলেভাজা চিবোতে থাকে। শরৎ আড্ডির মালের সঙ্গে গরম তেলেভাজা যেন অমৃত। তারপর যখন নেশায় সকলেব চোখ জড়িয়ে আসত, তখন একে একে সবাই টলতে টলতে বাড়ি চলে যেত।

এই-ই ছিল বলতে গেলে তখনকার দিনের সুলতানপুরের হাল-চাল।

কিন্তু সুলতানপুরের তখন আর একটা দিকও ছিল।

সেটা বাইরে থেকে তেমন দেখা না গেলেও ভেতরে ভেতরে বোঝা

যেত। গুণধর কর্মকারের ছেলে ভানু সদরের কলেজ থেকে পাশ করে বাড়িতে বসে ছিল। চাকরি-বাকরি পাওয়ার কোন আশাও ছিল না তার। সে সুলতানপুরের আরো কিছু বেকার ছেলের সঙ্গে বসে তাস খেলত।

গুণধর কর্মকার গরুর গাড়ির চাকা তৈরী করে কিছু পয়সা কামিয়ে ছিল। নিজের বাড়ির সামনে তার ছিল কারখানা। সে করাত দিয়ে কাঠ চেরাই করত। কিম্বা হাপরের সামনে বসে বিদে কাঠির দাঁত গুলো হাতুড়ি পিটিয়ে পিটিয়ে ধারালো করত। লাঙলের সামনে যে লোহার ফলা থাকে সেটা কিছুদিন জমি চাষ করার পর ভোঁতা হয়ে যায়। চাষীরা গুণধরের কাছে আসত সেই ফলাটা ধারালো করতে।

গুণধরকে অনেকদিন দেখেছি সে গণ্‌গণে গরম লোহার ওপরে হাতুড়ি পিটছে। তার কারখানার সামনে দিয়ে খেয়াঘাটে যাওয়ার রাস্তা।

যদি সমবয়েসী কেউ আসত তো তাকে গুণধর ডেকে বসাত। বলত, ও খুড়ো, কোথায় চলেছ ?

ষষ্ঠি দাস চাষী মানুষ। সামান্য কয়েক বিঘে জমির মালিক। বললে, যাচ্ছি ভাই একবার জুবরাজপুরে।

গুণধর জিজ্ঞেস করলে, জুবরাজপুরে ? জুবরাজপুরে তোমার কি কাজ ?

ষষ্ঠি দাস বললে, যাচ্ছি আমার মেয়েটার বিয়ের একটা সম্বন্ধ করতে। ওখানে গোবিন্দ পালের একটা বিয়ের যুগি্যি ছেলে আছে শুনেছি। দেখি, যদি রাজি হয় গোবিন্দ পাল—

গুণধর বললে, তা যাবে অখন। এখন তো বেলা বেশি বাড়েনি। একটু তামুক খেয়ে যাও।

তামাকের ব্যাপারে ষষ্ঠি দাসের দুর্বলতা ছিল। সেখানেই একটা চেলা কাঠের ঢিবির ওপর বসে পড়ল। বললে, বেশিক্ষণ বসব না গুণধর, এক কোশ রাস্তা যেতে—

গুণধর বললে, আরে, যাবে'খন। আমি কি তোমাকে আটকে রাখব ? আমারও তো হাতে অনেক কাজ আছে। সাজা তামাক ফেলতে নেই—

হাপরের সামনে কাঠের আগুন থাকেই। চিম্‌টে দিয়ে গোটা

কতক জ্বলন্ত কাঠের আগুনের ড্যালা তুলে নিয়ে কলকেতে দিলে। তারপর কল্‌কেতে ফুঁ দিতে দিতে বললে, তুমিই আগে ধরাও—

ষষ্ঠি দাস হুঁকো টানতে টানতে বললে, তোমার ছেলে এখন কি করছে হে ?

গুণধর বললে, ছেলে আর কী করবে, পাশ করে বসে আছে, আর সকাল-সন্ধ্যেয় তাস খেলছে—

তা এইবার তোমার কারবারে ঢুকিয়ে দাও। তুমি থাকতে থাকতে তোমার কাজটা হাতে কলমে শিখে নিক।

গুণধর বললে, আজকালকার ছেলেরা যদি বাপের কথা শুনবে আর কলিকাল বলেছে কেন ? সে ততক্ষণ বসে বসে বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলবে—

একজনের ছেলের অকর্মণ্যতার অভিযোগ আর একজনের মেয়ের বিয়ের অনিশ্চয়তা। দুজনেই দুঃখী। দুজনের দুঃখের কথা বলতে বলতেই কয়েক ছিলিম তামাক পুড়ে যায়। একজনের হাত থেকে হুঁকোটা আর একজনের হাতে যায়। হুঁকো হাত-ফেরতা হতে হতেই বেলা বাড়ে। তখন দুজনেরই খেয়াল হয় যে বেলা দুপুর হয়ে গেছে। তখন দুজনেরই হুঁশ হয় যে কাজ-কর্ম নষ্ট হয়ে গেল। তখন দুজনেই ওঠে। গুণধর বাড়ির ভেতরে যায় খাওয়া-দাওয়া করতে। আর ষষ্ঠি দাস বাড়ির দিকে যায়। বলে, আজ আর দুবরাজপুরে যাওয়া হল না, পরে একদিন যাব—

সুলতানপুর ছোট গ্রাম। ছোট গ্রাম বলে কিন্তু সুলতানপুরের মানুষের সমস্যাগুলো ছোট নয়। বৃষ্টি না হলে তারা যেমন সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে, তেমনি বেশি বৃষ্টি হলেও আবার সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে। মনোহর শা'র দোকানে তখন নেশাখোরের ভিড় কমে যায়, শরৎ আড্ডির মদের দোকানেও আর তেমন খদ্দের-পাতি থাকে না। নেশার জিনিস। একেবারে যে বিক্রি হয় না তা নয়। বিক্রি ঠিকই হয়, কিন্তু খদ্দের কমে যায়। নিমাইয়ের তেলেভাজার দোকানে তখন আর তেমন ভিড় জমে না। রাজু মাতলা আমাদের বাড়ি এসে বাবার কাছে বসে। তার সঙ্গে বাবার চাষ-বাসের কথা হয়। আর গোলাম মোল্লা বাবাকে তেল মাখায়। বাবা তেল মাখতে মাখতে বলেন, এবার পশ্চিমের জমিতে ছোলা বুনব, জানিস রাজু—

রাজু বলে, খুব ভালো হবে হুঁজুর, ও জমিতে ছোলা খুব ভালো হবে—

যেদিন বিনোদ মাইতি সুলতানপুরে এলো সেদিন বাবা তেল মাখছিলেন।

বললেন, সভা কর তুমি, আমি যাব তোমার সভা শুনতে—

বিনোদ মাইতি বলে, আপনি গেলে তো ভালোই হয়। আমি একটু সাহস পাই—

বাবা বলেন, তুমি ভালো ভালো কথা বলবে আর আমি শুনব না?

বিনোদ মাইতি বলে, তাহলে আপনি যদি গ্রামের পাঁচজনকে বলে দেন তাহলে খুব ভালো হয়।

বাবা বলেন, নিশ্চয়ই বলে দেব। বলে গেলাম মোল্লাকে বলেন, এই গোলাম, তুই সকলকে খবর দিয়ে আয় তো যে আজকে বিকেলে বারোয়ারিতলায় সভা হবে, সবাই যেন সেখানে হাজির থাকে।

গোলাম মোল্লা জিজ্ঞেস করলে, কাকে কাকে খবর দেব?

বাবা বললেন, সবাইকে। ওই মনোহর শা, শরৎ আড্ডি, গুণধর কর্মকার, শম্ভু কয়াল। আর বিশ্বম্ভর কবিরাজ মশাইকেও বলবি। যাকে সামনে পাবি তাকেই বলবি। বলবি আমিও থাকব সভায়।

গোলাম মোল্লা তখন বাবাকে চান করাতে বসল। বার-বাড়ির কুয়ো থেকে জল তুলে সে বাবার মাথায় জল ঢালতে লাগল। এ তার প্রত্যেক দিনের কাজ। চান করে উঠে বাবা তামাক খেতে বসবেন। সে তামাকও গোলাম মোল্লা সেজে দেবে। তামাক সেজে দেবে। তামাক খেয়ে তিনি কাপড় বদলে অন্দর-বাড়িতে ভাত খেতে যাবেন।

বাবাকে তামাক সেজে দিয়েই গোলাম মোল্লা বেরোল। সবাইকে বলে এলো মিটিং-এর কথা। প্রথমে গেল মনোহর শার দোকানে, তারপর শরৎ আড্ডির আড্ডায়। তারপর খেয়াঘাটে যাবার পথে গুণধর কর্মকারের কারখানায় তারপর বিশ্বম্ভর কবিরাজের ডাক্তারখানায়।

সবাই জিজ্ঞেস করলে, কীসের সভা হবে?

—আজ্ঞে স্বদেশী-সভা। দেশের ভালোর জন্য বিনোদ মাইতি মশাই বলবেন।

তারা জিজ্ঞেস করলেন, বিনোদ মাইতি কে?

গোলাম মোল্লা বললে, তিনি কলকাতা থেকে এসেছেন। বড়বাবু

বলেছেন তিনিও সভায় থাকবেন। আপনারা যাবেন কিন্তু—

সবাই-ই কথা দিলে যে যাবে।

খবরটা পৌঁছে গেল ভানু কর্মকারদের তাসের আড্ডাতেও। ভানু কর্মকার বেকার, কিন্তু পাশ করা ছেলে। সারাদিন ধুতিতে ফেরতা মেরে তেড়ি বাগিয়ে ঘুরে বেড়ায় বন্ধু-বান্ধব নিয়ে। কোন কিছু কাজ না থাকলে বারোয়ারিতলায় এসে বসে। একটা বাঁশের মাচা করা আছে সকলের জন্য। খালি থাকলে যে কেউ এসে বসে সেখানে। দিন আর কারো কাটতে চায় না। তারাপদকে দেখে ভানু বলে, কী রে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

তারাপদ বলে, গঞ্জে যেতে হয়েছিল—

ভানু জিজ্ঞেস করে, গঞ্জে কী করতে?

—মাছ কিনতে।

হঠাৎ মাছ কেন রে? কেউ এসেছে নাকি বাড়িতে?

তারাপদ বলে, জামাইবাবু আসবার কথা আছে সন্ধ্যেবেলা। বাবা তাই গঞ্জে পাঠালে আমাকে—

গোলাম মোল্লা ভানু আর তারাপদকে মাচার ওপর বসে থাকতে দেখে বললে, আপনারাও সভায় আসবেন কিন্তু—

ভানু বুঝতে পারলো না। জিজ্ঞেস করলে, কিসের সভা?

গোলাম মোল্লা বললে, আমাকে বড়বাবু খবর দিতে বলেছেন সবাইকে। গঞ্জ থেকে লোক এসেছে সুলতানপুরে। বিনোদ মাইতি মশাই। তিনি আজ এই বারোয়ারিতলায় বিকেলবেলায় সভা করবেন।

কেন, কেন সভা করবেন?

তা জানিনে। দেশের অবস্থার কথা বুঝিয়ে বলবেন সবাইকে। আমাকে বড়বাবু সবাই খবর দিতে পাঠিয়েছেন। আপনাদের বাড়িতে গিয়ে গুণধর খুড়োমশাইকে বলে এসেছি, তিনিও আসবেন।

তারাপদ বললে, কিন্তু আমরা কি করে আসব? আমাদের যে তাস খেলা আছে ঐ সময়—

একটা দিনের জন্যে তাস না-ই বা খেললেন।

ভানু বললে, আরে তাস খেলা কি বন্ধ রাখা যায়।

গোলাম মোল্লা বললে, একটুখানি সভায় নাম মাত্তোর এসে তারপর না হয় তাস খেলতে যাবেন—

সেদিন সুলতানপুর গ্রামের সমস্ত লোকই জেনে গেল যে বড়বাবুর হুকুমে সকলকে বিকেলবেলায় বারোয়ারিতলায় যে সভা হবে তাতে আসতে হবে।

বারোয়ারিতলাটা সুলতানপুর গ্রামের একেবারে কেন্দ্র বললে ঠিক বলা হয়। উত্তর থেকে দক্ষিণে কিম্বা পূব থেকে পশ্চিমে যেতে গেলে ওই বারোয়ারিতলায় আসতেই হবে। যাত্রা বল, পাঁচালি বল, হাট-বাজারই বল সব কিছু হয় ওই বারোয়ারিতলায়। শনিবার সুলতানপুরে যে হাট বসে তা ওই বারোয়ারিতলাতেই। সেদিন ওই হাটে কেনা-বেচা করতে নানান্ গ্রাম থেকে লোক আসে। যার ক্ষেতে যা হয় তাই এনে তারা হাজির করে বারোয়ারিতলায়।

কিন্তু ওই শুধু শনিবারটাই। সন্ধ্যের পর বারোয়ারিতলা আবার খাঁ খাঁ করে। তখন চারপাশে যে ক'টা দোকান আছে তারও ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। তখন অন্ধকারের আড়ালে কেউ কেউ ঢোকে শরৎ আড্ডির শুঁড়িখানায়, আবার কেউ কেউ ঢোকে মনোহর শার গাঁজা আফিমের দোকানে। শরৎ আড্ডির দোকানের সামনের সদর দরজা বন্ধ হয়ে যায় বটে, কিন্তু খোলা থাকে পিছনের দরজা দিয়ে গিয়ে বোতল কিনে নেয়। শরৎ আড্ডি কাউকে বঞ্চিত করে না। তারপর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সবটুকু খেয়ে নিয়ে নিমাইয়ের তেলেভাজার দোকানে এসে বসে। শালপাতার ঠোঙায় গরম গরম তেলেভাজা চিবিয়ে খেতে খেতে টলতে টলতে বাড়ি যায়।

এই পরিস্থিতিতেই সুলতানপুরে এসে হাজির হল বিনোদ মাইতি।

গঞ্জের বাজারে আগে একদিন মিটিং হয়ে গেছে। সেখানে বিলিতি কাপড় পোড়ানো হয়েছে। পুলিশ এসে হামলা করেছে। সে খবর সুলতানপুরে এসে পৌঁছায়নি।

বিনোদ মাইতি একলা নয়, তার সঙ্গে আরো দু-তিনজন এসে হাজির হল সুলতানপুরের বারোয়ারিতলায়।

বারোয়ারিতলায় একটা পাঠশালা আছে বহু দিনের। সরকারের পক্ষ থেকে পণ্ডিত মশাইয়ের মাইনে আসে মাসে পাঁচ টাকা। সেই পাঁচ টাকাতেই পণ্ডিত মশাইয়ের ভাত কাপড়ের সমস্যা মিটে যেত।

মিটিংয়ের দিন পাঠশালার একটা চেয়ার ও দুটো বেঞ্চি এনে রাখা হল বারোয়ারি বটগাছের তলায়। আস্তে আস্তে লোক জমতে লাগল।

বাবা গিয়ে বসলেন একটা বেঞ্চিতে। বিনোদ মাইতি বাবাকে বললে, আপনি একটু আমাদের কথা বলে দিন কর্তাবাবু।

বাবা বললেন, আমি কি বলব বল— ?

বিনোদ মাইতি বললে, আপনি বলুন আমার নাম করে। বলবেন, আমরা দেশের লোকেদের ভালো ভালো কথা শোনাতে এসেছি, যাতে দেশের মানুষের অবস্থা ফিরে যায় তাই বলতে এসেছি—আর বলবেন যেন কেউ বিলিতি কাপড় জামা না কেনে—

বাবা উঠলেন। উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, আজ সুলতানপুরের ইতিহাসে এক শুভ দিন। তোমরা যারা এখানে এসে হাজির হয়েছ, তারা সবাই শোন। এতদিন তোমরা এই বারোয়ারি-তলায় যাত্রা শুনেছ, কবির লড়াই শুনেছ, হাফ আখড়াই শুনেছ, কিন্তু স্বদেশীর কথা শোননি। আমাদের সুলতানপুরের এই বারোয়ারিতলায় এবার কলকাতা থেকে তোমাদের কাছে একজন এসেছে যার নাম বিনোদ মাইতি। এই যে আমার পাশে বসে আছে। এই ছেলেটি আমার কাছেই প্রথম আসে, এসে আমার অনুমতি চায়। আমি একে বক্তৃতা করবার অনুমতি দিয়েছি। এ যা বলবে তা তোমরা মন দিয়ে শোন। আমি আর কিছু বলব না। এবার তোমরা ওর কথা শোন —বলে বাবা বসে পড়েন। সবাই হাততালি দিলে একসঙ্গে।

হাততালি দেওয়া শেষ হলে বিনোদ মাইতি মশাই উঠে দাঁড়াল।

বিনোদ মাইতির গলাটা খুব মিষ্টি। সেই মিষ্টি গলায় বিনোদ মাইতি বলতে আরম্ভ করলে—

ভাই সব, আমি কলকাতা থেকে এই সুলতানপুরের মানুষদের কাছে কিছু বলতে এসেছি। আমি এখানে আসবার আগে আরো অনেক গ্রামে গিয়েছি। সেখানেও তাদের আমি অনেক কথা বলে এসেছি। আজ সুলতানপুরের লোকদেরও সেইসব কথা শোনাতে চাই। আচ্ছা ভাই, একটা কথা তোমাদের জিজ্ঞেস করি—তোমরা যে দেশে বাস কর এ দেশ কি তোমাদের ?

সামনের কিছু কিছু লোক, বললে, হ্যাঁ, এ দেশ আমাদের—

তা এ-দেশ যদি তোমাদের হয় তাহলে এ দেশের রাজা কে ?

সবাই বললে, ইংরেজ।

বিনোদ মাইতি বললে, ঠিক বলেছ তোমরা। কিন্তু এ দেশ যদি

তোমাদের হয় তাহলে তোমাদের মধ্যেই একজন রাজা হওয়া উচিত। অথচ তোমাদের রাজা হল ইংরেজ! সেই ইংরেজ রাজা কোথায় থাকে?

উত্তরটা কেউ জানত না।

বাবা মনোহর শার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী গো মনোহর, তুমি চুপ করে রইলে কেন, জবাব দাও আমাদের ইংরেজ রাজা কোথায় থাকে?

মনোহর শা কী বলবে বুঝতে পারলে না। মনোহর শা গাঁজা-আফিমের দোকান করে আর ইউনিয়ন বোর্ডে দরখাস্ত করে লাইসেন্স পায়। তার জন্যে একটা নামমাত্র নিলেম হয় বছরে বছরে। কিন্তু প্রত্যেক বছরেই একটা মোটা রকমের টাকা অফিসের বড়বাবুর হাতে গুঁজে দিতে হয়। আর কিছুর খবর রাখেওনা, রাখতে চায়ওনা।

বাবা এবার শরৎ আড্ডির দিকে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী গো শরৎ, তুমি জানো?

শরৎ আড্ডি মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, আজ্ঞে কর্তাবাবু, আমি বাতের ব্যথা নিয়ে বরাবর জ্বলছি, আমার খবর রাখবার ফুরসৎ হয়নি।

বাবা বলিলেন, তা বাতের ব্যথার সঙ্গে আমাদের রাজার কি সম্পর্ক? তোমার ছোট বয়সে তো আর বাতের ব্যথা ছিল না—

বাবা বিনোদ মাইতির দিকে চেয়ে বললেন, আমাদের সুলতানপুর একেবারে পাড়াগাঁ যাকে বলে, দেখছ তো? শুনছ তো ওদের কথা? ওরাই আবার এ গাঁয়ের সব মাথা—

বিনোদ মাইতি বলতে লাগল, ইংরেজ রাজা থাকে সেই সাত সমুদ্র তের নদীর পারে। সেই সাত সমুদ্র তের নদীর পারে থেকে আমাদের এই দেশ শাসন করছে। এবার তোমরা বুঝতে পারলে কেন আমাদের এত দুর্দশা? আমরা কেন পেট ভরে খেতে পাই না? আমরা কেন বছরে একটার বেশি কাপড় পরতে পাব না? তোমরা যেমন তোমাদের রাজার খবর রাখ না, তোমাদের রাজাও তেমনি তোমাদের খবর রাখে না। তোমাদের দুঃখের কথাও রাজার কানে পৌঁছায় না।

বাবা এতক্ষণ বিনোদ মাইতির কথা শুনছিলেন। বললেন, তাহলে আমাদের খবর রাজার কানে কী করে পৌঁছে দেওয়া যায়?

বিনোদ মাইতি বললে, পৌঁছানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে বিলেতের যে-সব জিনিস এখানে আমদানি হয় তা বয়কট করা।

ঠিক বলেছ তুমি। সায়েবদের জন্যেই আমাদের এই সর্বনাশ হল। কিন্তু কি করে তারা আমাদের এই সর্বনাশ করলে ?

কেউ আর কিছু বলে না। সবাই চুপ। সুলতানপুরের বারোয়ারি-তলার বটগাছে একটা প্যাঁচা হঠাৎ ডেকে উঠল। চারিদিকের শুষ্ক নিস্তব্ধতার মধ্যে প্যাঁচার ডাকটা বড় কর্কশ ঠেকল সকলের কানে।

বিনোদ মাইতি বললে, ওই প্যাঁচার ডাক থেকেই তোমরা বুঝতে পারছ, এটা একটা গর্হিত কাজ। প্যাঁচারাই বুঝতে পারে কোন্‌টা শুভ কাজ আর কোন্‌টাই বা অশুভ কাজ। যেদিন বিলেত থেকে সায়েবরা এই দেশে এসেছিল সেদিন ঐ প্যাঁচা ডেকেছিল কিনা কেউ জানে না। হয়তো ডেকেছিল, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা তার ইঙ্গিত বুঝতে পারেনি। অথচ আমাদের দেশে দেশী তাঁতীদের তৈরি কাপড় আগে রোম দেশে রপ্তানি হত, ইটালি দেশে রপ্তানি হত। ইংরেজরা দেখলে আমাদের দেশের তাঁতীদের তৈরি কাপড়ের যদি বিদেশের বাজারে অত চাহিদা থাকে, তাহলে তাদের দেশের তৈরি কাপড় তো কেউ কিনবে না। তখন তারা এক অমানুষিক অত্যাচার করতে লাগল। তারা আমাদের ভালো ভালো নামজাদা তাঁতীদের ধরে ধরে তাদের বুড়ো আঙুলগুলো কেটে দিতে লাগল, যাতে তারা আর কাপড় তৈরি করতে না পারে। তারপর থেকে সায়েবদের তৈরি কাপড় এসে আমাদের দেশের বাজার ছেয়ে ফেললে। এমনি করে আমাদের দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা চলে যেতে লাগল বিদেশে। তারা সেই টাকা পেয়ে বড়লোক হয়ে গেল, আর আমরা হয়ে গেলুম গরীব।

বাবা এতক্ষণ সব শুনছিলেন। এবার বললেন, তাহলে তো খুব খারাপ কাজ মাইতি মশাই। এর কি প্রতিবিধান ?

বিনোদ মাইতি বললে, এর কি প্রতিবিধান তা তোমরাই আমাকে বল। বলে দাও কি করলে আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকা আর সায়েবদের দেশে চলে যেতে না পারে। বল, তোমরাই বল আমাকে।

সবাই চুপ করে রইল।

বিনোদ মাইতি বললে, তোমরা বোধহয় এ-সব কথা আগে কখনও ভাবোনি, তাই এর জবাব দিতে পারছ না। কিন্তু আমরা এ নিয়ে অনেক ভেবেছি।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, ভেবে তুমি কি সমাধান বার করেছ ?

বিনোদ মাইতি বললে, আমরা ভেবে ভেবে এই সমাধান বার

করেছি যে আমরা বিলিতি কোন জিনিস ব্যবহার করব না। আমরা যদি বিলিতি জিনিস ব্যবহার না করি তাহলে সাহেবরা উপোষ করবে। সাহেবদের কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। তাদের যত কারিগর সব বেকার হয়ে যাবে। আমরা যদি বিলিতি কাপড় না কিনি তো তাদের দেশ ম্যাঞ্চেস্টারের কারখানায় যে কাপড় তৈরি হয় তা বিক্রি হবে না। তখন সাহেবরা জব্দ হবে। তোমাদের বাড়িতে যেসব বিলিতি কাপড় আছে সমস্ত আজই পুড়িয়ে ফেল। আর প্রতিজ্ঞা কর যে কেউই আর কখনও বিলিতি কাপড় কিনবে না—

সবাই চুপ করে থেকে এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

বাবা বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি আর কখনও বিলিতি কাপড় কিনব না—

মনোহর শা বললে, বিলিতি কাপড় কিনব না তো তাহলে কি পরব?

বিনোদ মাইতি আবার বললে, কেন, আমি যে কাপড় পরে আছি সেই কাপড়ই পরবে। আমি আজ যে-কাপড় পরেছি তা কি খারাপ কাপড়? এ একটু মোটা কাপড় বটে, কিন্তু নিজের দেশের তুলোয় তৈরী সুতো দিয়ে নিজের দেশের তাঁতার হাতে তৈরী কাপড় পরতে লজ্জা কী?

মনোহর শা বললে, এ-কাপড় কোথায় কিনতে পাওয়া যাবে?

গঞ্জের বাজারে এই কাপড়ের দোকান আমরা খুলেছি। সেখানে গেলেই তোমরা কিনতে পাবে এ-কাপড়। এককালে আমাদের দেশের লোক তো এই কাপড়ই পরত। তখন তো তা পরতে কারো লজ্জা করত না। এসো আজই আমরা বিলিতি কাপড় পোড়াতে আরম্ভ করে দিই, তোমরা তোমাদের বাড়িতে যার-যার বিলিতি কাপড় আছে, সব নিয়ে এসো, আমি নিজের হাতে আগুন লাগিয়ে দেব—

বাবা গোলাম মোল্লাকে আমাদের বাড়ি থেকে সব বিলিতি কাপড় আনতে বললেন। মনোহর শাও বাড়ি গেল বিলিতি কাপড় আনতে। শরৎ আড্ডিও গেল। সভার অনেকেরই একখানা দুখানা বই কাপড় ছিল না। যাদের বেশি কাপড় জামা ছিল সবাই তা নিয়ে এসে জড়ো করল।

বিনোদ মাইতি বললে, তোমরা হয়তো ভাবছ এই ক'টা কাপড় পুড়িয়ে সাহেবদের কী আর ক্ষতি হবে? কিন্তু তোমাদের জানিয়ে

দিই, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গিয়েই আমরা এই রকম কাপড় পোড়াচ্ছি আরো অনেক গ্রামে আমাদের যেতে হবে। সব গ্রামেই আমাদের বিলিতি জিনিসের বিক্রি বন্ধ করতে হবে। দেশ থেকে সাহেবদের তাড়াবার আর কোন উপায় নেই। আমাদের হাতে বন্দুক নেই, পিস্তল নেই, আর ওদের হাতে আছে রাইফেল কামান সব কিছু। লড়াই করে তাদের সঙ্গে আমরা পারব না। এই বিলিতি জিনিস বর্জন করেই ওদের আমরা দেশ থেকে তাড়াব। ভাই সব, তোমরা আমার গলায় সুর মিলিয়ে বল, বন্দেমাতরম্—

সভায় যত লোক ছিল সবাই বিনোদ মাইতির গলার সুরে সুর মিলিয়ে বলে উঠল, বন্দেমাতরম্—

সেই শব্দে বটগাছে যত পাখি ছিল ফটপাট করে উড়ে পালাল।

তারপরে জড়ো করা কাপড়গুলো বিনোদ মাইতি এক জায়গায় স্তূপীকৃত করে তাতে দেশলাই কাঠি জ্বেলে তার ওপরে ফেলে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আগুনের হল্‌কায় বটগাছের নিচেকার ডালের পাতাগুলো ঝলসে উঠল। আগুনের আভায় লাল হয়ে উঠল সুলতানপুরের আকাশ। একেবারে লালে লাল। সেই আগুন দেখে আরো অনেক লোক এসে বারোয়ারিতলায় জড়ো হল।

আগুন যখন শিখা বার করে চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে তখন বিনোদ মাইতি আবার চেঁচিয়ে উঠল, বল ভাই সব, বন্দেমাতরম্—

সবাই চিৎকার করে উঠল এক সুরে, বন্দেমাতরম্—

সুলতানপুরের গরীব লোকদের সামান্য যা-কিছু কাপড় ছিল সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।

এই ছিল তখনকার সুলতানপুর।

সুলতানপুরের মানুষ বড় সহজ সরল। বিশেষ করে শহরের ভদ্রলোকদের কথা বড় সরল মনে বিশ্বাস করত। গ্রাম্য রাজনীতি বলে যে কথা আছে তা সেখানকার কেউ জানত না। খাওয়া-পরার অভাব ছিল বটে, কিন্তু তার জন্যে যে পরের জিনিস চুরি করতে হবে, তা তারা জানত না। যদি তারা কোন কষ্ট পেত বা কোন অসুখে ভুগত তাহলে ভগবানকে ডাকত। মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে প্রার্থনা করত। মা মঙ্গলচণ্ডীর পুজো দিত।

বিনোদ মাইতি মশাই যেদিন এসে বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে দিলে সেইদিন তারা বুঝল যে তাদের দুঃখ-কষ্টের জন্য দায়ী ভগবান নয়, ইংরেজ। ইংরেজরাই তাদের এমন কষ্টের মধ্যে রেখেছে।

এ-সব কথা সুলতানপুরের কেউ জানত না।

বিনোদ মাইতি মশাই আবার গঞ্জে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল সে আবার একদিন আসবে। আরো বলে গেল আমি এখানে এসে তখন কংগ্রেসের একটা অফিস খুলব—

নিমাই জিজ্ঞেস করলে, কংগ্রেস কী?

বাবাও জিজ্ঞেস করলেন, কংগ্রেস কী গো?

তখন কেউই জানে না কংগ্রেস কি বস্তু।

বাইরের সব লোক জেনে গেছে কংগ্রেসের মানে। কিন্তু সুলতান-পুর আমাদের এমন এক গ্রাম যেখানে বাইরের কোন খবরই ঠিক সময়ে আসে না। যদিও বা আসে তো তা নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না। ততক্ষণ ভাত-কাপড়ের চিন্তা করতেই তাদের পুরো সময় চলে যায়। তার ওপর আছে জন্ম-মৃত্যু-বিয়ের চিন্তা। জন্ম হলে কোন সমস্যা নেই। মৃত্যু হলেও তেমন কিছু সমস্যা নেই। মৃত্যু হলে চার-পাঁচজন লোক মড়া কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে আসে।

কিন্তু বিয়ে নিয়ে সমস্যাটাই সবচেয়ে কঠিন সমস্যা। বিশেষ করে মেয়ের বিয়ের সমস্যা। মেয়ের বিয়ের জন্যে সোনা-দানা দিতে হবে। পণ-যৌতুকও দিতে হবে। তারপর আছে বরপক্ষের বাড়িতে গিয়ে খোসামোদ। এই সমস্ত করলেও অনেক সময় অনেক মেয়ের অনেকদিন পর্যন্ত বিয়ে হয় না।

তা এই যখন সুলতানপুরের অবস্থা তখন কোথা থেকে কোন্ এক বিনোদ মাইতি এসে সব কিছু ওলোট-পালোট করে দিয়ে গেল। তখন বারোয়ারিতলায়, শরৎ আড্ডি আর মন্মথর শার দোকানে কেবল ওই নিয়েই আলোচনা।

গুণধর কর্মকার নিজের কারখানায় বসে সেই আলোচনাই করে। রাস্তা দিয়ে রাজু মাতলা যাচ্ছিল, তাকে ডাকল গুণধর। বললে, ও রাজু, এত সকালে কোথায় চললে?

রাজু মাতলার কাঁধে লাঙল, আর সামনে দুটো দামড়া গরু। গুণধর কর্মকারের ডাকে কাছে এলো। বললে, পশ্চিমের মাঠে চাষ দিতে যাচ্ছি—

আরে, চাষ দেবে 'খন, একটু তামুক খেয়ে যাও—

রাজু মাতলা কাজের লোক। তার কাজে গাফিলতি হলে কর্তা-বাবুর কাছে গাল-মন্দ খেতে হবে। গরু দুটোকে লাঙলের সঙ্গে বেঁধে রেখে বসে পড়ল গুণধর কর্মকারের সামনে। তারপর কল্কেটা নিয়ে টান দিতে লাগল।

গুণধর জিজ্ঞেস করলে, তুমি সভায় গিয়েছিলে রাজু?

গিয়েছিলাম। কর্তাবাবু যে আমাকে যেতে বলেছিলেন। না-গেলে কি আর আমাকে আস্ত রাখতেন?

কী বুঝলে তুমি?

রাজু মাতলা বললে, আমি আর কী বুঝব খুড়োমশাই। আমি কি আর লেখা-পড়া জানি? আপনি কী বুঝলেন?

গুণধর তখন হুঁকোটা নিজের হাতে নিয়েছে। হুঁকোটা নিজের হাতে নিয়ে কল্কেটা তার ডগায় বসিয়ে ভুড়ুক ভুড়ুক করে টান দিতে লাগল।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, আমিও তো খেটে-খাওয়া লোক, আমি, আর কী বুঝব, তোমার কর্তাবাবু গোলাম মোল্লাকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল বলেই গিয়েছিলাম। মাঝখান থেকে আমার খালি কাজের কিছু লোকসান হল।

রাজু মাতলা জিজ্ঞেস করলে, আপনি ঘরের কাপড় কিছু পোড়াতে দিয়েছিলেন না কি?

গুণধর বললে, দিয়েছিলুম, কিন্তু সে ছেঁড়া-কাপড়। তা আর পরা যেত না। সে ফেলেই দিতে হত। তুমি দিয়েছিলে?

রাজু মাতলা বললে, আমি আর কী কাপড় দেব, আমার তো এই একখান কাপড় ছাড়া দু'খান কাপড় নেই যে তা পোড়াতে দেব—

আর তোমার কর্তাবাবু?

কর্তাবাবুর বাড়িতে যত কাপড় ছিল সব পুড়িয়ে দিয়েছেন—

সব কাপড়?

হ্যাঁ, তারপর আজ গঞ্জ থেকে কর্তাবাবু সকলের জন্যে নতুন কাপড় কিনে এনেছেন। ওঁরা বড়লোক মানুষ, ওঁরা যা পারেন আমরা কি তা পারি?

বলে উঠে পড়ল রাজু। বললে, যাই রোদ উঠে গেছে বেলাবেলি চাষটা দিয়ে আসি গে—তারপর গরু দুটোকে তাড়াতে তাড়াতে পশ্চিম

দিকে পা বাড়ালে রাজু মাতলা।

হ্যাঁ, সত্যিই, আমার মনে আছে, আমরা সবাই সেদিন বাড়িতে নতুন কাপড় পরলাম। কাপড়গুলো বিলিতি কাপড়ের চেয়ে অনেক মোটা। প্রথম প্রথম আমাদের সে কাপড় পরতে তত ভালো লাগত না।

কিন্তু বাবা বললেন, তা হোক মোটা। এই কাপড় বেচার যত টাকা সব আমাদের দেশের লোক পাবে। সায়েব বেটারা আমাদের দেশ থেকে টাকা লুটে নিয়ে যাবে এটা ভালো নয়।

বাবা যে শুধু নিজেই দেশি কাপড় পরতে আরম্ভ করলেন তাই-ই নয়, সুলতানপুরের সবাইকেই তাই করতে বললেন। আমার বাবা ছিলেন বড় ধার্মিক মানুষ। নিজে যা মুখে বলবেন, কাজেও তাই করবেন।

আমাদের বাড়িটা ছিল বিরাট, দু' মহলা। ঠাকুর্দাদার এক ছেলে আমার বাবা। তাই সম্পত্তি ভাগাভাগি হবার দুর্ভোগ সইতে হয়নি বাবাকে।

মা বলত, বিলিতি কাপড় যে তুমি সব নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দিলে, এখন আমরা পরব কী?

বাবা বলতেন, সে সব তোমাকে বুঝতে হবে না, সে বুঝব আমি। কেন আমি বিলিতি কাপড় পরব বলতে পারো? বিনোদ মাইতি তো অন্যায় কিছু বলেনি। ন্যায্য কথাই বলেছে। আমিও তাই বলি, কেন আমার নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে সায়েবদের পেট ভরাব?

মা বলত, তা ওরা যা করে করুক, তুমি ওর মধ্যে থাকছ কেন? শেষকালে যদি পুলিশ এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যায়?

বাবা বলতেন, ধরে নিয়ে যাবে, ধরবে। আমি কি তাতে ভয় করি?

মা বলত, তোমার ভয় না করতে পারে। কিন্তু আমরা? তুমি জেলে গেলে আমরা কী করব? আমাদের কে দেখবে?

বাবা বলতেন, কে আবার দেখবে, যিনি সকলকে দেখেন তিনিই দেখবেন।

সত্যিই বাবা কিছুতেই ভয় পেতেন না। একবার একটা মামলায় গিয়ে সত্য কথা বলায় তাঁর চার লাখ টাকার জমিদারি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

উকিল বলেছিল, আপনি ও-কথা বলবেন না কর্তামশাই, জজ আপনার মামলা খারিজ করে দেবে।

বাবা রেগে গিয়ে বলেছিলেন, তুমি আমাকে মিথ্যে বলতে পরামর্শ দিচ্ছ ?

উকিল বলেছিল আপনার ভালোর জন্যেই বলছি, নইলে অমন ভালো জমিটা আপনার হাত-ছাড়া হয়ে যাবে।

বাবা বলেছিলেন, হোক হাত-ছাড়া, আমি তো আগে মানুষ তারপরে জমিদার। আমার মনুষ্যত্ব বড় না জমিদারি বড় ? জমিদারি গেলে আবার জমিদারি হবে, কিন্তু মনুষ্যত্ব গেলে যে সব চলে যাবে—

আমাদের অল্প বয়স থেকে বাবাকে দেখে এসেছি। বাবার কথায় আর কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। রাজু মাতলার অসুখ হলে তিনি যেমন তার বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন, তেমনি আবার মদের দোকানের মালিক শরৎ আড্ডির অসুখ শুনলেই দৌড়ে যেতেন।

গোলাম মোল্লা কি শুধু মাইনের লোভে বাবার তাবেদারি করত ? মাইনে ছাড়া আরো এমন কিছু পেত যা অন্য কারো কাছে পাওয়া যেত না।

এবার বিনোদ মাইতি আর একলা এলো না। সঙ্গে নিয়ে এলো আর একজনকে।

ইনি কে ?

বিনোদ মাইতি পরিচয় করিয়ে দিল, ইনি হচ্ছেন দেশবন্ধু, ব্যারিস্টার সি. আর. দাস। মানে চিত্তরঞ্জন দাস। ইনি দেশের দাস, দশের দাস, মায়ের দাস। ইনি হাজার হাজার টাকার ব্যারিস্টারি ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসের কাজে নেমেছেন। দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন বলে দেশের লোক এঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধি দিয়েছে—

বাবা এমনিতে কারোকে প্রণাম করেন না। কিন্তু এ হেন মানুষকে দেখে আর এ-হেন মানুষের পরিচয় পেয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন

দেশবন্ধু বললেন, এই বিনোদের কাছে আপনার পরিচয় পেয়েই এই সুলতানপুরে এলাম, আপনি আমাকে একটা ভিক্ষে দিন—

সে কী কথা ! বলুন কী দিতে পারি আপনাকে ?

তারপর ঘরের কোণের দিকে একটা চরকা দেখে বললেন, আপনি

চরকাতে সুতো কাটা আরম্ভ করেছেন? খুব ভালো খুব ভালো। কে সুতো কাটে?

বাবা বললেন, আমি নিজে কাটি, আমার ছেলে কাটে, বাড়ির মেয়েরাও সময় পেলেই চরকা কাটে—

দেশবন্ধু অবাক হয়ে গেলেন। সুলতানপুরের মতো এই অজ পল্লীগ্রামে যে এমন একজন দেশপ্রেমিক আছেন তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

বাবা বললেন, এই বিনোদ মাইতি মশাই এখানে এসেই আমাদের চোখ খুলে দিয়ে গেছে।

দেশবন্ধু বললেন, আমিও আজ এখানে একটা জনসভায় বক্তৃতা দেব। আপনি একটা জনসভার ব্যবস্থা করতে পারবেন?

নিশ্চয় পারব।

ততক্ষণে আমাদের বাড়ির সামনে আরেক ভিড় হয়েছিল। তারা শুনেছিল যে কলকাতা থেকে একজন বিখ্যাত দেশসেবক এসেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাম তারা শোনেনি। কিন্তু তাতে কী? তিনি যখন ব্যারিস্টারি ছেড়ে দিয়ে স্বদেশী করছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই কোন বিখ্যাত মানুষ।

ভিড় দেখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা?

বাবা বললেন, এরা সবাই সুলতানপুরেরই লোক—

এখানে কী দেখছে?

খবর পেয়েছে আপনি এসেছেন। তাই আপনাকে দেখতে এসেছে—

আমার নাম কি জানে ওরা?

বাবা বললেন, আজ্ঞে, আমাদের সুলতানপুরের লোকদের কেউই লেখা-পড়া জানে না। পাঁচ ক্রোশ দূরে একটা ইস্কুল আছে কেউ কেউ সেখানে যায় লেখা-পড়া করতে। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই সেখানে যেতে পারে না।

দেশবন্ধু বললেন, তাহলে তো বড় দুর্দশা ওদের। আপনারা নিজেরা এখানে একটা অবৈতনিক স্কুল করতে পারেন না? যারা পড়বে তাদের মাইনে দিতে হবে না, আর যারা পড়াবে তারাও কিছু মাইনে নেবে না। আমি বলি, একটা নাইট স্কুল করুন আপনারা।

বাবা বললেন, ইস্কুল করতে গেলেও তো একটা ঘর লাগবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বললেন, আপনি গ্রামের মোড়ল, আপনি আপনার এই ঘরখানাই না হয় দিন।

বাবা বললেন, তা দেব। কিন্তু মাস্টার কোথায় পাব?

দেশবন্ধু বললেন, প্রথম প্রথম একজন দুজন নিয়ে কাজ চালান। এ-রকম না করলে চলবে না। ইংরেজ সরকার যখন চায় না যে গ্রামের লোক লেখা-পড়া শিখুক, তখন আমাদের নিজেদেরই সেই ভারটা নিতে হবে।

বাবা বললেন, আমি আমার বৈঠকখানা ঘরটা ছেড়ে দিতে পারি—

আর নতুন কংগ্রেসের অফিস?

বাবা বললেন, সেও আমার বৈঠকখানার একপাশে করব। দিনের বেলা কংগ্রেসের কাজ হবে সেখানে, আর রাত্তির বেলা হবে ইস্কুল—

সেদিন সুলতানপুরের বারোয়ারিতলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা দিলেন। সে কি বক্তৃতা! সেদিন যারা সে-বক্তৃতা শুনছিল সকলেরই রক্তে যেন আগুন জ্বলে উঠল। তারা নতুন করে যেন জানতে পারল যে তাদের নিজেদের দারিদ্র্যের জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী। ইংরেজ সরকার উপলক্ষ মাত্র। ইংরেজ তাদের সব কেড়ে নিয়েছে সত্যি, কিন্তু কেন তারা ইংরেজদের তা কেড়ে নেবার সুযোগ দিল? যাতে তারা আর সে সুযোগ না পায় তার জন্যে তাদের নিজেদের চরিত্র সংশোধন করতে হবে। তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই একদিন ইংরেজ এ দেশে এসেছিল, এবং তাদের দুর্বলতার জন্যেই ইংরেজ এখনও এ-দেশে তাদের শোষণ করে চলেছে। তাদের প্রথম কর্তব্য সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঝেড়ে ফেলতে হবে। এই সাম্প্রদায়িকতা আমাদের দেশকে দুর্বল করে রেখেছে। হিন্দু আর মুসলমান কি আলাদা মানুষ? ধর্ম আলাদা বলেই মানুষ আলাদা হয় না। তাদের শরীরে যে রক্ত বইছে, আমাদের শরীরেও সেই একই রক্ত বইছে। তারাও ঈশ্বরের সৃষ্টি, আমরাও সেই একই ঈশ্বরের সৃষ্টি। যারা গরীব, যারা বঞ্চিত, যারা প্রবঞ্চিত, তাদের নিজের ভাই বলে আপন করতে হবে। আপনার মানুষ বলে ভাবতে হবে। তাদের নিজেদের বুকে ঠাঁই দিতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন, বল, চণ্ডাল আমার ভাই। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বলে গিয়েছেন, আচণ্ডালে কোল দিতে। আর আজকের মহান নেতা মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, যে রাম সে-ই হল রহিম। তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই।

সভার মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেশবন্ধুর বক্তৃতা শুনছিল।

তিনি বলছিলেন, বন্ধুগণ, আমাদের এই স্বাধীনতার সংগ্রাম শুধু হিন্দুর স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, আমরা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সব ধর্মের লোকের স্বাধীনতা চাই। আমরা সব ধর্ম নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা চাই। অর্থাৎ এক-কথায় মানুষের স্বাধীনতা দরকার। আর বিশেষ করে গ্রামের মানুষের। আমাদের দেশে সাড়ে সাত লক্ষ গ্রাম আছে। আমাদের দেশের শতকরা আশি ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। শুধু শহরের মানুষের স্বাধীনতা হলেই চলবে না, গ্রামের মানুষের স্বাধীনতাও আনতে হবে। এর জন্যে আমাদের প্রথম কাজ হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ ত্যাগ করতে হবে। তারপর আরো দুটো কাজ করতে হবে। প্রথম কাজ বিলিতি জিনিস কিনব না। আর দ্বিতীয় কাজ হল মদ্য বর্জন। মদ-গাঁজা-আফিম সব নেশা ত্যাগ করতে হবে। ও-নেশা শুধু যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর তাই-ই নয়, মনের ওপরেও ও-নেশা খারাপ প্রভাব বিস্তার করে। অনেক গরীব লোক আছে, যারা নিজের সংসারের প্রতিপালনের টাকায় মদ খেয়ে সর্বস্বান্ত হয়। এই মদ খাইয়েই ইংরেজ সরকার আমাদের পঙ্গু করে রেখেছে। এমনি করে ইংরেজরা চীন দেশকেও আফিম খাইয়ে পঙ্গু করে রাখবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এ রকম করে আর বেশি দিন চলবে না। একদিন আমরাও স্বাধীন হব। সেদিনের আর বেশি দেরি নেই যেদিন আমাদের দেশের তাঁতীদের তৈরী কাপড় ইংরেজরা কিনতে বাধ্য হবে। আসুন, আজ আমরা প্রতিজ্ঞা করি, সাম্প্রদায়িকতা, বিলিতি-বর্জন আর মদ্যপান ত্যাগ করি, বন্দেমাতরম্—

এবার বিনোদ মাইতি বলে উঠল, বন্দেমাতরম্—

সভার সকলেই বলে উঠল, বন্দেমাতরম্—

সভা শেষ হয়ে গেল। সকলেই খুশি। আমাদের বাড়িতেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আর বিনোদ মাইতির খাবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। আমি খুব কাছ থেকেই দুজনকে দেখলাম। মনে হল ওঁকে দেখতে পাওয়াও সৌভাগ্য।

তারপর এক সময়ে গরুর গাড়ি এসে গেল। রাজু মাতলাই গাড়োয়ান হয়ে বসল। তাতে বিনোদ মাইতি মশাই ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আর তারপর সকলের শেষে বাবা গিয়ে উঠলেন।

বাবা বললেন, গাড়ি ছাড় রাজু—

আমরা বাড়ির সদরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখলাম রাজু মাণ্ডলা গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। তারপর সামনের পেয়ারা গাছের তলা দিয়ে গিয়ে সদর রাস্তায় পড়ল গাড়িটা। আর তারপর বাঁশবাগানটা পেরিয়ে সেটা আমাদের সকলের দৃষ্টির অগোচরে চলে গেল।

বাবা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের হাতে এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন কংগ্রেস ফাণ্ডের চাঁদা হিসেবে। দেখতে দেখতে আমাদের বাড়িতেই একটা নাইট্-স্কুল গড়ে উঠল। পাড়ার বাড়ি বাড়ি থেকে ছেলেদের ডেকে আনা হল স্কুলে পড়বার জন্যে। কাউকে মাইনে দিতে হবে না। বইও কিনতে হবে না পয়সা খরচ করে। বই কেনবার পয়সা দেবেন বাবা। আর পড়াবে পাড়ার ছেলেরা, যারা পাশ করে গ্রামে বসে আছে। তার বদলে সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়িতে যে বিগ্রহের সন্ধ্যে-পূজো হয় তার প্রসাদ পাবে।

তা সে প্রসাদও বেশ পেট ভরার মতো। কোনদিন লুচি, কোনদিন খিচুড়ি। আর তার সঙ্গে ক্ষীর ফল-মূল। আর পূর্ণিমার দিন তো ডাল, ভাজা, নানা রকম তরকারি

বাবা সবাইকে বলতেন, খা খা, পেট ভরে খা, আর একটু খিচুড়ি নে—

যতটা না পড়ার লোভে তার চেয়ে ছেলেদের বেশি লোভ তাদের খাওয়ার ওপর। ওই খাওয়ার ওপর লোভের জন্যেই দিন দিন ছেলে-মেয়ের সংখ্যা বাড়তে লাগল।

গুণধর কর্মকারের ছেলে ভানু কর্মকার বি-এ পাশ। সে দিনের বেলা বসে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তাস খেলত। তারাও সন্ধ্যেবেলা একটা কাজ পেয়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ ম্যাট্রিক, কেউ নন্-ম্যাট্রিক আবার কেউ বি-এ পাশ।

বাবা তাদের মাইনে দিতেন না। হাত-খরচ হিসেবে দিতেন মাসে পাঁচ টাকা করে। তা তখনকার দিনে মাসে পাঁচ টাকা কম কথা নয়। তখনকার দিনে মাসে পনেরো টাকা মাইনেতে সংসার খরচ ছাড়াও মেয়ের বিয়ে অন্নপ্রাশনেও অনেক টাকা খরচ করেছে। সে যুগটাই ছিল ওই রকম।

বাবা চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে মাস্টারদের পড়ানো শুনতেন। মাঝে মাঝে বলতেন, মাস্টার, ওদের নামতাটা ভালো করে মুখস্থ

কারয়ে দাও—

তারপর যেই ভেতর-বাড়ি থেকে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠত, তখনই ছেলেরা উৎকর্ণ হয়ে উঠত। এইবার খাওয়ার ডাক আসবে। খানিক পরে ছেলেরা পাতভাড়ি বগলে নিয়ে তৈরি হত। কলাপাতা জল দিয়ে ধুয়ে পাতা হত সার সার। খাবার পরিবেশন করবার আগেই ছেলেরা পুকুর থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে যে যার জায়গায় বসে পড়ত। তারপর পাতে খাবার পড়তে না পড়তে তা নিঃশেষ হয়ে যেত। আমি নিজেও পড়তুম সেই স্কুলে, আমিও তাদের সঙ্গে বসে প্রসাদ খেতুম।

বাবা বলতেন, আমার ইস্কুলে জাত-টাত মানা চলবে না। এ কংগ্রেস ইস্কুল। দেশবন্ধু বলে গিয়েছেন, তোমরা শোননি ?

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দেশবন্ধুর নাম শোনেনি, কিন্তু মাস্টার মশাইরা শুনেছে। তারাপদ বলত, আজ্ঞে কর্তাবাবু, আমি শুনেছি—

বাবা বলতেন, আহা, তোমরা তো সোনার ছেলে, তোমরা তো শুনবেই। কিন্তু গ্রামের আর পাঁচজন কি তা মানছে ? তাহলে তো সবাই এই কংগ্রেসের ইস্কুলে ছেলে পাঠাত। এদিকে দেখ, যত পাপ যেন আমার হয়েছে। গ্রামের বামুন কায়েতরা তো তাদের ছেলেদের পাঠাচ্ছে না—

কথাটা সত্যি। সেদিন বাবা কমল ভট্টাচাযি মশাইকে ডেকে পাঠালেন। কমল ভট্টাচার্য্য এলেন। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, ভটচায্, তুমি তোমার ছেলেকে পাঠাচ্ছ না কেন আমার ইস্কুলে ?

কমল ভট্টাচায্যি মশাই আমাদের বাড়ির সঙ্গে বহুদিন ধরে জড়িত। আমাদের বাড়ির পুজো-আর্চার কাজ বরাবর পুরুষানুক্রমে তাঁরাই করে আসছেন। আগে তাঁর বাবা শরৎ ভট্টাচায্যি মশাই করতেন। তিনি মারা যাবার পর তাঁর ছেলে কমল ভট্টাচায্যি এ কাজ করছিলেন।

বললেন, কর্তাবাবু, আপনাদের এখানে ছোট জাতের ছেলেদের সঙ্গে খাওয়াটা কি ভালো, আপনিই বলুন ?

বাবা বললেন, তা এই কথা আগে বলনি কেন ? আগে যদি বলতে তো আমি অন্য ব্যবস্থা করতুম তার জন্যে—

—কি ব্যবস্থা করতেন ?

বাবা বললেন, যারা ছোট জাতের ছেলেদের সঙ্গে এক সারিতে বসে খাবে না, তারা না খেলেই হল। তারা লেখাপড়া করুক একসঙ্গে,

তারপর খাওয়ার আগে বাড়ি চলে যাক। আমি কোন আপত্তি করব না।

শুধু কমল ভট্টাচাযি্য মশাই-ই নয়, এই রকম যারা ছোট জাতের ছেলেদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ায় আপত্তি তুলেছিল, তারা তাদের ছেলেমেয়েদের খাওয়ার আগেই বাড়ি নিয়ে যেতে লাগল

এমনি করে প্রথম প্রথম অনেক বাধা আসতে লাগল। কিন্তু বাবা বরাবর ছিলেন অক্লান্ত উৎসাহী। কোন বাধাই বাবাকে দমাতে পারলে না। বাবা কথা দিয়েছেন দেশবন্ধুকে যে দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে দূর না করলে দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়ানো যাবে না, সেকথা তিনি রাখবেনই।

তিনি গোলাম-মোল্লাকে কাছে পেলেই বলতেন, আমার আর ক'টা দিন, আমি তো আর বেশিদিন বাঁচব না, সকলের ভালোর জন্যেই আমি এই ইস্কুল করেছিলুম, লোকে যদি ছেলেদের এ ইস্কুলে পাঠায় তো ভালো, নইলে তারাই ভুগবে। আমার আর কি লোকসান।

সেদিন কলকাতা থেকে কংগ্রেস অফিসের এক চিঠি এলো যে দেশবন্ধুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ছ'মাসের জেল দিয়েছে।

খবরটা অন্দরে যেতে মা খুব ভয় পেয়ে গেল। বললে, কেন আর তুমি ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাচ্ছ? তুমিও কংগ্রেস ছেড়ে দাও না—

বাবা কথাটা শুনে বললেন, তুমিও ওই কথা বলছ? আমি যদি দেশের কিছু কাজ না করি তো সুলতানপুরের কি হবে বল তো?

মা বললে, সুলতানপুরের লোকেরা কি তোমার কথা সবাই মানছে?

বাবা বললেন, সুলতানপুরের লোকেরা তো মানবেই না। যদি মানত তাহলে ওরা বুঝতে পারত আমি ওদের ভালোর জন্যেই এসব করছি। দেশবন্ধুর কথাই কি দেশসুদ্ধ লোক মানছে বলতে চাও?

মা বললে, তোমার দেশবন্ধুর কথা ছেড়ে দাও। তাঁরা বড় বড় লোক সব। তাঁরা দেশের জন্যে কিছু করলে তাঁদের মান-মর্যাদা বাড়বে। আর তুমি জেলে গেলে সেখানকার কষ্ট সহ্য করতে পারবে?

বাবা বললেন, তুমি জানো দেশবন্ধু নিজের সর্বস্ব দেশকে দিয়ে দিয়েছেন? তিনি শুধু নিজে নন, তাঁর স্ত্রী বাসন্তীদেবীও জেল খেটেছেন, তা জানো?

মা ভয় পেয়ে গেল। বললে, আমি কিন্তু বাপু জেল খাটতে পারব না। সে তুমি যা-ই বল আর তাই বল।

বাবা বললেন, তোমাকে জেলে যেতে কে বলেছে ?

মা বললে, তোমাকেও যদি ধরে নিয়ে যায় তো তখন আমিই কি বাঁচব মনে করেছ ? জেলে নিয়ে গিয়ে যদি তোমাকে ঘানিতে ঘোরায় তখন কী হবে ?

বাবা বললেন, তা ঘানিতে ঘোরাবে ! ইংরেজ-ব্যাটারা সব পারে।

তাহলে কেন ও-সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাচ্ছ তুমি ? দেশের কথা তো তুমি ভাবছ, আর আমরা ? আমাদের কথা একবার ভাববে না ? তোমার ছেলের কথা ভাববে না ?

বাবা বললেন, দরকার হলে সব অবস্থার জন্যেই তৈরি হয়ে থাক। মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরুর নাম শুনেছ ? দেশবন্ধুর কাছে শুনেছি তাঁরা সবাই জেল খেটেছেন।

মা বললে, কী জানি বাপু, তুমি শেষ পর্যন্ত কী করবে তাই-ই আমি ভাবছি। কেন, সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে তোমাকে ! কোথাকার কে এক বিনোদ মাইতি এলো আর তুমি একেবারে বদলে গেলে।

বাবা বললেন, অনেক দিন তো বাঁচলুম। বেঁচে কী এমন রাজ-কার্য করলুম। শুধু খেয়েছি আর ঘুমিয়েছি, খাওয়া আর ঘুমোনো ছাড়া আর কোন কাজ তো এতদিন করিনি। এবার না-হয় একটা কাজের মতো কাজ করি।

মা বললে, সবাই যা করে তুমিও না-হয় তাই করেই বেঁচে থাকলে।

বাবা বললেন, এতদিন যা করেছি তা ভুলই করেছি। এতদিন বিলিতি কাপড় কিনে পরেছি। তাতে কত টাকা বিলেতে চলে গেছে বল দিকিনি ?

মা বললে, সবাই তো ছেঁড়া কাপড় আগুনে পোড়াতে দিলে আর তুমিই শুধু নতুন নতুন কাপড় পুড়িয়ে ভস্ম করে দিলে।

বাবা বললেন, তা কি আমি জানি না ভেবেছ ? তবু ভালো করার ভানও ভালো, তা জানো ? ওই করতে করতেই যদি একদিন ওদের সুমতি হয়।

মা বললে, তা তোমরা কি দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াতে পারবে ভেবেছ ? তারা কি ভাবছ তোমাদের ছেড়ে কথা কইবে ?

বাবা বললেন, তুমি দেখে নিও, আমাদের দেশের তিরিশ কোটি লোক, আর ওরা মাত্র দু'শো কি পাঁচশো জন। এই তিরিশ কোটি

লোকের সঙ্গে ওই পাঁচশো লোক কি করে পারবে ?

মা বাবার সঙ্গে তর্ক করে পেরে উঠল না। শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে, আমি মেয়েমানুষ, আমি আর কী বলব তোমাকে। তবে একটা কথা বলে রাখছি, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা কি ভালো ?

বাবা বললেন, আমার জীবনে ভালো না হতে পারে, কিন্তু আমার পরে ভবিষ্যতে দেশের তো ভালো হবে। তাহলেই হল।

কিন্তু শুধু যে আমার নিজের মা-ই প্রতিবাদ করলে, তা নয়। বাবার বিরুদ্ধে সামনে কারো কিছু বলবার সাহস ছিল না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বাবার কাজে কারোরই যেন সমর্থন ছিল না। কেউ কিছু মুখে না বললেও মনে মনে সবাই-ই বলতে লাগল, ছোটলোকদের লেখা-পড়া শেখানোটা কি ভালো হচ্ছে ? এত আস্কারা দিলে যে তারা মাথায় উঠবে। মুসলমানেরা যে শেষকালে হাতে মাথা কাটবে সকলের।

বিশ্বম্ভর কবিরাজ মশাই সেদিন পাড়ায় এসেছিলেন রোগী দেখতে। ফিরে যাবার পথে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতেই বাবা ডাকলেন, কী বিশ্বম্ভর, কোথায় গেছ্‌লে ?

বিশ্বম্ভর কবিরাজ থেমে গেল। বললে, এই গিয়েছিলাম কোমলপুরে, একটা রোগী ছিল—

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সেদিন মীটিং-এ এসেছিলে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্তামশাই।

বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, কেমন শুনলে দেশবন্ধুর বক্তৃতা ?

আজ্ঞে, খুব ভালো ভালো কথা শুনলাম। তবে···বলে একটু থামল।

বাবা বললেন, থামলে কেন ? তবে···কি ?

আজ্ঞে, সবাই বলছিল ছোটলোকেরা ওতে আসকারা পেয়ে যাবে। আপনি যে রকম লেখাপড়া শেখাচ্ছেন ওদের। দিনকতক বাদে ওরা কেউ আর ক্ষেতে-খামারে-মাঠে কাজ করতে চাইবে না—

বাবা রেগে গেলেন। বললেন, কে বলছিল ও কথা বল তো ?

বিশ্বম্ভর কবিরাজ বললে, আজ্ঞে কোমলপুরের সিধু বিশ্বাস—

কোমলপুরের সিধু বিশ্বাস ? বুঝেছি পাট বেচে দুটো পয়সা হয়েছে কিনা তাই ধরাকে একেবারে সরা জ্ঞান করতে আরম্ভ করেছে।

তা এখন না হয় দুটো পয়সা হয়েছে, কিন্তু এককালে ওই সিধু বিশ্বাসই আমার কাছে এসে পায়ে ধরে কেঁদেছে। তখন খেতে পেত না। আমি খালি হাতে টাকা দিয়েছিলুম বলে তবু সে যাত্রায় বেঁচে যায়। আজ কিনা আমার নামেই সে ওই কথা বলে। তা আমি কি গাঁয়ের ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া শিখিয়ে পয়সা উপায় করি যে আজ সে ওই কথা বলে? তুমি এ-সব কথা ওকে বললে না কেন?

বিশ্বম্ভর কবিরাজ বললে, আজ্ঞে, ওদের কথা ছেড়ে দিন আপনি। আজকাল মানুষ ওই রকম অকৃতজ্ঞ হয়ে গেছে সব। কেউ কারও ভালো দেখে না—

বাবা বললেন, না কবিরাজ, শুধু কোমলপুরের সিধু বিশ্বাসই নয়, আমাদের গাঁয়েরও অনেকেই ওই কথা বলছে। তাই ভাবি আমাদের দেশ কি সাধে এখন ইংরেজ ব্যাটাদের গোলামি করছে? নইলে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে ইংরেজ ব্যাটারা কি এই দেশে এসে রাজত্ব করতে পারে? তুমিই বল না লেখা পড়া কেউ জানে না বলেই তো আমাদের আজ এই দুর্গতি।

বিশ্বম্ভর কবিরাজ বললে, ও সব লোক বলবেই। হাজার চেষ্টা করলেও আপনি ওদের মুখ চাপা দিতে পারবেন না—

সুলতানপুরে কংগ্রেস অফিস হওয়ার পর থেকেই একটা বাঙলা খবরের কাগজ আনার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু খবরের কাগজ সেই কেষ্টগঞ্জ থেকে আনার ব্যবস্থা করা সোজা কথা নয়। সকালবেলার ট্রেনে খবরের কাগজ আসত স্টেশনে, আর গোলাম মোল্লা সেখান থেকে বাবার জন্যে একখানা বঙ্গবাসী কিনে নিয়ে আসত। কেষ্টগঞ্জ স্টেশন সুলতানপুর থেকে পাঁচ ক্রোশ রাস্তা। মাঝখানে তিন চারটে গ্রাম অতিক্রম করতে হয়। গোলাম মোল্লাকে সাইকেলে চড়ে যেতে দেখে, অন্য গ্রামের অনেকেই ডাকত। বলত ও গোলাম মোল্লা, দাঁড়াও না একটু, কথা আছে। বলি তোমাদের সুলতানপুরের খবর কি গো?

গোলাম মোল্লা এক একদিন সাইকেল থেকে নামত, দু-চারটে কথা বলত, আবার তাড়াতাড়ি সাইকেলে উঠে চলে যেত।

সেদিনও ওই রকম যেতে যেতে ডাক পড়তেই গোলাম মোল্লা সাইকেল থেকে নামল। সেদিনও ভাজনঘাটের অধর সরকার ডাকলে কি গো গোলাম মোল্লা, খবরের কাগজ আনতে যাচ্ছ?

গোলাম মোল্লা বললে, হ্যাঁ—

অধর সরকার বললে, একটু নামো না, একটা বিড়ি খেয়ে যাও। তোমাদের সুলতানপুরের কিছু খবর দিয়ে যাও।

অধর সরকার আড্ডাবাজ লোক। সকালবেলাই এসে ভাজনঘাটের মোড়ের মাথায় এসে বসে। বাড়ির আর ক্ষেত-খামারের কাজ করে ছেলেরা। বেলা বারোটা পর্যন্ত আড্ডা মেরে তবে বাড়িতে খেতে যায়। তারপর দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে আবার বেলা থাকতে থাকতে এসে বসে। সেখানে আরো চার পাঁচজন জোটে। কোন কাজকর্ম নেই কারো। রাস্তা দিয়ে কেউ গেলেই অধর সরকার ডাকে। বলে, কে যায় গো ?

লোকটা বলে, আজ্ঞে আমি উমরপুরে যাব ?

মশাইয়ের নাম ?

লোকটা নিজের নাম বলে। কিন্তু তাতেও তার রেহাই নেই। জিজ্ঞেস করে, উমরপুরে কার বাড়ি যাওয়া হবে—

সিধু বিশ্বাসের বাড়ি।

সিধু বিশ্বাস আপনার কে হন ?

আমার শ্বশুরমশাই।

ও, তুমি সিধু বিশ্বাসের জামাই ? তা আগে বলবে তো ! এই সেদিন যার বিয়ে হল ?

লোকটা হ্যাঁ বলে চলে যায়।

এমনি অধর সরকারের স্বভাব। শুধু অধর সরকার কেন, সুলতানপুরের ধারে কাছে যত গ্রাম আছে সব গ্রামের লোকদেরই এই স্বভাব তাই গোলাম মোল্লাকেও সেদিন যখন ডাকলে তখন গোলাম মোল্লা সাইকেল থেকে নামল।

অধর সরকার গোলাম মোল্লার দিকে একটা বিড়ি এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, শুনছি নাকি তোমার কর্তামশাই ভদ্দরলোকেদের জাত মারছেন ?

গোলাম মোল্লা বললে, কই, তা তো শুনিনি—

অধর সরকার অবাক। বললে, সে কী ! আমরা এত দূরে বসে সব শুনতে পাচ্ছি, আর তুমি কর্তামশাই-এর খাস-খানসামা হয়ে, কিছু শোননি ? তোমার কর্তামশাই নাকি বলেছেন জাত-পাত মানা চলবে না ?

গোলাম মোল্লা বললে, কর্তামশাই জাত মানেন না।

অধর সরকার বললে, তোমার কর্তামশাই জাত না মানলেই হল ? জাত কি তোমার কর্তামশাই নিজে তৈরি করেছেন যে আমাদের দেশের পণ্ডিতদের তৈরি জাত-ধর্ম তুলে দিতে চান ? শেষকালে কোন্ দিন হয়তো তোমার কর্তামশাই বলবেন হিন্দুদের ছেলেদের সঙ্গে মুচিদের মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে! তোমার কর্তামশাইয়ের তো সাহস কম নয়!

গোলাম মোল্লা বললে, আজ্ঞে আমাকে এ-সব কথা বলে কী লাভ ? আমি তো হুকুমের চাকর বই আর কিছু নয়—

অধর সরকার বললে, তা তো জানি, কিন্তু তোমার কর্তামশাইকে বলে দিও অমন করলে দেশ উচ্ছন্নে যাবে—

গোলাম মোল্লা বললে, আজ্ঞে দেশ যাতে উচ্ছন্নে না যায় সেই জন্যই তো কর্তামশাই ওই সব করছেন। নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, তাদের খেতে দিচ্ছেন—

অধর সরকার বললে, ওই খেতে দেওয়া মানেই তো জাত-মারা! আর তা ছাড়া মেয়েদের যে লেখা-পড়া শেখাচ্ছেন তার মানে কী জানো ?

আজ্ঞে না!

—জানো না তো জেনে নাও। মেয়েদের লেখা-পড়া শেখালে তারা বিধবা হয়। এটা তোমার কর্তামশাইকে বলে দিও। বলে দিও যে ভাজনঘাটের অধর সরকার এই কথা বলেছে—

আচ্ছা বলব—বলে গোলাম মোল্লা আবার সাইকেলে চড়ে বসল। তারপর পা চালিয়ে স্টেশনের দিকে চলে গেল।

কিন্তু স্টেশনে পৌঁছে সে হতবাক হয়ে গেল। স্টেশনের কাছাকাছি যাবার আগেই একজন বললে, ওদিকে যেও না হে, পুলিশের লাঠি খাবে।

কেন, পুলিশের লাঠি খাব কেন ? আমি কী করেছি ? আমি তো কর্তামশাইয়ের খবরের কাগজ আনতে যাচ্ছি—

সবাই তখন দৌড়ে পালাচ্ছে। অন্যদিন গম্ গম্ করে স্টেশন। লোকের আর খদ্দেরদের ভিড়ে জায়গাটা সরগরম থাকে সকালবেলাটা। কিন্তু সেদিন দেখা গেল পুলিশের ভিড়। সারা জায়গাটা পুলিশে পুলিশে ছেয়ে গেছে।

গোলাম মোল্লা সেদিকে যাবে কিনা ভাবতে লাগল। একজন লোককে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী হয়েছে গো ওখানে?

লোকটা বললে, ওখানে পাঁচু ক্রালী শা'র মদের দোকানে পিকেটিং করছে কংগ্রেসের ছেলেরা।

কেন?

লোকটা বললে, কংগ্রেসের ভলান্টিয়াররা মদ বেচতে দেবে না। পুলিশ সব ভলান্টিয়ারদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে—ওদিকে যেও না তুমি, তোমাকেও পুলিশে ধরবে।

গোলাম মোল্লার খবরের কাগজ কেনা হল না। সুলতানপুরে এসে বাবাকে সব বললে গোলাম মোল্লা। বাবা সব শুনে অবাক হয়ে গেলেন। দেশবন্ধু যেবারে সুলতানপুরে এসেছিলেন সেবারই বলে গিয়েছিলেন যে মদ্য বর্জন আন্দোলন করবে কংগ্রেস। কিন্তু তিনি তো অঞ্চল কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট, তাঁর কাছে তো কোন খবর আসেনি।

বিকেলবেলার দিকে শরৎ আড্ডি তার ছেলে ভূপেশ আড্ডিকে নিয়ে বাবার কাছে এলো। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর শরৎ, কী মনে করে?

শরৎ আড্ডির মুখটা কাঁদো কাঁদো। বললে, খবর শুনেছেন কর্তামশাই?

বাবা বললেন, কী খবর বল তো?

শরৎ আড্ডি বললে, আজ্ঞে, কেষ্টগঞ্জে নাকি মদের দোকানে হামলা হয়েছে। আপনি শোনেননি?

বাবা বললেন, শুনেছি, গোলাম আমাকে বলেছে—

শরৎ আড্ডি বললে, তাহলে কী হবে? সুলতানপুরেও যদি হামলা হয়?

বাবা বললেন, আমার কাছে তো মণ্ডল কংগ্রেস থেকে কোন খবর আসেনি। যদি তা হয় তো হবে।

তাহলে আমার কী হবে? আমি তো গভর্ণমেণ্টের লাইসেন্স নিয়েই কারবার করি। আমার দোকানেও যদি মদ বিক্রি বন্ধ করেন আপনি তো আমি খাব কী? কী খেয়ে আমি বাঁচব? আপনারা তো আমার দিকটাও দেখবেন!

বাবা বললেন, তুমি একটা কথা বুঝে দেখ শরৎ, কংগ্রেস তোমাকে পেটে মারতে চায় না, কিন্তু মদটা কি ভালো জিনিস? তোমার

দোকানে যারা মদ খেতে যায়, তারা এ-গাঁয়েরই লোক। তাদের তো সকলকেই তুমি চেনো! তাদের অবস্থা কি ভালো? মদ খেয়েই যদি তাদের যে-ক'টা টাকা আছে সব খরচা হয়ে যায় তাহলে তারা বউ-ছেলে-মেয়েদের কি খাওয়াবে?

শরৎ আড্ডি বললে, সে তো আমি বুঝি। কিন্তু ওই ব্যবসাটাই তো আমি এতকাল ধরে করে আসছি। আর তো কোন ব্যবসা আমি করিনি কখনও, আর অন্য কোন ব্যবসাও আমি বুঝি না। আমার তাহলে কি হবে?

বাবা বললেন, দেখ শরৎ, আমি ও-সব বুঝি না। আমার কাছে যদি কংগ্রেস থেকে অর্ডার আসে, তাহলে আমাকে প্রেসিডেণ্ট হিসেবে তা পালন করতেই হবে। আর তাছাড়া এটা তো ভালো বোঝ যে মদ খাওয়া ভালো নয়! কি—জবাব দাও?

আজ্ঞে, মদ খাওয়া যে ভালো নয় তা তো আমি ভালোই জানি।

বাবা বললেন, তুমি কি নিজে মদ খাও?

আজ্ঞে না, আপনাকে আমি মিছে কথা বলব না। আমি মদ খাই না। মদ কি-রকম খেতে তা আমিও জানি না, আমার এই ছেলেও জানে না।

তাহলে? মদ বেচা বন্ধ হওয়াই তো ভালো!

শরৎ আড্ডি বললে, তা তো আমি জানি। কিন্তু দোকান বন্ধ হলে আমি খাব কি?

কেন, মদ বেচে তুমি কত জমি-জমা করেছ, তা তো আমার জানতে বাকি নেই। আর পাঁচজন যেমন জমি-জমা চাষ-বাস করে চালাচ্ছে তুমিও তেমনি করবে। তুমিও তেমনি করেই খাবে।

শরৎ আড্ডি আর কিছু বললে না। চুপ করে রইল। তারপর উঠে দাঁড়াল। বললে, তাহলে আমি এখন আসি কর্তামশাই। আমাদের এখানে কবে থেকে হামলা শুরু হবে?

বাবা বললেন, এখন আমি তা কি করে বলব? আগে আমার কাছে চিঠি আসুক তখন আমি ঠিক করব। তখন আমিও জানতে পারব, তুমিও জানতে পারবে।

শরৎ আড্ডি আর দাঁড়াল না, ছেলেকে নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

মনে আছে সে-সব দিনগুলো যেন আগুন দিয়ে ঘেরা। সুলতানপুর

আগে যেমন শান্ত-শিষ্ট দিন ছিল, পরে ঠিক তেমনি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল।

আর কলকাতার খবর ছিল আরো ভীষণ।

বাবা খবরের কাগজ পড়তেন আর সুলতানপুরের সবাইকে যতটুকু সম্ভব শোনাতেন। সুলতানপুরের সবাই গোল হয়ে বসে সে-খবরগুলো শুনত। কোথায় বিলিতি কাপড় পোড়াবার জন্যে কত লোককে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে, কোথায় মহাত্মা গান্ধী কি বিবৃতি দিয়েছেন, বিলেতের পার্লামেন্টে কে কি বলেছে তার বিশদ বিবরণ ছাপা হত খবরের কাগজে।

বাবা খবর শোনাতেন আর বলতেন, এবার ইংরেজ ব্যাটাদের দেশ ছেড়ে পালাতেই হবে। লর্ড কার্জন একবার বাঙলাদেশকে দু'খণ্ড করবার চেষ্টা করেছিল তা বাঙালীদের চেষ্টাতেই রদ হয়েছিল। ক্ষুদিরাম মজঃফরপুরে কিংসফোর্ড সাহেবের ওপর বোমা মারবার চেষ্টা করেছিল, সে-সব গল্পও বাবা সব লোককে শোনাতেন।

বিশেষ করে গুণধর কর্মকারের ছেলে ভানু কমকারের দলের ছেলেরা মন দিয়ে শুনত। তাদের লক্ষ্য করেই বাবা বলতেন, তোমরাই আমাদের ভরসা ভাই। তোমরা সবাই এক-একজন ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, অরবিন্দ, বারীন ঘোষ হতে পারো না? আমি আর ক'দিন? আমি আর বেশিদিন নেই। কিন্তু তোমরা যে-দেশে মানুষ, সেই দেশটাকে স্বাধীন করতে তোমাদেরই সামনে এগিয়ে আসতে হবে।

আগে বাবা এমন ছিলেন না। গ্রামে আর পাঁচজন মানুষ যেমন করে খেয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটাত বাবাও তাই করে দিন কাটাতেন। আর তাছাড়া সুলতানপুর তখন ছিল বলতে গেলে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। একটা খবরের কাগজও আসত না গ্রামে। দেশের নেতাদের মধ্যেও কেউ কখনও সুলতানপুরে আসত না।

গ্রামের মানুষদের জলের জন্যে আগে বরাবর সেই নদীতে যেতে হত। ইছামতী নদী। মেয়েরা পেতলের ঘড়া নিয়ে নদীতে স্নান করতে যেত, আর আসবার সময় ভিজে কাপড়ে এক ঘড়া খাবার জল নিয়ে আসত নদী থেকে। স্নান বল, কাপড় কাচা বল সব কিছু কাজের জন্যে ছিল ওই নদী।

বাবা অনেকদিন ধরে ভাবছিলেন এর একটা বিহিত করতে হবে। ইউনিয়ন বোর্ডে গিয়ে অনেকবার ধর্ণা দিয়েছেন, তারা কিছুই করেনি।

শুধু মিথ্যা স্তোক-বাক্য দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু সেবার তিনি নিজেই কাজে নেমে গেলেন। আশে-পাশের সব গ্রামেই একটা-দুটো করে টিউবওয়েল হয়েছিল। শুধু সুলতানপুরেই কিছু হয়নি। সবাই একদিন বাবাকে এসে ধরল, কর্তামশাই, আপনি এর একটা কিছু বিহিত করুন, আর তো পারি না আমরা—

বাবা তাদের কথা দিলেন। বললেন, ঠিক আছে, ইউনিয়ন বোর্ড যখন কিছু করবে না, তখন আমি নিজের পয়সাতেই ওটা করে দেব—

মনে আছে যেদিন বারোয়ারিতলায় টিউবওয়েল থেকে প্রথম জল উঠল, সবাই এসে সেখানে জড়ো হয়েছিল। জল দেখে সকলের কী আহ্লাদ। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল বাবাকে।

তা শেষ পর্যন্ত একটা টিউবওয়েলে হল না। পশ্চিম পাড়াতেও একটা টিউবওয়েল করে দিতে হল। খাঁটি জল খেয়ে লোকে বাঁচল। আর কাউকে খাবার জলের জন্যে এক মাইল ঠেঙিয়ে নদীতে যেতে হল না। আর নদীতে ছিল আবার কুমীরের উৎপাত।

আর শুধু তো টিউবওয়েল নয়, আরো অনেক সমস্যা ছিল সুলতানপুরের। চলা-ফেরার সুবিধের জন্যে ভালো রাস্তা ছিল না সুলতানপুরে। বর্ষার সময় রাস্তা জলে ডুবে যেত। তখন গরুর গাড়িও চলতে গেলে কাদায় চাকা ডুবে যেত। ধান পাট বেচতে যে কেষ্টগঞ্জের বাজারে যাবে তারও সুবিধে ছিল না চাষীদের।

সাধারণের এ-সব কাজ ইউনিয়ন বোর্ডের। কিন্তু তাদের ছিল একমাত্র অজুহাত, টাকার অভাব। বাবা তখন ভানুদের ডাকলেন। ভানুদের বন্ধুরাও এলো। কর্তামশাই ডেকেছেন, সুতরাং না এসে তারা পারে না।

বাবা তাদের সবাইকে ডেকে বললেন, তোমরা আমার কথা শুনবে?

তারা বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তামশাই—

আমি তোমাদের যা করতে বলব তোমরা করবে?

তারা বললে, হ্যাঁ কর্তামশাই, করব—

বাবা বললেন, তাহলে তোমাদের বলি, তোমাদের সকলকে গাঁয়ের রাস্তা মেরামত করতে হবে—

কথাটা শুনে তারা প্রথমে চুপ করে রইল। বুঝতে পারলে না কিছু।

বাবা বললেন, সুলতানপুরের চাষীরা গঞ্জে যেতে পারে না বর্ষার দিনে। গাড়ির চাকা কাদায় বসে যায়, তোমরা পাশের জমি থেকে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে রাস্তায় ফেলে রাস্তা উঁচু করবে। ভেবো না, তার জন্য কিছু পাবে না। যারা কাজ করবে তারা হাত-খরচের টাকা পাবে আমার কাছ থেকে।

তখন সবাই রাজি হল।

প্রথম প্রথম আপত্তি উঠেছিল জমির মালিকদের কাছ থেকে। কিন্তু বাবা যখন সমস্ত বুঝিয়ে দিলেন যে তাদের ক্ষতি হওয়ার চেয়ে লাভটাই বেশি তখন তারা রাজী হয়ে গেল। বৃষ্টির জল রাস্তায় এসে পড়লে তাদেরই ক্ষতি, বরং জমির পাশের গর্ততে জলটা জমে থাকবে, গ্রীষ্মকালে সেই জমা জল ক্ষেতে সেচের কাজে লাগবে।

আমি তখন কলকাতায় থেকে পড়তাম। গরমের ছুটিতে দেশে এসেছিলাম। আমাকেও সকলের সঙ্গে কোদাল ধরতে হল। গরমে ঘেমে নেয়ে উঠতাম মাটি কোপাতে কোপাতে।

মা বাবাকে বললে, খোকাকে আবার ও-কাজে লাগালে কেন?

বাবা মা'র আপত্তি শুনলেন না। বললেন, পরের ছেলেরা কাজ করবে, আর আমার ছেলে বাড়িতে বসে আরাম করবে—এটা দেখলে লোকে খারাপ বলবে না? আর কাজ করলে তো ওর শরীরও ভালো থাকবে।

মা কোনদিনই বাবার কথার ওপর কথা বলত না। বাবার কথায় মা চুপ করে গেল।

তারপর দেখতে দেখতে সুলতানপুর থেকে ভাজনঘাট পর্যন্ত রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। যখন বর্ষা এলো তখন আর রাস্তায় জল জমল না। সব জল রাস্তার দু'পাশের ডোবাতে জমা হয়ে রইল।

মা বললে, তুমি কত টাকা নষ্ট করলে বল তো?

বাবা বললেন, কিন্তু কত লোকের উপকার হল সেটা তো কই একবারও বলছ না—

মা বললে, তা তো হল, কিন্তু গাঁয়ের লোক কি তা মানবে?

বাবা বললেন, না মানুক, মুখে হয়তো মানবে না, কিন্তু মনে মনে তো সবাই স্বীকার করবে।

তা মা ঠিকই বলেছিল, সুলতানপুরের লোক কিন্তু সত্যিই অকৃতজ্ঞ। তারা বলতে লাগল, কর্তামশাই নিজের সুবিধের জন্যে

রাস্তা-ঘাট করে দিলেন—

বাবার কানেও এলো। তিনি বললেন, কে বলছে ও-সব কথা?

গোলাম মোল্লা বললে, ওই ভাজনঘাটের অধর সরকার, আমি খবরের কাগজ আনতে যাচ্ছিলাম তখন আমাকে ডেকে বলল—

বাবা বললেন, তুই কি বললি?

গোলাম মোল্লা বললে, আমি আর কি বলব, আমি ওদের কোন কথার জবাব দিই না—

বাবা বললেন, দিবিনে জবাব। যখনই শুনবি কেউ আমার নিন্দে করছে তখনই বুঝবি আমি ঠিক কাজ করছি। আর যখনই শুনবি কেউ আমায় ভালো বলছে তখনই বুঝবি আমার কোথাও গলদ আছে।

আগে বাবা খেয়ে দেয়ে দুপুরবেলা ঘুমোতেন আর বিকেল বেলা গোলাম মোল্লা কি বাজু মাতলাদের সঙ্গে গল্প করতেন। সেবার কলকাতা থেকে এসে দেখলাম বাবা চরকায় সুতো কাটছেন আর মুখে কথা বলছেন। বাবা সেই সুতো গোলাম মোল্লাকে দিয়ে কেষ্ট গঞ্জে পাঠিয়ে দিতেন। সেখান থেকে সেই সুতোয় বাবার ধুতি, মা'র শাড়ি তৈরি হয়ে আসত। রাত্রে নাইট-স্কুলেও ছেলে-মেয়েরা সপ্তাহে একদিন চরকা কাটত। বাবার দেখাদেখি আরো অনেকেই চরকা কাটতে শুরু করেছিল। ভানু কর্মকার, তারাপদ, কার্তিক, অধীর— যারা এতদিন তাস খেলে সময় কাটাত তারাও বাবার সঙ্গে জুটে গিয়েছিল। তারাও খদ্দর পরতে শুরু করেছিল। দেখলাম সুলতানপুর গ্রামে একটা নতুন হাওয়া বইছে। টাকা পয়সা তেমন কারো হাতে এলেও সবাই ভাবতে আরম্ভ করেছে নতুন করে। ভাবছে ইংরেজরা চলে গেলেই আবার দেশের লোকেরা সব চেয়ারে গিয়ে বসবে। আবার সকলে ভালো ভালো চাকরি পাবে।

শরৎ আড্ডি সেদিন রাত আটটায় দোকান বন্ধ করে দিয়েছে। মানে দোকানের সামনের ঝাঁপটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পিছনের দরজা তার আধ-খোলা।

সে বাড়ি যাবে। কিন্তু যারা পুরোন খদ্দের তারা অনেকেই জানে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকলে তাদের রাস্তা খোলা থাকবেই। তখন নিঃশব্দে বোতল পাচার হয়। চিরকালই এমনি হয়ে আসছে। তখন ভিন্-গ্রাম থেকেও কিছু কিছু লোক আসে। শরৎ আড্ডি কি

তার ছেলে ভুপেন আড্ডি তাদের সকলেরই মুখ চেনে। একবার ভেতরে ঢুকতে পারলে আর কোন ভয় নেই। তখন আর কাউকেই হতাশ হয়ে ফিরতে হয় না।

এমনি করে অনেক দিন রাত ন'টা দশটা পর্যন্ত মাল কেনা-বেচা চলে। তাতে কেউ আপত্তি করে না। সরকারি এক্সসাইজ-ইন্সপেক্টার মাসে মাসে হিসেব দেখে পরীক্ষা করে যায়। তার সঙ্গে শরৎ আড্ডির গোপন বন্দোবস্ত আছে। তার হাতে শরৎ আড্ডি বেশ মোটা কিছু গুঁজে দেয়। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মাংস ভাত খেতে দেয়। ইন্সপেক্টার মশাই ভাত মাংস খাবার আগে ভালো বিলিতি মদ খায়। সে-ব্যবস্থা রাখতে হয় শরৎ আড্ডিকে।

তা এক্সসাইজ দারোগা সুকুমারবাবু অকৃতজ্ঞ মানুষ নয়।

শরৎ আড্ডি সেবার জিজ্ঞেস করলে, কেমন বুঝছেন সুকুমারবাবু?

সুকুমারবাবুর তখন বেশ নেশা জমে উঠেছে। জিজ্ঞেস করলে, কীসের কী বুঝব?

শরৎ আড্ডি সুকুমারবাবুর সামনে বশংবদ হয়ে থাকে বরাবর। বলতে গেলে সুকুমারবাবুর দয়াতেই এতদিন খেতে পরতে পাচ্ছে। তাকে খুশি রাখতে পারলে শরৎ আড্ডির কোন ভয় নেই। বললে, গঞ্জের মদের দোকানে কংগ্রেসীরা কী কাণ্ড করেছে তা শুনেছেন তো?

সুকুমারবাবু বললে, আরে আপনি রাখুন তো। এ হচ্ছে ইংরেজ রাজত্ব। কংগ্রেসীই বলুন আর যা-ই বলুন ইংরেজ গভর্মেণ্টের সঙ্গে কেউ পারবে? আপনাদের গান্ধী তো ছার স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবও যদি আসে তাহলেও কিছু ক্ষতি করতে পারবে না, এই আপনাকে বলে রাখলুম।

কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে এখানে লেকচার দিয়ে গেলেন মদ খাওয়া বন্ধ করতে হবে?

সুকুমারবাবু গেলাসে আর একবার চুমুক দিয়ে বললে, ও সব দেশবন্ধু-টেশবন্ধুর কথা ছেড়ে দিন, কারো বাপের সাধ্যি নেই দেশ থেকে মদ বন্ধ করতে পারে। মদ এখন মানুষের রক্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

শরৎ আড্ডি বললে, আমি এখানকার কর্তামশাইয়ের কাছে গিয়ে ছিলুম। তিনি তো আমাকে আমার দোকান বন্ধ করতে বলে দিলেন। বললেন, কেষ্টগঞ্জে যা হয়েছে এই সুলতানপুরেও তাই হবে?

সুকুমারবাবু বললে, কর্তামশাইয়ের বাবারও সাধ্যি নেই মদ আর ঘুঁষ বন্ধ করে, এই কথা আমার কাছে শুনে রাখুন।

শরৎ আড্ডি খুশি হয়ে বললে, আর একটা বোতল খুলব স্যার?

সুকুমারবাবু বললে, আর নয়, আর নয়, আমি এবার উঠব—

সুকুমারবাবু উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গেল। ভাগ্যের জোর মেঝের ওপর পড়ে গেল না, চেয়ারের ওপরেই বসে পড়ল। বসে বললে, আর মাংস আছে?

শরৎ আড্ডি বললে, কী যে বলেন স্যার, মাংস থাকবে না? আপনার জন্যেই তো একটা খাসি কেটেছি। কত খাবেন খান না— বলে তখনই আবার এক প্লেট মাংস আনিয়ে দিলে।

মাংস খেয়ে যেন সুকুমারবাবু এবার একটু ধাতস্থ হল। শরৎ আড্ডি জিজ্ঞেস করলে, তাহলে স্যার বলছেন আমার কোন ভয় নেই?

সুকুমারবাবু বললে. আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে আপনি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোন, আপনার কর্তামশাই তো তুচ্ছ মানুষ, তিনি কী করবেন?

শরৎ আড্ডি বললে, কিন্তু স্যার, গ্রামের বখাটে ছোকরারা যে সব ওঁর হাতের মুঠোর মধ্যে, উনি খদ্দর পরছেন, সকলকে বিলিতি কাপড় পরতে মানা করে দিয়েছেন। সুলতানপুরে কেউ আর বিলিতি কাপড় পরে না। উনি বলেন ইংরেজদের সঙ্গে বন্দুক-গুলি দিয়ে তো পেরে উঠবেন না, তাই ইংরেজ ব্যাটাদের ভাতে মারবেন। তা মদ বন্ধ হলে তো ইংরেজ সরকারের এর থেকে আয়ও কমে যাবে।

সুকুমারবাবু বললে, ইংরেজরা এখানে এসেছে ব্যবসা করতে— মদ বন্ধ করবার চেষ্টা করলে তারা কি চুপ করে থাকবে? তাদের পুলিশ আছে, বন্দুক আছে, লাঠি আছে—তারা কি কংগ্রেসীদের ছেড়ে কথা বলবে?

শরৎ আড্ডি খানিকটা আশ্বস্ত হল সুকুমারবাবুর কথা শুনে। তারপর খেতে বলল সুকুমারবাবুকে। খাওয়ার এলাহি বন্দোবস্ত হয়েছিল। কিন্তু সুকুমারবাবুর পেটে তখন জায়গার অভাব। যেমন খাবার দেওয়া হয়েছিল তেমনিই সব পড়ে রইল। শেষকালে আর ওঠবার অবস্থাও ছিল না তার।

শরৎ আড্ডির গাড়ি ছিল। নিজের গরুর গাড়ি। গাড়ির ভেতরে তোষক পেতে আয়েস করে তার শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সুকুমার

বাবুকে ধরে উঠিয়ে সেখানে শুইয়ে দিতে হল। তারপর কয়েকটা নোট কাগজের বাণ্ডিল করে তার জামার পকেটে ঢুকিয়ে দিলে।

শরৎ আড্ডি বললে, স্যার, বাণ্ডিলটা আপনার জামার পকেটে রেখে দিলুম, খুব সাবধানে রেখে দেবেন স্যার—

সুকুমারবাবুর তখন আর কথা বলবার সামর্থ নেই। চোখ বোজা অবস্থাতেই বললে, ঠিক হ্যায়—

শরৎ আড্ডি বললে, স্যার ভূপেনকে আপনার সঙ্গে পাঠাব? সে আপনাকে আপনার বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসত।

সুকুমারবাবু বললে, তার দরকার নেই, আমি ঠিক আছি—

গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। শরৎ আড্ডি গাড়োয়ানকে খুব সাবধান করে দিলে। বলে দিলে যেন বাবুকে ধরে নামিয়ে সে বাড়িতে তুলে দিয়ে আসে—

গাড়ি চলতে লাগল। তখন শরৎ আড্ডি, ভূপেন আড্ডি সবাই নিশ্চিন্ত।

সেদিনও দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে যাচ্ছে শরৎ আড্ডি, হঠাৎ একটা অচেনা লোক পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল। শরৎ আড্ডি বললে, কি চান? এখন দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। আর মদ পাওয়া যাবে না—

অচেনা লোক বলেই এমন কথা বলতে পারলে শরৎ আড্ডি। নইলে খদ্দেরকে কখনো ফেরায় না সে।

লোকটা বললে, না মদ কিনতে আসিনি আমি। আমি এসেছি অন্য কাজে।

শরৎ আড্ডি লোকটার আপাদমস্তক দেখে নিলে একবার। তারপর জিজ্ঞেস করলে, কি কাজ?

লোকটা বললে, একটু নিরিবিলিতে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

শরৎ আড্ডি আরো অবাক হয়ে গেল। বললে, বলুন।

লোকটা বললে, আপনি ঝাঁপ বন্ধ করে নিন। পরে বলছি—

শরৎ আড্ডি দোকানের কেরোসিনের ডিবেটা নিভিয়ে দিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলে। তারপর বললে, এইবার বলুন কি কথা?

দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকটা বেশ ঘন অন্ধকারে

ডুবে গেল। দোকানের পিছনেই একটা গাছ। গাব গাছের পাতা-গুলো বেশ ঘন। সেই গাব গাছটার জন্যেই জায়গাটা আরো অন্ধকার-ময় হয়ে উঠল।

লোকটার মুখটা তখন আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আগে কেরোসিনের ডিবের আলোয় যতটুকু দেখা গেছে তাতে দেখা গেছে লোকটা অন্য কোন গ্রামের হবে। শরৎ আড্ডি লোকটার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

জিজ্ঞেস করলে, এখানটায় নিরিবিলি আছে, কি বলবার আছে বলুন।

শরৎ আড্ডির তখন একটু ভয়ও করছিল। পকেটে অতগুলো টাকা রয়েছে। লোকটা কেড়ে নেবে না তো? লোকটা আরো কাছে সরে এলো এবার।

গলাটা নামিয়ে একটু চুপি চুপি বললে, আপনি যেন শুনে ভয় পাবেন না, আমি পুলিশের লোক—

শরৎ আড্ডি চমকে উঠল। কথাটা শুনে একটু ভয় হল বৈকি। পুলিশের লোক তার কাছে কেন? পুলিশের লোকের সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক?

লোকটা বললে, আমাকে কেষ্টগঞ্জ থেকে বড় সাহেব পাঠিয়েছে।

শরৎ আড্ডি বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে, বড় সায়েব মানে?

লোকটা বললে, বড় সায়েব মানে পুলিশের বড় সায়েব।

শরৎ আড্ডি বললে, তা আমার সঙ্গে বড় সায়েবের কী সম্পর্ক? আমি কি দোষ করেছি?

লোকটা বললে না, আপনি কেন দোষ করতে যাবেন, আপনি কোন দোষ করতে পারেন না। আপনার যদি কোন বিপদ-আপদ হয় তাই বড় সায়েব আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

শরৎ আড্ডি যেন এতক্ষণে বুঝতে পারলে। বললে, শুনছি নাকি কংগ্রেস আমার দোকানে পিকেটিং করবে। আমাকে মদ বেচতে দেবে না। অথচ আমার কাছে তো মদ বিক্রী করবার সরকারী লাইসেন্স আছে। আমি কী দোষ করলুম বলুন তো? আমার মদের দোকান বন্ধ হয়ে গেলে আমি কী খাব বলুন তো? আমার চলবে কী করে? সেই কথা বলতেই তো আমি আজ কর্তামশাইয়ের কাছে গিয়েছিলুম—

তা তিনি কী বললেন ?

শরৎ আড্ডি বললে, কর্তামশাই বললেন কংগ্রেস হুকুম করলেই আমায় দলবল নিয়ে পিকেটিং করতে হবে। আমি তো এখানকার অঞ্চল প্রেসিডেণ্ট—

লোকটা বললে, সেই কথা বলবার জন্যেই তো আমায় বড়বাবু আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনার যদি কোন পুলিশ-ফোর্সের দরকার হয় তো আমাকে জানাবেন।

শরৎ আড্ডি বললে, যদি সুলতানপুরের লোক তা টের পায় ?

লোকটা বললে, টের পেলে তো আমার বড় সায়েব আছে।

শরৎ আড্ডি বললে, যদি তেমন কাণ্ড হয়, যদি আমার দোকানে কেউ বদমাইশি করে আগুন লাগিয়ে দেয়, তখন তো পুলিশকে ডাকতেই হবে।

লোকটা বললে, তার আগেই আমরা তৈরি থাকব। আপনার কোন ভয় নেই—

শরৎ আড্ডি লোকটার কথায় যেন আশার আলো দেখতে পেলে। জিজ্ঞেস করলে আপনার নামটা কী ?

লোকটা বললে, আমার নাম জেনে আপনার লাভ কী ? কাজের সময়েই সব জানতে পারবেন—

শরৎ আড্ডি জিজ্ঞেস করলে, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি তো ?

লোকটা বললে, আপনি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোন তো। আমার বড় সায়েবকে গিয়ে আমি সব জানিয়ে দেব। তবে একটা কথা···লোকটা বললে, আমি যে আজ আপনার সঙ্গে দেখা করে গেলুম এ কথা কাউকে বলবেন না যেন।

শরৎ আড্ডি বললে, না, আমি তা বলতে যাব কেন ? তাতে তো আমারই ক্ষতি—

লোকটা বললে, আমি আবার আসব।

কবে আসবেন ?

লোকটা বললে, সে আপনাকে বলব না। আমাদের তা বলা নিয়ম নেই। আমরা পুলিশের লোক, কখন আসব কখন যাব কেউ তা জানতে পারবে না। আপনাকে খবরও পাঠাতে হবে না।

শরৎ আড্ডি বললে, খবর না পাঠালে আপনারা জানতে পারবেন

কী করে ?

লোকটা বললে, সেইটেই তো মজা। কংগ্রেসের ভেতরেই আমাদের দলের লোক আছে। তারা বাইরে কংগ্রেসের মেম্বার, কিন্তু তারা আমাদের কাছ থেকে টাকা পায়। তারাই আমাদের রোজকার খবর দিয়ে যায়। নইলে কোথায় কী হচ্ছে তা আমরা কী করে জানতে পারি ?

শরৎ আড্ডি জিজ্ঞেস করলে, তারা কি আমাদের সুলতানপুরেরই লোক ?

লোকটা বললে, তা আপনাকে বলব না মশাই। বিভীষণ কি শুধু লঙ্কাতেই ছিল, সুলতানপুরে নেই ?

বলে আর দাঁড়াল না। আস্তে আস্তে অন্ধকারের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। শরৎ অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে কেমন অবাক হয়ে গেল। এই সুলতানপুরেও কংগ্রেসের মেম্বার সেজে পুলিশের লোক আছে ? কে সে ? কার কথা বললে লোকটা ? গুণধর কর্মকার, না রাজু মাতলা, না নিমাই ঘোষ ! না কি ওই ছোকরার দল ? ওই ভানু, অধীর, তারাপদ, কার্তিক কি ?

মনে আছে এর কিছুদিন পরেই একদিন বোধহয় ১৯২৪ সালে খবরের কাগজে পড়লাম দেশবন্ধু সি-আর-দাশ দার্জিলিং-এ মারা গেলেন। আমি তখন কলকাতায়। স্কুলের বোর্ডিং-এ থেকে পড়ি। খবরটা পেয়েই সমস্ত শহর কলকাতাটা যেন একেবারে নির্জীব হয়ে গেল। সেদিন শহরে বোধ হয় কোন মানুষ আর বাড়ির ভেতরে ছিল না। সবাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

দার্জিলিং থেকে তার মরদেহ কলকাতায় হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছুল। রাস্তায় রাস্তায় কাতারে কাতারে মানুষের ভিড়। সবাই একবার শেষ দেখা দেখতে চায়। তাঁর মরদেহটাকে কেওড়াতলার শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে। আমিও রাস্তায় বেরোলাম। হেঁটে হেঁটে শ্মশানের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

সমস্ত দিনটা যে কোথা দিয়ে কী করে কাটল খেয়াল ছিল না। মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু এসেছেন সবাই বলতে লাগল।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের দেখতে পেলাম না। সন্ধ্যে

হবার আগেই আবার বোর্ডিং-এ ফিরে এলাম। আমার কান্না পেতে লাগল। কেবল মনে পড়তে লাগল আমাদের সুলতানপুরের বাড়িতে যেদিন গিয়েছিলেন সেই দিনের কথা। বাবাকে তিনি কী কী বলে ছিলেন সমস্তই মনে পড়তে লাগল।

রাস্তার সবারই মনে তখন একই চিন্তা, এবার কি হবে? দেশবন্ধু মারা যাবার পর ইংরেজদের সঙ্গে কে লড়াই চালাবে? ইংরেজদের কে দেশ থেকে তাড়াবে? দেশবন্ধু ছাড়া আর কে নেতা আছে? মহাত্মা গান্ধী তো অনেক দূরে থাকেন। বাঙালীদের আর কে আছে? বাঙালীদের কথা কে ভাববে?

পরের দিন বাবার একটা চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন তুমি শনিবার দুপুরের ট্রেনে বাড়ি আসিও। বিশেষ একটা কাজ আছে, ইত্যাদি—

ভোর পাঁচটা পঁচিশের ট্রেনে শেয়ালদা স্টেশনে উঠে সকাল সাড়ে সাতটায় কেষ্টগঞ্জ স্টেশানে গিয়ে পৌঁছলাম। কেষ্টগঞ্জের বাজারের মধ্য দিয়ে রাস্তা। দু'পাশে বাজার বসেছে। বেচা-কেনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে তখন। মানুষের ভিড় এড়িয়ে রাস্তার মধ্যখান দিয়ে যাচ্ছি। ক'দিন আগেই এখানে মদের দোকানে পিকেটিং হয়েছিল। মদের দোকানটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

হঠাৎ পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে দেখা। ছোটবেলায় আমাকে সংস্কৃত পড়াতেন, তিনি সুলতানপুরের লোক, কিন্তু মাস্টারি করেন কেষ্টগঞ্জের স্কুলে। যাতায়াত করতে অসুবিধে হয় বলে তিনি কেষ্টগঞ্জে বাসা ভাড়া করে থাকেন। তাঁর আসল নাম শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য. ছাত্ররা পণ্ডিতমশাই বলে ডাকত তাঁকে.

আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালাম।

পণ্ডিতমশাই আশীর্বাদ করলেন। বললেন, কেমন আছ বাবা?

আমি বললাম, ভালো—

পণ্ডিতমশাই আবার জিজ্ঞেস করলেন, এখন ট্রেন থেকে নামলে?

বললাম, হ্যাঁ, বাবা লিখেছেন, তাই আসতে হল।

পণ্ডিমশাই বললেন, তোমার বাবা সুলতানপুরের জন্য যা করেছেন এমন আর কেউ আগে করেনি। গ্রামের লোকদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে কে এত করে বল? তোমার বাবা একজন মহাপুরুষ। আশীর্বাদ করি বাবা, তুমি তোমার বাবার মতো হও—

আমি জিজ্ঞেস করলাম, শুনলুম এখানেও নাকি মদ বেচা নিয়ে খুব গণ্ডগোল হয়েছে? আপনি জানেন কিছু?

পণ্ডিতমশাই বললেন, চরিত্রবলই মানুষের বড় বল বাবা। আমাদের চরিত্র বল যদি থাকত তো ইংরেজরা কি আমাদের ওপর এই অত্যাচার করতে পারত? এখন বন্দেমাতরম্ শব্দটা উচ্চারণ করলেও পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। সেদিন এখানে পঞ্চাশজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবককে লাঠি পেটা করে মেরেছে পুলিশ।

আমি বললাম, কিন্তু মদের দোকানে আগুন লাগাবার তো কথা ছিল না। কে আগুন লাগালে দোকানে? বাবা তো অহিংস লড়াইয়ের কথা বলেন।

পণ্ডিতমশাই বললেন, কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকদের তো কোন দোষ ছিল না। তারা তো পুরোপুরি অহিংস ছিল। শুধু সবাইকে মদ কিনতে বারণ করছিল। তাদের হাতে একটা লাঠিও ছিল না।

বললাম, তাহলে? আগুন লাগালে কে দোকানে?

পণ্ডিতমশাই বললেন, সেইটেই তো রহস্য। আমি তো সেখানেই দাঁড়িয়েছিলুম। আমি গোড়া থেকে সমস্ত দেখেছি। অনেক লোক বলছে পুলিশের লোকই সাদা পোশাকে মদের দোকানে আগুন লাগিয়ে লঙ্কাকাণ্ড করিয়েছিল। এই দেখ না—বলে তিনি নিজের হাঁটুটার ওপর কাপড় তুলে দেখালেন।

বললেন, আমার পায়ের ওপরেও পুলিশের লাঠি পড়েছিল। আমি এক মাস বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। আমিও পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাইনি, পুলিশ আমাকেও জেলে পুরেছিল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কেন জেলে পাঠিয়েছিল? আপনি কি করেছিলেন?

পণ্ডিতমশাই হাসতে লাগলেন। বড় ম্লান সে হাসি। বললেন, আমি নিরীহ লোকদের মারপিট করতে আপত্তি জানিয়ে ছিলাম। যারা মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু, সুভাষ বোসের ওপর অত্যাচার করতে পারে, তারা সব পারে বাবা। কিন্তু দোষ তো ইংরেজদের দিতে পারি না। কেননা, তারা হল রাজার জাত। তারা এ দেশ শাসন করতে এসেছে, তারা তো অত্যাচার করবেই। কিন্তু যারা মারপিট করছে তারা তো আমাদেরই দেশের লোক। তারা জানেও না যে দেশ স্বাধীন হলে ওদের ভালো হবে—

পণ্ডিতমশাই যাবার সময় বললেন, বুঝলে বাবা, তাই বলছিলুম চরিত্রবলই বড় বল, তোমার বাবা বরাবর আমাকে বলতেন দেশের মানুষের চরিত্রটাই নষ্ট হয়ে গেছে—

তিনি চলে গেলেন। আমি সুলতানপুরের দিকে হাঁটা-পথে পাড়ি দিলাম।

আমি যখন সুলতানপুরে পৌঁছলাম তখন বেলা এগারোটা বেজে গেছে। বাবা বাড়ি ছিলেন না। বাড়িতে মা ছিল। আমাকে দেখে মা খুব খুশি হল। তাড়াতাড়ি আমার খাবারের বন্দোবস্ত করতে লেগে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, মা, বাবা কোথায়?

মার মুখটা যেন ভার-ভার। বললে, তিনি তো আজকাল বাড়িতে বেশি থাকেন না। কেবল পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ান।

জিজ্ঞেস করলাম, কি এত কাজ তাঁর?

মা বললে, ছাই কাজ। যত সব ছোটলোকদের পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে তাদের বোঝাচ্ছেন, তোমরা মদ খেও না। মদ খাওয়া খারাপ।

বললাম, আর শরৎ আড্ডি?

মা বললে, শরৎ আড্ডি তো এসেছিল ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। উনি তাকে খুব ধমকে দিয়েছেন। বলেছেন মদ খাইয়ে তুমি দেশের লোকের চরিত্র নষ্ট করে দিচ্ছ। তা সেটা তার ব্যবসা। সে মদ বেচে খায়, সে সে-কথা শুনবে কেন? সে রেগে-মেগে চলে গেল।

ছুপুরবেলার দিকে বাবা বাড়ি এলেন। সঙ্গে সুলতানপুরের আরো অনেক ছেলে। তাদের সকলের হাতে কাগজের তৈরি কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ। সারা সুলতানপুর তারা টহল দিয়ে এসেছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছে, বন্দেমাতরম্—

বেশি করে চেঁচিয়েছে শরৎ আড্ডি আর মনোহর শার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। উদ্দেশ্য: আগামী কাল মিটিং আছে বারোয়ারীতলায়। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ক'টার ট্রেনে এলে?

বললাম, ভোর পাঁচটা-পঁচিশের ট্রেনে—

তারপর বললেন, শুনেছ তো, দেশবন্ধু মারা গেলেন? এখন আমার কাজ বেড়ে গেল। বিনোদ মাইতি মশাই এসেছিল। তার কাছে সব কথা শুনলাম। এখন আমাদের ওপরেই সব কাজের ভার পড়ে গেল। কাজ তো তা বলে বন্ধ করা চলবে না। আজকে সারা

সুলতানপুরে ঘুরে ঘুরে কালকের মীটিং-এর কথা জানিয়ে এলাম। দেখি কী হয়।

বাবাকে দেখে যেন খুব চিন্তিত মনে হল। ছেলের দলকে বললেন, তোমরা এখন সব বাড়ি চলে যাও, সন্ধেবেলা আবার সবাই এসো—

চেয়ে দেখলাম সকলেরই খুব উৎসাহ। যেন সে সুলতানপুর আর নেই। রাস্তা দিয়ে আসবার সময়েই তার পরিচয় পেয়েছিলাম। সুলতানপুরে ঢুকতেই দেখা হয়েছিল যতীন কাকার সঙ্গে। যতীন মৌলিক মশাইকে আমি কাকা বলে ডাকতাম। যতীন কাকা বললেন, কী, দেশে এলে ?

বললাম, হ্যাঁ, বাবার চিঠি পেয়েই আসছি।

যতীনকাকা বললেন, তোমার বাবার জন্যেই আমরা গাঁয়ে বেঁচে আছি খোকা। আগে রাস্তার কী অবস্থা ছিল দেখেছিলে তো, আর এখন কী অবস্থা হয়েছে দেখ। আগে তো বর্ষার সময় এখানে এক হাঁটু জল জমত। এই সব কিছু তোমার বাবার জন্যেই হল। ইউনিয়ন বোর্ড তো কিছু কাজ করেনি।

আমি এর জবাবে আর কী বলব। তারপরে বারোয়ারিতলায় আসতেই দেখি বিরাট বটগাছটার ডালে কংগ্রেসের তেরঙা ফ্ল্যাগ উড়ছে। কার্তিক আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো। সে ফ্ল্যাগ টাঙাচ্ছিল। বললে, খোকাদা তুমি এসে গেছ। ভালোই হয়েছে। কাল এখানে মীটিং আছে—

বাবা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলেন। খেতে খেতেই আমাকে বললেন, তোমাকে ডেকেছি কালকের মিটিংয়ের জন্যে। রাস্তায় আসবার সময় কিছু দেখলে ?

বললাম, দেখলাম। ফ্ল্যাগ টাঙানো হয়েছে জায়গায় জায়গায়—

বাবা বললেন, আমি আজ সকাল থেকে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে এলাম।

বললাম, যতীন কাকার সঙ্গে আসবার সময় দেখা হল। তিনি বললেন আপনার জন্যেই গ্রামের রাস্তা-ঘাট সব তৈরী হয়েছে।

বাবা বললেন, ওরা আমাকে খুব সাহায্য করেছে। ওই ভানু, তারাপদ, কার্তিক অধরের দল। এতদিন কাজ পায়নি বলে কেবল বসে বসে তাস পিটত। এখন কাজ দিয়েছি, আর সামান্য হাত-.

খরচাও দিচ্ছি ওদের।

এতক্ষণ মা পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল। এবার মা বললে, এত খরচ করলে শেষকালে সংসার চালাব কি করে বুঝতে পারছি না।

বাবা বললেন, আরে তুমি কেবল তোমার নিজের সংসারটার কথাই ভাবছ, এদিকে মানুষের অবস্থার কথাটা ভেবেছ? ওই গঞ্জের রাস্তাটার কথাই ধর না। ওই শোন না, মালোপাড়ার যতীন মৌলিক খোকাকে কি বলেছে—

মা বললে, কিন্তু খরচটা তো সব তোমার পকেট থেকেই গেল। আর কেউ তো একটা পয়সাও বার করলে না—

বাবা বললেন, তা না বার করুক, আমার পয়সা আছে, আমি খরচা করেছি। আমার একটা ছেলে। ওর আর কত টাকা লাগবে। আমার জমি-জমা তো রইল। ওইতেই ওর যথেষ্ট চলে যাবে।

তারপর আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে লেখা-পড়া শেখাচ্ছি, আবার কি চাও তুমি? তুমি কি বড়লোক হতে চাও? দেশবন্ধুর কথা মনে নেই? তিনি কত টাকা উপার্জন করেছিলেন, কিন্তু সব তো দেশের জন্যে দান করে গেলেন। শেষ জীবনে একটা পয়সাও তাঁর ছিল না। অথচ ব্যারিস্টারি করলে তিনি কত টাকা উপায় করতে পারতেন। তা দেশ বড় না টাকা বড়?

আমি কিছু বললাম না। বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে দেশ বড় না টাকা বড়? জবাব দাও?

বললাম, দেশই বড় বাবা।

আমার কথা শুনে বাবা যেন খুব খুশি হলেন মনে হল। আমাকে তিনি আর কিছু বললেন না। বলবার সুযোগও হল না। বাইরে কে যেন ডাকতে এলো। আমিও বাবার সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপে গেলাম। দেখলাম চণ্ডীমণ্ডপের ভেতরের চেহারা বদলে গিয়েছে। দেশবন্ধুর একটা বিরাট ছবিতে একটা টাট্‌কা ফুলের মালা ঝুলছে।

যে ভদ্রলোক এলেন তিনি হচ্ছেন বিনোদ মাইতি মশাই। বাবা যেতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি সোজা কলকাতা থেকে আসছি। আপনাদের এখানকার সব ব্যবস্থা পাকা তো?

বাবা বললেন, আমি তো সকাল থেকে সুলতানপুর চষে বেরিয়েছি।

বিনোদ মাইতি মশাই বললেন, দেশবন্ধু মারা যাওয়ায় আমাদের দায়িত্ব এবার আরো বেড়ে গেল।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কে কে এসেছিলেন কলকাতায়।

বিনোদ মাইতি বললেন, মহাত্মা গান্ধী ছিলেন, সরোজিনী নাইডু সবাই এসেছিলেন। এখন কে বেঙ্গল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হবে তাই নিয়ে মীটিং হবে আজকালের মধ্যেই। আমি সেই নিয়েই খুব ব্যস্ত। সেই কথা বলতেই আমি সুলতানপুরে এসেছি। বলতে এসেছি যে কালকে আপনাদের মিটিং-এ আমি থাকতে পারব না। কিন্তু তা বলে আপনাদের এখানকার কাজ বন্ধ রাখলে চলবে না। আপনার নাইট-স্কুল চলছে তো?

বাবা বললেন, হ্যাঁ, সব ঠিক ঠিক চালাচ্ছি—

বিনোদ মাইতি বললেন, আর চরকা কাটা?

বাবা বললেন, সেও চলছে। সুলতানপুরে একটাই কাপড়ের দোকান চলছিল তাতে আর বিলিতি কাপড় আনতে দিচ্ছি না। আপনি কলকাতায় গিয়ে কিছু খদ্দরের ধুতি-শাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন?

বিনোদ মাইতি বললেন, কেন পারব না? খাদি-ভাণ্ডারকে বললেই তারা এখানে পাঠিয়ে দেবে। কোন ঠিকানায় পাঠাতে হবে বলুন?

বাবা বললেন, আমার ঠিকানায়। ভাবছি আমিই আমার চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বিনা লাভে খদ্দরের ধুতি-শাড়ি বেচব। যদি খরচ-খরচা বাদ দিয়ে কিছু লাভ থাকে তো সে কংগ্রেস-ফাণ্ডে যাবে।

বিনোদ মাইতি মশাই বললেন, ঠিক আছে। আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব। কাল তাহলে আপনাদের মিটিং হচ্ছে? কখন হবে মিটিং?

এই বিকেল পাঁচটা-ছ'টার সময়। গ্রামের লোকের ক্ষেত-খামারের কাজ শেষ হলে লোক আসে।

বিনোদ মাইতি মশাই বললেন, আর মদের দোকানে পিকেটিং কখন হবে?

বাবা বললেন, ওই একই সময়ে আরম্ভ হবে। সন্ধ্যেবেলাটাতেই মদের খদ্দের বাড়ে—

এরপরে বিনোদ মাইতি মশাই আর বেশিক্ষণ থাকলেন না। তাঁর অনেক কাজ। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে তাঁর কলকাতাতে যেতেই হবে।

শুধু তাই-ই নয়। তাঁর গতি সর্বত্র। আজ কলকাতা, কাল সুলতানপুর, পরশু মেদিনীপুর, তার পরদিন হয়তো আবার ঢাকা, ফরিদপুর কিম্বা বরিশাল। সারা দেশময় তাঁর গতিবিধি। এক জায়গায় তাঁর বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব হয় না।

সন্ধ্যেবেলা ছেলেরা এলো। এলো ভানু, তারাপদ, অধীর, কার্তিক। আরো অনেক ছেলে। তাদের সকলকে বাবা সন্ধ্যেবেলা আসতে বলে দিয়েছিলেন। তারাই বাবার নাইট-স্কুলে ছেলে-মেয়েদের পড়াত। তারাই সুলতানপুরের রাস্তা করে দিয়েছে নিজের হাতে। বাবা তাদের সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কাল তোমরা সবাই বেলাবেলি আসবে, মনে আছে তো ?

তারা সবাই বললে, হ্যাঁ জ্যাঠামশাই, আমরা সকলকে বলে রেখেছি—

বাবা বললেন, আমি তোমাদের আবার বলে রাখছি, কেউ কোন রকম হিংসামূলক কাজ করবে না। দেশবন্ধু আমাকে বার-বার বলে দিয়ে গেছেন হিংসাকে হিংসা দিয়ে কখনও প্রতিরোধ করা যায় না। ইংরেজ সরকারের হাতে বন্দুক আছে, কামান আছে, সৈন্য-সামন্ত আছে, আর আমরা নিরস্ত্র। আমাদের হাতে একটা লাঠিও নেই। লাঠি থাকলেও পুলিশ আমাদের গ্রেফতার করবে। সুতরাং ইংরেজদের হারাতে গেলে আমাদের একমাত্র অস্ত্র হল অহিংসা। দরকার হলে আমরা মরব, তবু মারব না ওদের। মহাত্মাজী বলেছেন এই অস্ত্র দিয়েই আমরা ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়াব। দক্ষিণ আফ্রিকাতে এমনি করেই মহাত্মাজী ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছেন। কাল যখন শরৎ আড্ডির মদের দোকানে তোমরা পিকেটিং করবে তখন একটা জিনিস সম্বন্ধে খুব সাবধানে থাকবে। কারোর কোন প্ররোচনাতে তোমরা উত্তেজিত হবে না। তোমাদের গায়ে যদি পুলিশের লাঠিও পড়ে তোমরা মাথা পেতে তা সহ্য করে যাবে। বুঝলে ?

সবাই বাবার কথায় বলে উঠল, হ্যাঁ।

বাবা আবার বলতে লাগলেন, হয়তো পুলিশ এসে তোমাদের গ্রেফতার করবে। তবু কিন্তু তোমরা তাদের বাধা দিতে পারবে না। বুঝলে ?

সবাই বললে, হ্যাঁ—

বাবা আবার বললেন, দেখ, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো

রেগে যেতে পারো। কারণ কেউ অন্যায় করতে দেখলে অনেকেরই রাগ হওয়া স্বাভাবিক। শরৎ আড্ডির ব্যবসার ক্ষতি হলে সে তোমাদের গালাগালি দিতে পারে। বাইরে থেকে গুণ্ডা এনে তোমাদের লাঠি পেটা করতে পারে। তবু তোমাদের মুখ বুঁজে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করতে হবে। পারবে তো?

সবাই বললে, পারব জ্যাঠামশাই, পারব।

বাবা আবার বলতে লাগলেন, দেখ, এ সত্যাগ্রহ আমাদের এক দিনের নয়। কাল থেকে বরাবর প্রতিদিন এই সত্যাগ্রহ করে যেতে হবে। দেখতে হবে যেন মদের দোকানে কোন খদ্দের না ঢুকতে পারে।

অধীর জিজ্ঞেস করলে, যদি কেউ জোর করে দোকানে ঢুকতে চায়?

বাবা বললেন, তোমরা তাকে অনুরোধ করবে যেন সে মদ না কেনে। তাকে বোঝাবে যে মদ খাওয়া খারাপ, তাতে টাকাও নষ্ট, শরীরও নষ্ট—

অধীর আবার জিজ্ঞেস করলে, যদি আমাদের কথা না শোনে সে? যদি আমাদের ঠেলে দোকানে ঢুকতে চায়?

বাবা বললেন, যদি দোকানে ঢুকতে চায় তো তবুও তার গায়ে হাত দিতে পারবে না। দরকার হলে দোকানে ঢোকবার রাস্তায় তোমরা শুয়ে পড়বে। যদি তারা ঢোকে তো তোমাদের মাড়িয়ে তারা ঢুকুক।

কার্তিক জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা জ্যাঠামশাই, আমরা কী বলে শ্লোগান দেব? কী বলে সকলকে আমরা বোঝাব?

বাবা বললেন, আমি তো তোমাদের সঙ্গে থাকব। আমিও তো সত্যাগ্রহ করব। আমি যা বলব তোমরা তার প্রতিধ্বনি করবে। আমি বলব, মদ খাওয়া বন্ধ করুন। তোমরাও বলবে মদ খাওয়া বন্ধ করুন। আমি বলব বন্দেমাতরম্, তোমরাও বলবে বন্দেমাতরম্।

তারপরে আরো দু-একটা কথার পর সবাই যে-যার বাড়ি চলে গেল। বাবা আর আমি তখন একলা। আমি বাবার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। দেখে মনে হল বাবা যেন এই ক'মাসেই সম্পূর্ণ বদলে গেছেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, তোমার ভয় পাচ্ছে?

আমি আর কী বলব। বললাম, না।

বাবা বললেন, ভয়টাই সবচেয়ে বড় পাপ। ভয়টাকে যদি জয় করতে পারো তাহলেই তুমি সবকিছুকে জয় করতে পারবে। গোড়াতে আমারও খুব ভয় হত। কিন্তু এই বয়েসে এসে বুঝে গিয়েছি যে

ভয়কে ভয় করলেই সে তোমাকে গ্রাস করবে। মৃত্যু তো একদিন আসবেই, কিন্তু সেই মৃত্যু আসবার আগেই যে মরে যায় তাকেই বলে ভীরু। যে মানুষ হয় সে কখনও মরার আগে মরে না। রোগে ভুগে মরার চেয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে যে মরে সে-ই হল আসল বীর—

সেদিন বাবা আরো অনেক কথা আমাকে বলেছিলেন, আজ সে-সব কথা এখন পুরো মনে নেই। তখন বাবার কথা শুনে কেবল মনে হয়েছিল এসব কথা বাবা কার কাছ থেকে শিখেছিলেন? দেশবন্ধুর কাছ থেকে কি?

আমরা দু'জনেই চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ভেতর-বাড়ির দিকে যাবার উপক্রম করছিলাম। হঠাৎ সেই অত রাত্রে শরৎ আড্ডি মশাই চণ্ডীমণ্ডপের ভেতরে এসে হাজির হল। বাবা তাকে সেই অসময়ে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, এ কী শরৎ, তুমি এত রাত্রে?

শরৎ বললে, আমি আপনার কাছে একটু দরবার করতে এসেছি কর্তামশাই।

বাবা বললেন, আমার কাছে কীসের দরকার? আমি কী করতে পারি?

শরৎ বললে, আপনিই সুলতানপুরের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। ইচ্ছে করলে আপনি আমাকে রাখতেও পারেন আবার মারতেও পারেন।

বাবা বললেন, না, আমি তা পারি না। আমি কংগ্রেসের দাস। কংগ্রেস আমাকে যা বলবে আমি তাই করতে বাধ্য।

শরৎ বললে, আপনাকে আমি শেষবারের মতো অনুরোধ করতে এসেছি, আপনি আমার দোকানে পিকেটিং করবেন না—

বাবা বললেন, তা হয় না শরৎ, আমাদের সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গিয়েছে—

শরৎ এবার এক কাণ্ড করে বসল। সে হঠাৎ বাবার পায়ের ওপর হুড়মুড় করে শুয়ে পড়ল। বললে, আমাকে আপনি বাঁচান কর্তামশাই, আমি ধনে-প্রাণে মারা যাব। আমি বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে পথে বসব। তখন আমাকে সপরিবারে আপনাকেই খাওয়াতে হবে। দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে, আপনি কি তাই চান কর্তামশাই?

বাবা বললেন, তাহলে কথা দাও তুমি কাল থেকে মদ বেচা বন্ধ করবে?

শরৎ বললে, তা কি করে করি বলুন? মদের ব্যবসা কি আমি

করেছি ? ও আমার ঠাকুর্দার আমল থেকে চলে আসছে। আমি তো সেই ব্যবসাই চালিয়ে যাচ্ছি কেবল। আপনি তো জানেন আমি নিজে জীবনে কখনো মদ জিভেও ঠেকাইনি। আমার ছেলে ভূপেনও মদ খায় না।

বাবা বললেন, তাহলে তো তুমি আরো পাপ করেছ। যে বিষ তুমি নিজে খাও না সেই বিষ তুমি গাঁয়ের সব লোককে খাওয়াচ্ছ। তুমি তো দেখছি শুধু পাপী নও, মহাপাপী, জ্ঞানপাপী। তুমি নিজে জানো যে ওটা বিষ, আর তা জেনেও তুমি টাকার লোভে অন্য লোককে সেই বিষ খাওয়াচ্ছ। তোমার যে নরকেও ঠাঁই হবে না। তুমি আমার পা ছাড়, অনেক রাত হয়ে গেছে, সারাদিন আমার খুব খাটুনি গেছে, আমি এবার খেতে যাব—

এবার শরৎ উঠে দাঁড়াল। কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, তাহলে আপনি কিছুই বিহিত করবেন না ?

বাবা বললেন, তোমার বিহিত করা আমার ক্ষমতায় নেই। আমার ক্ষমতায় থাকলে আমি নিশ্চয় বিহিত করতাম—

শরৎ বললে, কিন্তু গর্ভমেণ্ট তো আমাকে মদ বিক্রির লাইসেন্স দিয়েছে, আমি গর্ভমেণ্টের আইন অমান্য করি কি করে ?

বাবা বললেন, যে আইন বে-আইন তা অমান্য করতে তো দোষ নেই—

শরৎ বললে, কিন্তু তাতে যদি আমায় সরকার জেলে পোরে ?

বাবা বললেন, সরকার জেলে পোরে পুরবে। মহাত্মা জেলে গেছেন, দেশবন্ধু জেলে গেছেন, সুভাষ বোস জেলে গেছেন। দেশের হাজার হাজার লোক আইন অমান্য করে জেলে গেছে আর তোমারই জেল খাটতে যত ভয় ? তুমি এত ভীতু ? দেশের মানুষের ভালোর জন্যে তুমি না হয় জেলই খাটলে। তুমি জানো না কেষ্টগঞ্জে কত লোক জেল খেটেছে। আমাদের গাঁয়ের শরৎ পণ্ডিত সেদিন জেল থেকে ছাড়া পেল। সে তো সামান্য একজন ইস্কুলের পণ্ডিত। তার জেল খাটতে ভয় হল না, আর তুমি বুড়ো হয়ে মরতে চললে আর তোমারই জেলের ভয় ? মরতে তো একদিন হবেই তোমাকে। শুধু একলা তোমাকে নয়, আমাদের সকলকেই একদিন না একদিন মরতে হবে। এখানে কেউ চিরকাল বাঁচতে আসেনি। তা সেই যখন একদিন মারাই যাবে তুমি, তার আগে না হয় একটা সৎ-কাজের জন্যই মরলে।

শরৎ বললে, বলা যত সহজ কাজে করা কি অত সহজ কর্তামশাই, আপনারই যদি মদের দোকান থাকত তো আপনিই কি তা ছাড়তে পারতেন ?

বাবা বললেন, আমি মুখে যা বলি কাজেও তাই করি শরৎ। তুমি তো আমাকে এতকাল ধরে দেখে আসছ, এখনো আমাকে চিনতে পারলে না ?

এর পর শরৎ-এর বলবার কিছু ছিল না। শুধু জিজ্ঞেস করলে, তাহলে এই কি আপনার শেষ কথা ?

বাবা বললেন, হ্যাঁ, এই-ই আমার শেষ কথা। শুধু একটা কথা জেনে যাও যে তোমার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোন ঝগড়া নেই। ঝগড়া আমাদের আদর্শের। তোমার যা আদর্শ আমার আদর্শ তা নয়। ইংরেজদের সঙ্গেও আমাদের কোন ঝগড়া নেই। ঝগড়া তাদের শোষণ নিয়ে। ইংরেজদের যে আইন আমাদের শোষণ করে, যে আইন আমাদের অত্যাচার করে তার বিরুদ্ধেই আমাদের যত প্রতিবাদ। আর কিছু না।

শরৎ কথাগুলো শুনে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ির দিকে চলতে লাগল।

চারদিক ঘন অন্ধকার। আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শরৎ ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তায় গিয়ে পড়ল। রাস্তাটা যেখানে গিয়ে পড়েছে সেইটাই সুলতানপুরের বারোয়ারিতলা। সেখানেই তার দোকান। দোকানের ঝাঁপ তখন বন্ধ। তার পিছনেই সেই ঝাঁকড়া মাথা গাব গাছ।

সেইখানটা আসতেই কে যেন পিছন থেকে চাপা গলায় ডাকলে, শরৎবাবু !

শরৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর পিছন ফিরে কাউকে দেখতে পেল না।

লোকটা এবার কাছে এসে বললে, আমাকে চিনতে পারছেন না ?

শরৎ বললে, না তো ! কে আপনি ?

লোকটা বললে, আপনার মনে পড়ছে না ? আমি সেই আপনার কাছে এসেছিলুম। বড় সাহেব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিল ?

এবার শরৎ-এর মনে পড়ল। জিজ্ঞেস করলে, কিছু কথা আছে ?

লোকটা বললে, কথা আছে বলেই তো এই অসময়ে আপনার কাছে এসেছি।

শরৎ বললে, বলুন কি কথা ? কাল তো আমার দোকানে

কংগ্রেসীদের হামলা হবে। চারদিকে তারা ফ্ল্যাগ লাগিয়ে দিয়েছে।

লোকটা বললে, কিছু ভয় নেই আপনার। আমরা তো আছি।

শরৎ বললে, আমি কি করব বুঝতে পারছি না। এখন গিয়েছিলুম কর্তামশাইয়ের কাছে। তাঁর পা জড়িয়ে ধরলুম। বললুম আমাকে বাঁচান। তা কিছুতেই তাঁকে টলাতে পারলুম না। তিনি বললেন কংগ্রেসের হুকুম, আমি কি করব!

তাহলে কি করবেন ঠিক করলেন?

শরৎ বললে, এ তো একদিনের ব্যাপার নয়, এ ব্যাপার অনেক দিন ধরে চলবে। সবাই যদি মদ খাওয়া বন্ধ করে তো আমার কি হবে?

লোকটা বললে, আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন স্যার, আমি তো বলেইছি আমি আপনার দলে। আমার বড় সাহেব থাকতে আপনি ভয় পাবেন না।

শরৎ বললে, কাল থেকে কর্তামশাইরা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করবে, আর আপনি বলছেন আমি ভয় পাব না? আমার সংসার চলবে কি করে তাই আমি ভাবছি। আমি যখন উপোষ করব তখন আপনার বড় সাহেব আমাকে খাওয়াবে? তখন আপনার বড় সাহেব আমাকে দেখতে আসবে!

লোকটা বললে, আপনি দেখুন না, কী মজা হয় কাল।

শরৎ আড্ডি বললে, কী মজা হবে?

লোকটা বললে, সে আমি আগে থেকে এখন বলব না। তার আগে আপনি একটা কাজ করুন—আপনি আপনার দোকানে যত মদের বোতল আছে সব আজ রাত্তিরেই সরিয়ে ফেলুন।

শরৎ বললে, কি করে সরাব? সে যে অনেক বোতল।

লোকটা বললে, আপনি আর আপনার ছেলে দুজনে মিলে আপনার বাড়িতে সরিয়ে নিয়ে যান। দরকার হলে সারা রাত এই কাজটা করুন।

শরৎ বললে, তাতে কি সুবিধে হবে?

লোকটা বললে, তাতে যদি দোকানে কেউ আগুন লাগিয়ে দেয় তো বোতলগুলো অন্তত বেঁচে যাবে। শুধু দোকানটাই যা পুড়বে, মাল বেঁচে যাবে।

শরৎ বললে, দোকানে আগুন লাগাবে কেন? সে-রকম তো কথা নেই—কংগ্রেসের লোকেরা তো অহিংস। তারা কারও গায়ে হাত

তুলবে না, তারা কারও কোন ক্ষতি করবে না। শুধু বলবে আপনারা মদ খাওয়া বন্ধ করুন। কর্তামশাই আমাকে নিজে এ-কথা বলেছেন—

লোকটা বললে, মুখে অমন কথা সবাই বলে।

শরৎ বললে, কিন্তু কর্তামশাই তো মিথ্যে কথা বলবার লোক নয়।

লোকটা বললে, আগুন তো লাগাবে পুলিশের লোকেরা।

সে কি!

লোকটা বললে, কেষ্টগঞ্জে তো তাই-ই হয়েছিল। আপনি কি ভাবছেন কংগ্রেসের লোক সেখানে মদের দোকানে আগুন লাগিয়েছিল? বলে, লোকটা হাসল। হাসতেই তার দাঁতগুলো অন্ধকারের মধ্যেও ঝক্ ঝক্ করে উঠল।

সে বললে, আপনি সরল সাদাসিধে মানুষ, তাই ওই কথা বিশ্বাস করেছেন সেইজন্যেই তো বড় সাহেব আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি এখন যা বললুম তাই করুন। তাতে আপনিও বাঁচবেন, পুলিশও বাঁচবে। পুলিশের কাজ সহজ হয়ে যাবে।

শরৎ বললে, আগুন লাগালে পুলিশের কি সুবিধে হবে?

লোকটা বললে, এই সোজা কথাটা আপনি বুঝলেন না? আগুন লাগলেই তো পুলিশের লাঠি চালাতে সুবিধে হবে। তখন আর কেউ কিছু বলতে পারবে না, পুলিশকে কেউ কিছু দোষ দিতে পারবে না। যা বললুম তাই করুন। আমি চলি—বলে লোকটা চলে গেল।

শরৎ একমনে খানিকক্ষণ ভাবতে লাগল নিজের মনে। তারপর নিজের বাড়িতে চলে গেল।

ছেলেকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সব কথা বললে। ছেলে সব ভেবে রাজি হল তারপর ভাত খেয়ে নিয়ে চুপি চুপি কাজে লেগে গেল। দুজনে দুটো ঝুড়ি নিয়ে আবার দোকানের পিছনের দরজা খুললে।

তা অত বোতল বাড়িতে আনা কি সোজা কথা? বাপ-বেটায় মিলে একে একে সব বোতল যখন বাড়িতে এনে তুলল তখন প্রায় রাত্রি তিনটে।

সারা রাত্রি পরিশ্রম করে শরৎ যখন ঘুম থেকে উঠল তখন বেলা ন'টা বেজে গেছে। শরৎ-এর বাড়ির সবাই তখন খুব গম্ভীর গম্ভীর। সমস্ত বাড়িতে যেন শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ভুপেন এসে বাবাকে জিজ্ঞেস করলে, আজ দোকান কে খুলবে বাবা? তুমি না আমি?

শরৎ বললে, তুই যাস্‌নি, আমিই যাব—

শরৎ-এর মনে হল যদি কোন গণ্ডগোল হয় তো ছেলে অন্তত নিরাপদে থাকুক। নিজে আর কতদিনই বা বাঁচবে। যা হামলা হয় তার নিজের ওপর দিয়েই হয়ে যাক। শরৎ-এর ওই একই ছেলে, আর বাকি সব মেয়ে। সেই মেয়েদের একদিন বিয়ে দিতে হবে। ছেলে বেঁচে থাকলে সেই সব দায়িত্ব সে নিজের মাথায় তুলে নিতে পারবে। শরৎ-এর মাথায় যদি লাঠি পড়ে তো পড়ুক। তার তিন পুরুষের কারবার। এ হয়তো চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। তখন ভূপেন চাষ-বাসের দিকে মন দেবে।

সেই দিনকার কথা ভাবতে গিয়ে শরৎ-এর মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বেশ তো ছিল ইংরেজ সরকার। তাদের তাড়িয়ে কি লাভ হবে।

বাড়ির সামনের রাস্তায় আসতেই নিমাই ঘোষের সঙ্গে দেখা। নিমাই ঘোষ জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাচ্ছেন আড্ডিমশাই? দোকান খুলতে?

শরৎ উদাস দৃষ্টিতে বললে, কী আর করব বল নিমাই, সরকারের লাইসেন্স নিয়েছি, দোকান কি বন্ধ রাখতে পারি?

নিমাই ঘোষ বললে, কিন্তু আজ যে শুনছি কর্তামশাই দলবল নিয়ে নিজে দোকান বন্ধ করতে আসবেন?

শরৎ বললে, এলে আমি আর কী করতে পারি, বল? দোকান বন্ধ রাখলে তো ওদিকে আবার উল্টো উৎপত্তি হবে। আমার হাতে সরকার হাতকড়ি পরাবে।

নিমাই ঘোষ বললে, আমারও বিপদ কম নয় আড্ডিমশাই—

শরৎ বললে, কেন, তোমার আবার কী বিপদ?

নিমাই ঘোষ বললে, আপনার মদ বিক্রী না হলে আমারও তেলে-ভাজার দোকানে কি আর খদ্দের আসবে। মদ না খেলে তেলেভাজা কে খাবে? আমার কারবারও বন্ধ হয়ে যাবে।

শরৎ বললে, তা অবিশ্যি সত্যি। কিন্তু তোমার ওপরে তো কারো রাগ নেই, যত রাগ আমার ওপর; আমি মদ বেচি বলে।

নিমাই ঘোষ বললে, সেবার বিলিতি কাপড় পোড়াতে বলাতে আমার একখানা ধুতি কাপড় ছিল, তাও পোড়াতে দিয়েছিলুম। তাতে আমার বেশি ক্ষতি হয়নি, অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু

এবার? আমি তো 'দিন-আনি-দিন-খাই' মানুষ। আমার কী দশা হবে। আমি এই তেলেভাজা বেচে যা দুটো পয়সা পাই তাই দিয়েই পেট চালাই।

একটু থেমে নিমাই ঘোষ আবার বললে, আচ্ছা আড্ডিমশাই, আমি একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করি, আপনিই বলুন তো, ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়িয়ে আমাদের কী ভালোটা হবে? তাতে আমার অবস্থা ভালো হবে? আমি জমি পাব? পেট ভরে খেতে পাব?

শরৎ বললে, তবে? তবে কেন এত হাঙ্গামা করছেন কর্তামশাই? যদি পুলিশ এসে কেষ্টগঞ্জের মতো সবাইকে লাঠিপেটা করে? ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় তখন কি হবে?

শরৎ বললে, যা হবে তুমিও দেখতে পাবে আমিও দেখতে পাব।

নিমাই ঘোষ সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বললে, আমার কি মনে হয় জানেন আড্ডিমশাই? আমার মনে হয় কর্তামশাইয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। জনাকতক ছোঁড়াকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে তিনি নাম কিনতে চাইছেন।

শরৎ বললে, তা ছাড়া আর কী?

নিমাই ঘোষ এবার ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারণ করে বললে, আপনি দেখে নেবেন আড্ডিমশাই, গরীব লোকদের এমন ক্ষতি করলে কর্তা-মশাইয়ের ভালো হবে না।

শরৎ বললে, ভালো তো হবেই না!

নিমাই ঘোষ বললে, ইংরেজরা যে কিসে খারাপ তা তো আমি বুঝতে পারছি না। ইংরেজ রাজত্ব আছে বলে তবু এখনও আকাশে চন্দ্র-সূর্য উঠছে। গান্ধীর কথা যে বলছে, গান্ধীর কি আছে শুনি যে তা নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লড়বে? গান্ধীর কি পুলিশ আছে না সৈন্য আছে যে তাই নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করতে নামবে? মদ বন্ধ করলেই আর বিলিতি কাপড় পোড়ালেই ইংরেজরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে?

শরৎ বললে, যাও নিমাই, তুমি তোমার কাজে যাও, আর আমিও দোকান খুলিগে যাই। দেখা যাক আজকে কি হয়।

নিমাই চলে গেল। কিন্তু কোথায় আর যাবে সে? তার তো কোন কাজ নেই তখন। হাঁটতে হাঁটতে গুণধর কর্মকারের দোকানে

গিয়ে পৌঁছল।

গুণধর কর্মকারের ছেলে ভানু কর্মকার কর্তামশাইয়ের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়াতে তার মন ভালো ছিল না।

নিমাই যেতেই গুণধর ডাকলে। বললে, কি নিমাই, কোথায় যাচ্ছ?

নিমাই বললে, এই আপনার কাছেই এলাম।

গুণধর বললে, ভালোই করেছ এসে। কি খবর বল?

নিমাই বললে, আপনার ছেলে তো আমার সর্বনাশ করে বসল। আপনি শুনেছেন তো সব। আমার কারবারটাই বন্ধ করে দিলে। আমি তবু শরৎ মশাইয়ের দোকানের সামনে বসে তেলেভাজা ভেজে দুটো পয়সা উপায় করতাম, সে রাস্তাও সে বন্ধ করে দিলে।

গুণধর বললে, ও আমার ছেলে নয় নিমাই, ও হারামজাদা। আমি ওর জন্ম দিয়ে মহাপাতক করেছি! আমার সামনে ওর নাম মুখে এনো না নিমাই।

নিমাই বললে, তা বলে তো আর নিজের ছেলেকে ত্যজ্যপুত্তুর করতে পারো না।

গুণধর বললে, ওর গর্ভধারিণী যে এখনও বেঁচে আছেন, নইলে কবে ওকে বাড়ি থেকে দূর করে দিতুম। ও ছেলে আমার থাকাও যা আর না থাকাও তাই—। ওর মুখদর্শনও আমি করতে চাই নে—

নিমাই ঘোষ উঠে আসছিল। কিন্তু ওঠা হল না। দেখতে পেলে গুণধরের ছেলে ভানু বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকছে।

দেখতে পেয়েই গুণধর একটা চ্যালা কাঠ নিয়ে তার দিকে তেড়ে গেল। বললে, আবার এসেছিস? বেরো বলছি, বেরো—আবার কি করতে বাড়ি এসেছিস? যেখানে ছিলিস সেখানেই যা, বাড়ি এলি কেন?

ভানু বাবার এই ব্যবহারে একটু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বললে, আমি খেতে এসেছি—

গুণধর তখনও তার হাতের চ্যালা কাঠটা উঁচিয়ে ধরে রয়েছে। সেই অবস্থাতেই বললে, কেন, খেতে এসেছিস কেন? যেখানে গিয়েছিলি সেখানেই খেয়ে এলে পারতিস। সেখানে কর্তামশাই খেতে দিলে না তোকে?

ভানু বললে, সেখানে তো রাত্রে প্রসাদ খাই। দুপুরবেলা খেতে আসব না?

গুণধর বললে, না। আমার বাড়িতে আজ থেকে তোর দরজা বন্ধ, এই বলে রাখলুম। আর এ বাড়িতে ঢুকতে পাবি না তুই।

ভানু বললে, কেন, আমি কি করেছি?

গুণধর বললে, কেন, তোর ও সব ব্যাপারে থাকবার দরকার কি? শরৎ-এর ওপরে তোর এত রাগ কিসের? সে তোর কি ক্ষতি করেছে? সে নিজের দোকানে বসে মদ বেচে, তাতে তোর অত গায়ের জ্বালা কেন? যার ইচ্ছে সে মদ খাবে, তাদের টাকা নষ্ট হবে, তাতে তাদের পেটে ঘা হবে। তুই তো মদ খাস না, তোর টাকা নষ্ট হচ্ছে না।

ভানু বললে, কর্তামশাই যে মদ খাওয়া বন্ধ করতে বলেছেন। মদ খেয়ে লোকের শরীর নষ্ট হচ্ছে—

গুণধর বললে, লোকের শরীর নষ্ট হচ্ছে তো তোর কি?

ভানু বললে, কংগ্রেস থেকে যে হুকুম এসেছে মদের দোকানে পিকেটিং করতে হবে।

গুণধর বললে, তাহলে তাই কর গিয়ে, বাড়িতে আর তুই আসিস নি।

ভানু বললে, ঠিক আছে, আজ থেকে আমি আর বাড়িতে আসব না—

গুণধর বললে, না, আসিস নি। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। তুই বাড়ি না এলে তো আমি বাঁচি।

ভানু আর বাড়ি ঢুকল না। সে যেদিক থেকে এসেছিল, সেই দিকেই চলে যেতে লাগল। গুণধর তখনও রাগে গজ্ গজ্ করছে। বললে, শুনলে তো ছেলের কথা? শুনলে তো সব নিজের কানে? ও সব ঐ কর্তামশাইয়ে কীর্তি। ছেলেরা বসে বসে এতদিন তাস পিটত, সে তবু ভালো ছিল। এ কোত্থেকে এক কংগ্রেস এসে হাজির হল, তারপর থেকেই দেশে যত গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল।

নিমাই ঘোষ বললে, জানেন কর্মকার মশাই, কংগ্রেস-ফংগ্রেস যত সব বড়লোকদের কাণ্ড, আমাদের মতো গরীব লোকদের কী ভালো করবে বলুন তো?

গুণধর বললে, ইংরেজরা আমাদের ক্ষতিটা কি করলে সেটাই আমি এখনও বুঝতে পারলাম না নিমাই। তুমি কিছু বুঝতে পেরেছ?

নিমাই বললে, আমি-তো শরৎ মশাইকে তাই-ই বলছিলুম এতক্ষণ। ইংরেজরা আমাদের ক্ষতিটা কি করলে? আর গান্ধীই বা

আমাদের কি ভালো টা করবে? এই যে আমি তেলেভাজা ভেজে দুটো পয়সা উপায় করি, ইংরেজরা চলে গেলে কি আমার আয় বাড়বে?

গুণধর বললে, ছাই বাড়বে! গান্ধীর কি অত পয়সা আছে যে তোমাকে আমাকে খাওয়াবে? আমাদের যা কপাল তা কেউ বদলাতে পারবে না।

নিমাই ঘোষ বললে, তা আপনার ছেলে এখন কি করবে?

গুণধর বললে, সে যা করে করুক গে। আমার সে-সব দেখার কি দরকার। এই আজই দেখ না, বারোয়ারীতলায় কি রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। বলে হুঁকোটা নিয়ে তামাক সাজতে লাগল।

বললে, একটু তামাক খেয়ে যাও নিমাই।

নিমাই বললে, তামাক খাওয়া এখন আমার মাথায় উঠেছে। আমি যে কি জ্বালায় জ্বলছি তা আমিই জানি। বলে হুঁকোটা নিয়ে তামাক টানতে লাগল।

না, সেদিন তেমন কিছু হল না। সেটা প্রথম দিন।

কর্তামশাই বন্দেমাতরম্ আওয়াজ দিতে দিতে বারোয়ারিতলায় এলেন। সঙ্গে তাঁর ভলান্টিয়ার সব। আমিও তার মধ্যে আছি।

বাবা বলতে লাগলেন, বন্দেমাতরম্—

আমরাও তাঁর কথা অনুযায়ী চিৎকার করে উঠলাম, বন্দেমাতরম্—

গাছের ডালে ডালে কংগ্রেসের তেরঙা কাগজের ফ্ল্যাগ। সমস্ত গ্রামের লোক দেখতে এসেছে বারোয়ারিতলায়। কাতারে কাতারে লোক দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে এসেছে।

কেষ্টগঞ্জ থেকে খবর পেয়ে পুলিশও এসেছে শরৎ-এর দোকানের সামনে। যদি কোন হামলা হয় তো তখন তারা লাঠি চালাবে। সব পুলিশের হাতে লাঠি। তারা শরৎ-এর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

বাবা এক সময়ে বললেন, তোমরা এখানে থামো—

আমাদের দলবলের ছেলেরা সবাই থেমে গেল।

বাবা বললেন, আর এগিও না তোমরা—

আমরা একেবারে পুলিশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

শরৎ দোকানের ঝাঁপ খুলে যেমন বরাবর বসে থাকে তেমনি বসে ছিল। তার মুখে-চোখে ভয়ের চিহ্ন। দেখেই মনে হয় ভয় করছে।

কর্তামশাই বলতে লাগলেন, দেশের বন্ধু, দশের বন্ধু দেশবন্ধু আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর আত্মা আমাদের মধ্যে দিয়েই প্রেরণা দিচ্ছে। তিনি বলে গিয়েছিলেন বিলিতি জিনিস বর্জন করতে। আমরা তা করেছি। তিনি আমাকে বলে গিয়েছিলেন দেশে মদ খাওয়া বন্ধ করতে। আমরা আজ তাঁর সেই আদেশ পালন করতে এখানে সবাই এসে সমবেত হয়েছি। আজ থেকে আমরা প্রতিদিন এই মদের দোকানের সামনে সত্যাগ্রহ করব। আপনাদের তিনি এই বারোয়ারিতলায় দাঁড়িয়ে মদ বর্জন করতে বলে গিয়েছিলেন। আপনারা সেদিন তাঁর সেই আদেশ শুনেছিলেন। আজ তিনি জীবিত নেই, কিন্তু আমরা তাঁর অনুগামীরা আছি। তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আপনাদের অনুরোধ করছি—আপনারা আজ থেকে মদ কিনবেন না। মদ স্পর্শ করবেন না। আপনারা এই সভায় প্রতিজ্ঞা করুন, আপনারা মদ খাবেন না।

ভানু কর্মকার, অধীর, তারাপদ, আমি, কার্তিক, আর যারা যারা সত্যাগ্রহ করবার জন্যে হাজির হয়েছিলাম তারা সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে বললাম, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যতদিন না এই মদের দোকান বন্ধ হচ্ছে ততদিন আমরা এখানে প্রতিদিন সত্যাগ্রহ করব। এ-ব্যাপারে আপনারা আমাদের সহযোগিতা করুন। বন্দেমাতরম্—

আশে পাশে চারদিকে যারা মজা দেখতে এসেছিল তারাও সবাই সুরে সুর মিলিয়ে বারোয়ারিতলা কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল, বন্দেমাতরম্—

দুপুরবেলা পিকেটিং আরম্ভ হয়েছিল, রাত সাতটা আটটা পর্যন্ত পিকেটিং চলল। প্রথম দিনের সত্যাগ্রহ তখন সেদিনকার মতো শেষ হল।

পরের দিনও আবার সেই রকম। আবার সেই বন্দেমাতরম্ আওয়াজ। সেদিনও পুলিশ তৈরি ছিল। কিন্তু কোনরকম হাঙ্গামা হল না। শরৎ আড্ডির দোকানে এক ফোঁটা মদও বিক্রি হল না।

এই রকম করে এক সপ্তাহ কাটল। পনেরো দিন কাটল। জনা চল্লিশ-পঞ্চাশ সত্যাগ্রহী রোজ কর্তামশাইয়ের বাড়িতে খেতে লাগল। কর্তামশাই দু'হাতে টাকা খরচ করতে লাগলেন।

সুলতানপুরের যারা নিয়ম করে মদ খেত তারা মদ খেতে পেলে না। শরৎ আড্ডিরও লোকসান হল খুব। নিমাই ঘোষের তেলেভাজার

দোকানও বন্ধ হয়ে গেল। তাদের কারো একটা পয়সা আয় নেই। সমস্ত গ্রামময় একটা উত্তেজনা। আশে পাশের গ্রাম থেকেও লোক আসতে লাগল সত্যাগ্রহ দেখতে। সে এক দিন গেছে সুলতানপুরের।

মনে আছে ক'দিন ধরে বারোয়ারিতলার হাট-বাজারও বন্ধ রইল। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। কর্তামশাইয়েরও খুব উৎসাহ।

মা একদিন আর থাকতে পারলে না। বাবাকে জিজ্ঞেস করলে, আর কতদিন এ-রকম চলবে তোমাদের ? এতগুলো লোক যে বাড়িতে খাচ্ছে, এদের আর কতদিন খাওয়াবে বসিয়ে বসিয়ে ?

বাবা বললেন, যতদিন পারি খাইয়ে যাব।

মা বললে, শেষকালে যে তুমি পথে বসবে।

বাবা বললেন, পথে বসি বসব।

মা বললে, কিন্তু তোমার ছেলে ? নিজে তো পথে বসছই তার ওপরে ছেলেটাকেও যে পথে বসাবে।

বাবা বললেন, দেশবন্ধুও তো সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন দেশের জন্যে। আর আমি তো তাঁর তুলনায় কিছুই না। আমি আমার এই সামান্য সম্পত্তিও ত্যাগ করতে পারব না ?

মা বললে, যাক্ গে, তোমার সম্পত্তি তুমি নষ্ট করবে তাতে আমার কী বলবার আছে ? বলে আর সেখানে দাঁড়াল না।

কিন্তু তার কিছুদিন পরেই হঠাৎ বিপর্যয় ঘটে গেল। এতদিন সুলতানপুরের মাতালদের মদ না খেয়ে বড় অসুবিধে হচ্ছিল। তারা অনেক মাইল হেঁটে রাণাঘাটে গিয়ে মদ খেয়ে আসছিল। শরৎ আড্ডিরও অভাব চলছিল খুব। এক পয়সাও বিক্রি নেই তার। তারই বা দিন চলে কী করে ?

সেদিন যখন সবাই যে-যার বাড়ি চলে গেছে, অনেক রাত হয়েছে, আবার সেই লোকটা এলো।

শরৎ-এর বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকলে, শরৎবাবু আছেন ?

ভেতর থেকে শরৎ ভয়ে ভয়ে বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলে, কে ?

লোকটা গলা নামিয়ে বললে, আমি। আমায় চিনতে পারছেন না ? সেই আগে একদিন এসেছিলাম।

এতক্ষণে শরৎ লোকটাকে চিনতে পারলে। বললে, কই মশাই, আপনি তো অনেক কথাই বলে গিয়েছিলেন। আপনার বড় সায়েব তো কিছুই করলেন না। আপনার কথাতেই তো আমি মাল-টাল

সরিয়ে রাখলাম। এখন একটা পয়সা আমদানি নেই, আমি সংসার চালাই কী করে?

লোকটা বললে, আজই ফয়শালা হবে। আপনি কিছু ভাববেন না।

শরৎ জিজ্ঞেস করলে, কী ফয়শালা হবে?

লোকটা বললে, সে আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।

শরৎ তবু বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে, কী ফয়শালা হবে? পিকেটিং আর করবে না কংগ্রেস?

লোকটা বললে, সে আমি এখন আপনাকে বলব না। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। এই কথাটা বলতেই আমি আপনার কাছে এসেছিলাম। আমার বড় সাহেব আজকে নিজে এখানে আসবে।

বলে লোকটা চলে যাচ্ছিল। শরৎ ডাকলে, ও মশাই, চলে যাচ্ছেন কেন? বলে যান কী হবে? আর আমি সাবধানেই বা থাকব কেন?

লোকটা বললে, আমি তো সবই বললাম আপনাকে। এর বেশি আর জিজ্ঞেস করবেন না আমাকে। এর বেশি বলতে বারণ আছে।

শরৎ আড্ডি জিজ্ঞেস করলে, কিছু খুন-খারাপি হবে নাকি?

লোকটা বললে, বললুম তো আপনাকে, আর সব কিছু বলতে বারণ আছে।

শরৎ আড্ডি জিজ্ঞেস করলে, আমি দোকান খুলব কাল?

লোকটা বললে, নিশ্চয় খুলবেন।

শরৎ আড্ডি বললে, যদি কিছু হয়।

—সেই জন্যই তো বলছি আপনি একটু সাবধানে থাকবেন—

বলে লোকটা আর দাঁড়াল না। অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

•

সেদিনও যথারীতি চারদিকে লোক এসে জড়ো হয়েছে।

ঠিক দুপুরবেলার দিকে কর্তামশাই দলবল নিয়ে হাজির হলেন। সকলের হাতেই অন্য দিনের মতো তেরঙা কংগ্রেস ফ্ল্যাগ।

কর্তামশাই চিৎকার করে উঠলেন, বন্দে মাতরম্—

ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, বন্দেমাতরম্—

আবার প্রতিদিনকার মতো বারোয়ারিতলা সরগরম হয়ে উঠল। পুলিশ সেদিনও তৈরী হয়ে ছিল। শরৎ আড্ডির দোকান ঘিরে দাঁড়িয়ে লাঠি-বন্দুক নিয়ে প্রাহারা দিচ্ছিল। মদের দোকানে হামলা করলেই লাঠিপেটা করবে।

কর্তামশাই আবার চিৎকার করে উঠলেন, বন্দেমাতরম্—

ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, বন্দেমাতরম্—

কর্তামশাই বলতে লাগলেন, আমাদের এ সংগ্রাম সম্পূর্ণ অহিংস সংগ্রাম। কংগ্রেসের নীতি অহিংস সংগ্রামের নীতি। আমরা যে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছি সে স্বাধীনতা শুধু হিন্দুদের স্বাধীনতা নয়, কিম্বা শুধু মুসলমানদের স্বাধীনতা নয়, আমরা হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান সব সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি। আমরা বৃটিশ জাতিকে ঘৃণা করি না, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের শোষণ-নীতিকে ঘৃণা করি। সেই শোষণ এবং অত্যাচার বন্ধ করবার জন্যেই এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেছি। সেই সত্যাগ্রহের একটি নীতি হল মদ্য বর্জন। আমরা চাই দেশ থেকে মদ্যপান বন্ধ হোক। মদ্যপান বন্ধ করতে হলে মদের দোকানও বন্ধ করতে হবে।

কর্তামশাই প্রত্যেক দিন ওইখানে দাঁড়িয়ে দুটো একটা কথা বলতেন। সেই কথা সবাই শুনত। সমস্ত লোক শুনত, পুলিশ শুনত আর শরৎ আড্ডিও শুনত। তারপর কেবল 'বন্দেমাতরম্' আর 'বন্দেমাতরম্' শব্দ—

সেদিন কিন্তু হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল। কী করে যে ঘটল কেউ জানে না। হঠাৎ শরৎ আড্ডির মদের দোকানে আগুন লেগে গেল। সেই আগুন অনুকূল হাওয়া পেয়ে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল।

শরৎ আড্ডি আগুন দেখেই ছিটকে একেবারে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। সবাই চিৎকার করে উঠল, আগুন—আগুন—

কর্তামশাই সামনে এগিয়ে গেলেন। ছেলেদের বললেন, তোমরা জল আনবার ব্যবস্থা কর, আগুন নেভাতে হবে, দেরি নয়, শিগগির কর—

কিন্তু হঠাৎ ওদিক থেকে পুলিশের দল সত্যাগ্রহীদের ওপর লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুধু লাঠি নয়, বন্দুকের গুলির শব্দও হল। কংগ্রেসীরা আগুন লাগিয়েছে মদের দোকানে। সমস্ত লোক-জন যে যেদিকে পারলে বাঁচতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কর্তামশাইয়ের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। পাশেই একটা ডোবা ছিল সেখান থেকে জল নিয়ে আসবার জন্যে বললেন সবাইকে।

কিন্তু তার আগেই পুলিশের দল লাঠি চালাতে লাগল সত্যাগ্রহী-দের ওপর। একটা লাঠি এসে পড়ল কর্তামশাইয়ের মাথার ওপর।

আঘাতটা সহ্য করতে পারলেন না তিনি। সেখানেই মাটির ওপর পড়ে গেলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে কার ওপর যে কে লাঠি মারলে কেউ দেখতে পেলে না।

পুলিশের দল বোধ হয় জানত যে মদের দোকানে আগুন লাগানো হবে।

ভানু কর্মকার কর্তামশাইয়ের কাছে যাচ্ছিল তাঁকে ধরে তুলতে। কিন্তু তাকেও ধরে ভ্যানের ওপর তুলে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কর্তামশাইকেও ধরে নিয়ে গেল পুলিশ। অধীর, কার্তিক, আমি, তারাপদ কেউই বাদ পড়লুম না। একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল, তার মধ্যেই সকলকে পুরে গাড়ি ছেড়ে দিলে। সকলেরই গা থেকেই ঝর্-ঝর্ করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু বাবার অবস্থাই ছিল সবচেয়ে খারাপ। বাবার মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে সমস্ত জামা-কাপড় ভেসে যাচ্ছিল। ভানুর অবস্থাও খুব খারাপ। তবু বারবার সে বলছিল ওরে তোরা জ্যাঠামশাইকে একটু দেখ। বাবা তখন অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়েছে।

ভ্যানটা তখন সোঁ সোঁ করে ভাজনঘাট পেরিয়ে পাঁচ ক্রোশ দূরের কেষ্টগঞ্জের দিকে এগিয়ে চলেছে।

এ সব কতদিন আগেকার কথা। সেই ১৯২৪ কি ১৯২৫ সালের ঘটনা। কিম্বা ১৯২৬ সালও হতে পারে। সময়টা খুব দুর্যোগময়। অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীকে তখন জেলে পুরেছিল ইংরেজ সরকার। কয়েক বছর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধটা শেষ হয়ে গিয়েছে। তার কালো ছায়া তখনও গ্রামের মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। মহাত্মা গান্ধী জেল থেকে ছাড়া পেলেন ১৯২৪ সালে। দেশবন্ধু মারা গেলেন ১৯২৫ সালে। ১৯২৪শে অক্টোবর মাসে বাঙলা গভর্মেণ্ট কালা অর্ডিন্যান্স জারি করে নতুন দমন নীতি শুরু করে দিলে। তখন থেকে গ্রামে গ্রামে আবার নতুন করে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেল। ছেলেরা বোমা-গুলি গোলা তৈরি করতে লাগল। উদ্দেশ্য দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াবে।

সেই সময় জেলখানার ভেতরেই বাবা মারা গেলেন। বাকি যারা জেলে ছিলাম তাদের নামে মামলা হল। সেই মামলায় আমাদের সকলের ছ' মাসের জেল হয়ে গেল। জেল থেকে বেরিয়ে একদিন

সুলতানপুরে ফিরে এলাম সবাই। ফিরে এসে দেখি মা মারা গেছে। মার দেহ সৎকার করেছে গ্রামের লোকেরা।

কয়েকদিন গ্রামেই কাটল। তারপর গোলাম মোল্লাকে বাড়ি দেখা-শোনার ভার দিয়ে আমি কলকাতায় চলে গেলাম। আর তারও পরে সুলতানপুরের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। ভাগ্য-সমুদ্রের ঢেউ আমাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমি তা জানতেও পারলাম না। বাবার জমি-জমা যা ছিল তা সবই বিক্রি করে দিয়ে আমি বলতে গেলে দেশত্যাগীই হয়ে গিয়েছিলাম। কোথায় কলকাতা কোথায় বোম্বাই, কোথায় মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান সব ঘাটের জল খেয়ে স্থিতু হয়ে গিয়েছিলাম হায়দরাবাদে। হায়দরাবাদই ছিল আমার শেষ স্থায়ী ঠিকানা। সেই, ভানু, অধীর, কার্তিক, তারাপদ— যাদের সঙ্গে একই জেলে কয়েক মাস কাটিয়েছিলাম তাদেরও কোন খোঁজ-খবর রাখবার অবকাশ পাইনি।

শেষ কালে শেষ জীবনে আবার একবার আমার সেই পুরোন জন্মস্থান দেখবার ইচ্ছে হওয়াতেই সুলতানপুরে এলাম।

গোলাম মোল্লা তখনও বসত বাড়িটা আগলে বেঁচে ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, দেশের অবস্থা কি রকম?

গোলাম মোল্লা আমার খাওয়ার জন্য রান্না চাপিয়েছিল। হঠাৎ কানে এলো বহু লোকের সমবেত কণ্ঠের আওয়াজ, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

আমি অবাক হয়ে গেলাম শব্দ শুনে। এখানেও ওই শব্দ?

গোলাম মোল্লা তখন বেশ বুড়ো হয়ে গেছে। সেও আওয়াজটা শুনতে পেয়েছিল। বললে, ওই ওমরপুরের কাপড়ের কলে ধর্মঘট চলছে তো তাই তার মজুররা মিছিল করে চলেছে—

জিজ্ঞেস করলাম ওমরপুরে কাপড়ের কল কবে হল? আগে তো ছিল না?

গোলাম মোল্লা বললে, ওখানে মাইতিদের কাপড়ের কল হয়েছে একটা—

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে মাইতি আবার কারা?

গোলাম মোল্লা বললে, সেই বিনোদ মাইতি মশাইয়ের কথা আপনার মনে পড়ে? সেই যে বিলিতি কাপড় পুড়িয়েছিলেন বারোয়ারিতলায়?

বললাম, হ্যাঁ, খুব মনে আছে।

গোলাম মোল্লা বললে, তিনি এখন বেঁচে নেই, তিনি মারা যাবার আগেই ওই কাপড়ের কল বসিয়েছিলেন, এখন তার ছেলেরা ওই মিল চালাচ্ছে। এখন সেখানে মজুরদের ধর্মঘট চলছে, তাই ওরা ইনক্লাব জিন্দাবাদ শব্দ করছে—

বললাম সেই বন্দেমাতরম আর কেউ বলে না বুঝি?

গোলাম মোল্লা বলে না, এখন ওসব উঠে গেছে।

আমি গোলাম মোল্লাকে বললাম, তুমি রান্না কর, আমি একটু ঘুরে আসি—

বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি এক বৃদ্ধ মানুষ আমার দিকে আসছেন। আমি ঠিক চিনতে পারলাম না। হাতে লাঠি, চোখে সুতো দিয়ে বাঁধা মোটা কাঁচের চশমা।

আমার নাম ধরে ডাকতেই গলার আওয়াজে আমি তাঁকে চিনতে পারলাম। শরৎ পণ্ডিত মশাই। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বললাম, পণ্ডিতমশাই, আপনি কেন কষ্ট করে এলেন, আমি তো যাচ্ছিলাম বারোয়ারিতলায়, আপনার বাড়িতেও যেতুম—

পণ্ডিতমশাই বললেন, তুমি বাড়ি এসেছ শুনলাম আর আমি আসব না? কেমন আছ?

আমি বললাম, আপনি কেমন আছেন তাই বলুন।

পণ্ডিতমশাই বললেন, আমি আর কী করে ভালো থাকি বল। আমার এই নব্বুই বছর বয়েস হল। এতদিন বেঁচে থাকাটাই আমার অন্যায় হয়েছে। মারা গেলেই ভাবছি ভালো হত। আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয় না, দিনকাল যা পড়েছে, এর পর ভালো থাকা সম্ভব নয়—

আমি তাঁকে একটা টুলের ওপর বসালাম। বললাম, ও-কথা কেন বলছেন মাস্টারমশাই? আপনি যে বেঁচে আছেন এ তো আমাদের সৌভাগ্য—

পণ্ডিতমশাই বললেন, না বাবা, ও-কথা আর বোলো না। দুটো বড় বড় যুদ্ধ দেখলাম। তার মধ্যে মানুষ যে কত অধঃপাতে নেমেছে, সে-সব ভাবলে আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। কর্তামশাই যা কিছু করেছিলেন সব ভস্মে ঘি ঢেলে গিয়েছিলেন—

দূর থেকে আবার সেই আওয়াজটা এলো, ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ—

পণ্ডিতমশাই বললেন, ওই শোন, শুনতে পাচ্ছ ?

বললাম, এ-সব তো আগে ছিল না সুলতানপুরে। আমরা তো আগে বন্দেমাতরম্ বলে মিছিল করেছি। এখন আবার এ-সব কী শ্লোগান এলো ? শুনলাম নাকি মাইতিদের কাপড়ের কল হয়েছে ওমরপুরে। সেখানকার মজুররা ধর্মঘট করেছে—

পণ্ডিতমশাই বললেন, ওই যে আমরা এককালে বন্দেমাতরম্ বলতাম, তারপর এলো জয়হিন্দ্, আমরা বন্দেমাতরম্ ভুলে গিয়ে জয়হিন্দ্ বুলি ধরলাম। এখন আবার জয়হিন্দ্ ভুলে গিয়ে ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ বুলি ধরেছি। একদিন দেখবে এই ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদও আমরা ভুলে যাব, ভুলে গিয়ে আবার নতুন কোন বুলি ধরব। এই-ই আমাদের দেশ। এই আমাদের দেশের অবস্থা। অথচ একদিন ওই বন্দেমাতরম্ বুলির জন্যে কত লোক পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে, তা তো জানো ?

একটু থেমে পণ্ডিতমশাই আবার বলতে লাগলেন, আর ওই দেখ বিনোদ মাইতি মশাইয়ের কথা। তিনি বিলিতি কাপড় পোড়াবার জন্যে একদিন সারা বাঙলাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। নিজে তক্‌লিতে সুতো কেটে সেই সুতো দিয়ে কাপড় বুনে পরেছেন। ইংরেজদের তাড়াবার জন্যে কত বক্তৃতা করেছেন, সেই তিনিই দেশ স্বাধীন হবার পর কাপড়ের কল তৈরি করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছিলেন —এখন তাঁর ছেলেরা আছে, তারাই কল চালাচ্ছে, আর দামী দামী মোটর গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছে—

বলতে বলতে তিনি হাঁফাতে লাগলেন।

বললাম, চলুন পণ্ডিতমশাই, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই—

তিনি লাঠি ধরে চলতে লাগলেন। আমিও তাঁর হাত ধরে চলতে লাগলাম। বারোয়ারিতলায় এসে আর চিনতে পারলাম না। বললাম, এ যে দেখছি বারোয়ারিতলাকে আর চিনতে পারা যায় না—

একটা জায়গায় দেখি কয়েকটা পাকা বাড়ি। আগে পাকা বাড়ি মোটে ছিল না বারোয়ারিতলায়। এ কি সেই বারোয়ারিতলা ? আমার যেন কেমন সন্দেহ হল। এখানেই কি বাবার মাথায় পুলিশের লাঠি পড়েছিল ? এখানেই কি আমি, ভানু, অধীর, তারাপদ, কার্তিক সবাই মিলে শরৎ আড্ডির মদের দোকানের সামনে সত্যাগ্রহ করে।

পুলিশের লাঠি খেয়েছিলাম ?

হঠাৎ পণ্ডিতমশাই জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ভানুকে চিনতে ? গুণধর কর্মকারের ছেলে ?

বললাম, খুব চিনি, আমরা একসঙ্গে মদের দোকানে পিকেটিং করে পুলিশের লাঠি খেয়েছি, একই জেলখানায় একসঙ্গে ছ' মাস কাটিয়েছি।

পণ্ডিতমশাই বললেন, ওই দেখ সেই ভানুর মদের দোকান—

আমি চেয়ে দেখলাম। একটা পাকা বাড়ির ওপর বাঙলায় সাইন্ বোর্ড লেখা—বিলিতি মদের দোকান।

বললাম, ভানু বেঁচে আছে ?

পণ্ডিতমশাই বললেন, হ্যাঁ, আগে ভানুই দোকানে বসে মদ বেচত। এখন ছেলেরা বেচে। সে বাড়িতে বসে থাকে।

বললাম, সেই ভানুকে তো গুণধর কর্মকার মশাই ত্যজ্যপুত্র করেছিলেন।

পণ্ডিতমশাই বললেন, ছেলের টাকা হবার পর বাপ সে-সব ভুলে গিয়েছিল। ছেলের জন্যেই বাপের শেষ জীবনটা খুব আরামে কেটে ছিল। টাকায় সব হয় আজকাল বাবা। ভানুর টাকা হবার পর গুণধর কর্মকার ছেলের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ, সকলকে ডেকে ডেকে ছেলের প্রশংসা করত—

আমি সব শুনে নিজের মনেই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম এ কী হল ? মনে পড়ে গেল তখন আমি কলকাতায়। ধর্মতলা-চৌরঙ্গীতে সেই রসিদ আলির মুক্তির দাবীতে দুর্বার আন্দোলন, রামেশ্বর-আবদুস্ সালেমের রক্ত-রাঙা পথে দুরন্ত ছাত্র-মিছিল, সারা দেশে ডাক-তার ধর্মঘটের সমর্থনে সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘট আর হরতাল ডাকা হল। স্কুল-কলেজে-অফিস কল-কারখানা-হাট বাজার-গাড়ি ঘোড়া, এমন কি খবরের কাগজ পর্যন্ত বেরোল না। সেদিন রেডিও পর্যন্ত বন্ধ রইল। সারাদিন শুধু গানের রেকর্ড বন্ধ রইল। সেদিন ছিল ২৯শে জুলাই ১৯৪৬ সাল। তখন সকলের কী উৎসাহ, কী উদ্দীপনা। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বাধল। শেষ পর্যন্ত জার্মানী হেরে গেল সে-যুদ্ধে। সুভাষ বোস নেতাজী হলেন। গান্ধীজী জেল থেকে মুক্তি পেলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হল। আসমুদ্র-হিমাচল উল্লাসে উৎসাহে উদ্বেল হয়ে উঠল। দেশ অবশ্য ভাগ হল, কিন্তু তা হোক, ভারতবর্ষ থেকে সেই ইংরেজরা তো চলে গেল।

পণ্ডিতমশাইয়ের কথায় আমার তন্ময়তা কাটল। তিনি বললেন, এই স্বাধীনতার জন্যেই কি তোমার বাবা প্রাণ দিয়েছিলেন, তুমিই বল ?

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, চরিত্র গেলে সব চলে যায় বাবা। আমাদের চরিত্রটাই চলে গেছে। মানুষের চরিত্র নষ্ট হলে দেশের চরিত্রও নষ্ট হয়ে যায়। কথায় আছে রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, কিন্তু প্রজার দোষেও যে রাজ্য নষ্ট হয় তা এই সুলতানপুরকে দেখলেই বুঝতে পারি। আমার দুর্ভাগ্য বাবা যে আমাকে বেঁচে থেকে এই সব দেখতে হচ্ছে—

আমি বললাম, আপনি তো অনেকদিন জেল খেটেছিলেন, আপনি সরকারী পেনসন পাচ্ছেন না ?

পণ্ডিতমশাই বললেন, না বাবা, আমি ও নিইনি। ওই মদের দোকানের মালিক ভানু কর্মকার যে-পেনসন্ পাচ্ছে সে-পেনসন্ ছুঁতেও আমার ঘেন্না হয়। আমি নেব সরকারি পেনসন ? তার চেয়ে না খেয়ে উপোষ করে মরাও ভালো। তাঁর চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমি আর কোন কথা তাঁকে বলতে পারলাম না। তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমিও বাড়ি ফিরে এলাম।

হরিপদকে আবার ডেকে পাঠালাম। হরিপদকে আপনারা চেনেন। এই হরিপদই আমাকে কতবার বাঁচিয়েছে। ভক্তের বিপদে যেমন মধুসূদন, আমার বিপদে তেমনি হরিপদ।

বিশেষ করে পূজো-সংখ্যার মরসুম যখন আসে তখন আবার তাকে ডেকে পাঠাই। অন্য সময়ে ডাকলে হরিপদ তাড়াতাড়ি আসে। কিন্তু পূজোর মরসুমে ডাকলে পায়া ভারি হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে যে তাকে না হলে আমি অচল। অন্য সময়ে প্লট পিছু পাঁচ টাকা করে দিলে সেটাই হাত পেতে নিয়ে নেয়। বিশেষ আপত্তি করে না।

কিন্তু পূজোর সময় তার পায়াভারি হয়ে ওঠে। বার বার লোক পাঠিয়ে ডাকলেও তার দেখা পাওয়া যায় না। আমার লোককে বলে —তুমি যাও, আমি যাবো'খন কাল—

তারপর আমি হাঁ করে তার পথ চেয়ে বসে থাকি কিন্তু তার টিকিটাও দেখতে পাওয়া যায় না।

হরিপদ আমার বিপদ বোঝে। একসঙ্গে ছ'টা উপন্যাস আর পঁচিশটা গল্প লেখার যে কী ঝক্কি তা আমার চেয়ে হরিপদই বেশি বোঝে। বলে—আর আমার দ্বারা হবে না স্যার, আপনি এবার অন্য লোক দেখুন। যে-হারে আপনাদের পূজো-সংখ্যার হিড়িক বাড়ছে এরপর আমার দ্বারা আর হবে না—

কথাগুলো হরিপদ মুখে বলে বটে কিন্তু হরিপদর যে অফুরন্ত ভাঁড়ার তা হরিপদ যেমন জানে, তেমনি আমিও জানি।

হরিপদর গুমোর ভাঙবার জন্যে আমি অনেকবার অন্য লোক ডেকে এনে চেষ্টা করে দেখেছি। সবাই বলে তারাও নাকি গল্প সাপ্লাই করতে পারবে।

গল্প সাপ্লাই করার গোড়ার কথা হচ্ছে তাদের সঙ্গে আমাকে মিশতে হবে। মিশতে হবে মানে তাকে ঘরে বসিয়ে একটার পর একটা বিড়ি বা সিগারেট খাওয়াতে হবে। তারপর পান কিংবা-চা।

যার যেমন নেশা। একটু আজে-বাজে গল্প করতে করতে যখন গল্প জমে উঠবে তখন তার মধ্যে থেকেই আসল কাজ সেরে নিতে হবে। অর্থাৎ হাজারটা কথার মধ্যে একটা হয়তো আমার কাজে লাগলো।

গল্প সাপ্লাই-এর মূল কথা হলো একটু বাক্যবাগীশ লোক হওয়া চাই। যারা বেশি কথা বলে তারাই বেশি বাজে কথা বলে। লক্ষ-লক্ষ বাজে কথার ঝুড়ি থেকে আমাকে কাজের কথা বেছে নিতে হবে।

হরিপদই বাজে কথা বলতে সব চেয়ে বেশি পটু। এমন-এমন রাজা-উজির সে মারতে পারে যে অন্য কোনও ব্যাপার হলে আমি তাকে বাড়িতেই ঢুকতে দিতাম না।

কিন্তু-এ ব্যাপারে রাজা-উজির যতই মরুক সে ততই লাভ। রাজা-উজির মারতে-মারতে কখন যে সে একটা ভালো প্লট আমাকে দিয়ে ফেলতো তা সে নিজেই জানতো না।

গল্পটা লেখা হয়ে যাবার পর কোনও কাগজে হয়তো সেটা বেরিয়েছে, তখন সেটা হরিপদর নজরে পড়ে যেতেই সে ছুটে আসতো আমার কাছে।

বলতো—স্যার, এ গল্পটা আপনি কোথায় পেলেন ?

বলে গল্পটার প্লট্ বলে যেত। তারপর বলতো—এ তো আমার দেওয়া প্লট্ স্যার। কোন্ ফাঁকে আমি একটা প্লট্ বলতে-বলতে অন্য একটা প্লট্ তার ভেতরে বলে ফেলেছি, আর আপনি তা বেমালুম মেরে দিয়েছেন ? এর জন্যে তো আমি কোন দক্ষিণে পাই নি ?

তা এ-রকম হতো মাঝে মাঝে। বেশি বক-বক্ করলে অনেক সময় একটা প্লটের বদলে ছুটো প্লটও বেরিয়ে পড়তো। হরিপদ কথা বলার নেশায় তা জানতে পারতো না। মাঝখান থেকে লাভ হয়ে যেত আমার।

আমি অবশ্য হরিপদর লোকসান করিয়ে দিতাম না। আমি তাকে আরো কিছু টাকা দিয়ে তার লোকসান পুষিয়ে দিতুম।

যা' হোক এবার আমার ডাক পেয়েই হরিপদ এল।

সে আঁচ পেয়েছিল যে আমার জরুরী দরকার, নাহলে এত তাড়াতাড়ি এত জরুরী ডাক তাকে দিতুম না।

সে এসে একটা বিড়ি ধরালে।

বললে—একটা পান খাওয়াতে পারেন স্যার ?

শুধু পান নয়, চা, বিড়ি সব কিছুই তাকে খাওয়াতে হতো।

গরজ যখন আমার তখন তাকে একটু তোয়াজ করতেই হবে।

চা খেয়ে হরিপদ ধাতস্থ হলো। বললে—কী ব্যাপার স্যার? এত জরুরী তলব কেন? পুজো-সংখ্যা এসে গেছে বুঝি?

বললাম—হ্যাঁ, তুমি তো সবই জানো, তুমি তো আমার কাছে নতুন লোক নও—

হরিপদ বললে—ক'টা উপন্যাসের অর্ডার পেলেন?

বললাম—সবগুলো লিখবো না। লিখলে তো ছ'টা লিখতে হয়। তা অত লেখার সময়ও নেই আমার আর তোমারও মগজে অত প্লট নেই—

হরিপদর অহমিকায় বোধহয় আঘাত লাগলো।

বললে—সে কী বলছেন স্যার? হরিপদর মগজে প্লট নেই? আপনি ক'টা প্লট চান? নেহাৎ আমি লিখিতে পারি না তাই, নইলে আমি আপনাদের মত রাইটারদের এক হাত দেখিয়ে দিতুম। আমি এখনও এমন প্লট দিতে পারি যে তা লিখলে সঙ্গে সঙ্গে বাংলা হিন্দি তেলেগু তামিল সব ভাষার সিনেমা-রাইট্ বিক্রি হয়ে যাবে।

হরিপদ বরাবরই এমনি বাক্যবাগীশ। হরিপদর ওই একটিই গুণ। হরিপদ বেশি কথা বলে বলেই ও আমার লেখক-জীবনে এত অপরিহার্য। যারা আমার সামনে এসে চুপ করে ভক্তিতে গদগদ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকে তাদের দিয়ে আমার কোনও লাভ হয় না। লাভ হয় এই হরিপদর মতন সমস্ত বাক্যবাগীশ লোকদের দিয়ে। হরিপদরা যেখানে যতক্ষণ বসে থাকে ততক্ষণই শুধু গল্প করে যায়। শুধু গল্পই করে না, জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার কথা রসালো করে ঘোষণা করে। তার মধ্যে কত অমূল্য রত্ন থাকে তা কুড়িয়ে বেছে নেবার মত লোক আর ক'জনই বা থাকে। অনেক সময়ে এই বাক্যবাগীশরা জানেও না যে তারা অজান্তে কত উপন্যাস কত গল্পের প্লট বিলিয়ে দিচ্ছে।

জানতে পারলে হয়ত হরিপদরা সচেতন হয়ে পড়তো। আর কথা বলতো না।

এই রকম এক রাস্তার চায়ের দোকানের আড্ডা থেকেই আমি হরিপদকে খুঁজে বার করেছিলাম। তাকে আমার বাড়িতে আসতে বলেছিলাম। তারপর নেহাৎ দয়া-পরবশ হয়ে প্রথম প্রথম তাকে দু'চারটে টাকা দিয়েছিলাম।

তারপর থেকেই হরিপদর নেশা লেগে গেল।

নেশা লেগে গেল আমারও। অফুরন্ত গল্পের খনি ছিল ওই হরিপদ। আমি এক-একটা বই লিখেছি আর লোকে বাহবা দিয়েছে। আমার গাদা-গাদা টাকা হয়েছে আর হরিপদ প্রতি প্লট পিছু পাঁচটা করে টাকা পেয়েছে।

ইদানীং আমার চালাকিটা ধরতে পেরেছিল হরিপদ।

হরিপদ বলতো—এবার রেট একটু বাড়ান স্যার, আর পারছি না। দেখছেন তো সব জিনিসের দাম বাড়ছে—

বললাম—পরের বারে বাড়াবো—

হরিপদ বললে—দশ টাকা করে দেবেন স্যার। আমিও আপনাকে ভালো প্লট দেব। একটা এমন প্লট পেয়েছি স্যার যে শুনে চমকে উঠবেন—

বললাম—কী রকম?

হরিপদ বললে—একেবারে নতুন ধরনের প্লট স্যার। ওই এক-ঘেয়ে বিয়ের গল্প নয়। মেয়েছেলের প্রেম-ট্রেম নয়—

বললাম—প্রেম ছাড়া গল্প কি চলবে?

হরিপদ বললে—ও নিয়ে তো সবাই লেখে স্যার, সিনেমাতেও দেখেছি, এবার প্রেমের পরের প্লট নিয়ে লিখুন না—

বললাম—কী রকম?

হরিপদ বললে—এই ধরুন বিয়ে-টিয়ে হবার পর। বিয়ের পরের গল্প আপনারা কেউ লেখেন না কেন বলুন তো?

বুঝতে পারলাম না ঠিক তার কথাটা।

বললাম—বিয়ের পরের গল্প মানে?

হরিপদ বললে—বিয়ের আগের গল্প তো এতদিন আপনি লিখে এসেছেন। কিন্তু এবার লেখাটা ঘুরিয়ে দিন না একেবারে—

বললাম—তুমি বলে যাও, দেখি আমার ভালো লাগে কিনা—

হরিপদ বললে—তাহলে আর এক কাপ চা আনতে বলে দিন স্যার, আমিও আর একটা বিড়ি ধরিয়ে নি—

বলে হরিপদ একটা বিড়ি ধরিয়ে হুশ্ হুশ্ করে খানিক প্রাণপণে টানতে লাগলো।

তারপর বললে—কোন্ গল্পটা বলি বলুন তো? আপনার পুজো-সংখ্যার গল্প একটু নিরেস হলে তো আপত্তি নেই?

বললাম—কেন ? পুজো-সংখ্যার গল্প বলে কি ক্যাল্‌না ?

হরিপদ বললে—আজ্ঞে না, পুজো সংখ্যায় কেউ আপনারা ভাল গল্প লেখেন না কিনা। আমি তো দেখেছি সবাই দায়-সারা লেখা লেখেন কিনা। তাই ও-কথা বলছিলুম—

আমি বললুম—না, আমার বেলায় তা চলবে না। পুজো-সংখ্যার লেখাই হোক আর বোশেখ-সংখ্যার লেখা হোক, যখন বই বেরোবে তখন তো আমার নামেই বই বেরোবে। তখন তো পুজো-সংখ্যায় বেরিয়েছিল বলে সে-লেখাকে কেউ ক্ষমা করবে না।

হরিপদ বললে—সে আর ক'টা লেখক বোঝেন বলুন! সবাই তো নগদ বিদেয় পেলেই খুশী। অথচ মশাই আমি তো সেদিন হরিসাধনবাবুকে তাই বলছিলুম—এখন আপনার নাম হয়েছে তাই সাপ-ব্যাং যা খুশী তাই লিখেছেন, কিন্তু যখন একদিন আপনার ভক্তরাই আপনাকে লাথি মারবে তখন গরীবের কথার মূল্য বুঝবেন!

বলেই আবার হরিপদ বলতে লাগলো—আমি তো আজ এ লাইনে নতুন নয় মশাই, আমি বড় বড় রাইটারদের গল্প সাপ্লাই করে এসেছি। দেখেছি যখন তাদের খুব নাম তখন চারদিকে খুব রব-রবা, তারপর যখন নাম-ধাম সব গেল তখনকার হালও তো দেখেছি। তখন সম্পাদক বলুন পাবলিশার বলুন কেউ একবার তাদের ধার-কাছ দিয়েও ঘেঁষে না। এই-ই হচ্ছে দুনিয়া মশাই, এই হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম— !

প্রথম দিকে হরিপদ এই রকম উপদেশ কিছু ঝাড়বে। এ ওর বরাবরের নিয়ম। কারণ গরজ তো আমারই। তারপর খানিকক্ষণ বকর-বকর করে তখন আসল গল্প ধরবে।

বললুম—কই, এখনও যে সুরু করলে না ? ধরো। আমার যে এদিকে শিরে সংক্রান্তি।

হরিপদ বললে—মনটা বড্ড চঞ্চল রয়েছে স্যার, সেই জন্যেই ধরতে দেরি হচ্ছে, নইলে কি আর হরিপদর কাছে প্লটের অভাব ?

কেন, মনটা চঞ্চল রয়েছে কেন ?

হরিপদ বললে—এ হপ্তার র‍্যাশন আনা হয় নি এখনও টাকার অভাবে।

বললাম—ঠিক আছে, দু'টো গল্পের প্লট দাও, যদি পছন্দ হয় তো দশটা টাকা নগদ দিয়ে দেব এখনই। বলো আগেই দিয়ে দিচ্ছি—

বলে একটা পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে—

টাকা দেখে হরিপদর চোখ দুটো চক্-চক্ করে উঠলো। টাকাটা টপ্ করে আমার হাত থেকে নিয়েই পকেটে ফেললো।

তারপর বললে—ট্র্যাজেডি, না কমেডি কী চান বলুন এবার?

বললাম—সে যা হোক তোমার খুশী। আমার ভালো গল্প হলেই হলো।

হরিপদ বললে—তাহলে ট্র্যাজেডিই বলি স্যার। আমার নিজের জীবনও তো ট্র্যাজেডি স্যার। ট্র্যাজেডিতে আপনার হাতও ভালো খোলে—

বলে একটু থামলো।

তারপর বললে—আমাদের হেমদাবাবুর গল্পটা বলবো স্যার?

আমি হেমদাবাবুকে চিনতে পারলাম না। বললাম—কে হেমদা-বাবু?

হরিপদ বললে—আমার মালিক—

—তোমার মালিক মানে?

হরিপদ বললে—মানে আমার দণ্ডমুণ্ডের মালিক যিনি। মানে আমি যাঁর বাড়িতে থাকি। তিনিই আমাকে, আমার পরিবারকে থাকতে দিয়েছেন কিনা। অথচ থাকবার জন্যে একটা আধলাও বাড়ি ভাড়া নেন না—

বললাম—এ যুগে এ-রকম লোক তো বড় দেখা যায় না। তোমাদের থাকতে দেন আর টাকা নেন না?

না।

বললাম—তা হঠাৎ তোমার ওপর তাঁর এত দরদ কেন?

হরিপদ বললে—ওই তো, ওইটেই তো গল্প। ওই জন্যেই তো বলছি হেমদাবাবুকে নিয়েই লিখুন আপনি। লিখলে দেখবেন খুব নাম হবে আপনার। এইটে লিখলে ঝপাঝপ্ অনেকগুলো গল্পের অর্ডার পেয়ে যাবেন—

বললাম—বাজে কথা থাক, আসল গল্পে এসো। হেমদাবাবু কী করেন?

হরিপদ বললে—এককালে করতেন অনেক কিছু। লাখ-লাখ টাকার মালিক ছিলেন। আমি তো ছোটবেলা থেকেই ওঁর সঙ্গে আছি কিনা। একেবারে সেই আদিকাল থেকে। আগে তিনি যেমন

কাজের লোক ছিলেন এখন একেবারে তেমনি অকম্মা হয়ে গেছেন।

অথচ এককালে সমস্ত দিন খাবার সময়ই পেতেন না। তখন ওঁর কী বোল-বোলা। ভোর বেলাই বেরোতেন গাড়ি নিয়ে, আর কোনও দিন ফিরতেন সেই রাত পুইয়ে গেলে।

আমি বলতুম—হুজুর, আর কত দেরি করবেন? এবার বাড়ি যাবেন না?

বাবু বলতেন—আর একটু দাঁড়া রে, এই হয়ে এসেছে—

'হয়ে এসেছে' 'হয়ে এসেছে' বলতে বলতে কখন যে রাত দশটা এগারোটা বারোটা বেজেছে তার খেয়াল থাকতো না বাবুর। তারপর যখন খেয়াল হতো তখন বলতেন—উঃ, বড্ড দেরি হয়ে গেল রে—

আমি আসলে ছিলুম তখন বাবুর যাকে বলে ল্যাং-বোট, বাবুর সঙ্গে ঘোরাই ছিল আমার আসল কাজ। আমি বলতে গেলে কিছুই করতুম না। শুধু বাবুর সঙ্গে ছায়ার মতন পেছনে পেছনে ঘুরতুম। ছোটবেলা থেকে বাবুর কাছে কাজে ঢুকেছিলুম। বাবু একবার কলকাতায় এসেছিলেন কী একটা কাজে। আমার মামা একদিন বাবুর কাছে নিয়ে গেল আমাকে।

মামা বললে—আমার এই মা-মরা ভাগ্নেটাকে নিয়ে এসেছি হুজুর, এর একটা কিছু করে দিন—

বাবু বললেন—এতটুকু ছেলে কী করবে?

মামা বললে—আজ্ঞে আপনার ফাই-ফরমাস খাটবে। আপনার জলের গেলাসটা এগিয়ে দেবে। আপনার দরকার হলে গা-হাত-পা টিপে দেবে—

বাবু ভালো করে পরীক্ষা করলেন আমাকে। আমার দ্বারা গা-হাত-পা টেপার কাজ হবে কিনা তাই-ই বোধ হয় পরীক্ষা করে দেখলেন। আমাকে দিয়ে যে কোনও কাজই হবে না তা তিনি হয়ত আমাকে দেখেই বুঝতে পারলেন। কিন্তু তবু নিলেন আমাকে। আমাকে দিয়ে তাঁর কোনও কাজ হবে কিনা তা না বুঝেই আমাকে নিলেন। বাবুর তখন অনেক টাকা। টাকার যাকে বলে পাহাড়। তাই আমাকে নিয়ে লাভ হবে কি লোকসান হবে তা আর ভেবে দেখলেন না, আমাকে নিয়ে নিলেন। মাইনে-ফাইনের কথা আর উঠলো না। আমার তখন চরম অবস্থা একেবারে। পেট ভরে খেতে পাবো এইটেই আমার কাছে তখন বড় কথা। আর তা ছাড়া

মামাও আমাকে তার ঘাড় থেকে নামিয়ে বেঁচে গেল।

আমি গেলুম তাঁর সঙ্গে।

সে কি এখানে? যাকে বলে ধাধ্‌ধাড়া গোবিন্দপুর। কোথায় কলকাতা আর কোথায় সেই সখেরগঞ্জ।

উড়িষ্যা চেনেন তো? আর মধ্যপ্রদেশও চেনেন নিশ্চয়ই। সে স্যার এমনই এক দেশ যেখানে পাণ্ডবরাও বনবাস করবার সময় যেতে ভয় পেয়েছে। মানে যাকে কথায় বলে পাণ্ডব-বর্জিত দেশ। বাবু আমার তখন কন্‌ট্রাকটার মানুষ। লাখ-লাখ টাকা খাটছে তখন তাঁর কারবারে। তাঁর ওভারশিয়ার আছে, ইন্‌জিনীয়ার আছে, মিস্ত্রী, মজুর, কুলি-কামিন সবই আছে। কাজ হচ্ছে সিমেণ্ট-কন্‌ক্রিটের পুল তৈরি করা।

সরকারী কাজে যে অনেক ল্যাঠা তা আমি সেই তখনই জানতে পারলুম স্যার। বাবুর তখন একখানা জিপ্‌ গাড়ি ছিল। সেই জিপ্‌ নিয়ে মাইলের পর মাইল বাবু চালিয়ে যেতেন। আর সে কী জোরে চালানো।

আমি পাশে বসে থাকতুম। আমার ভয় করতো বড্ড।

বাবু বলতেন—কী রে হরিপদ, ভয় করছে তোর?

বলতুম—বাবু একটু আস্তে চালান—

বাবু হাসতেন, বলতেন—তোর যদি ভয়ই করবে তাহলে আমার সঙ্গে তুই আসিস কেন?

আমি বলতুম—আমার জন্যে বলছি না, মা আমাকে বলে দিয়েছে—

মা! হেমদাবাবু অবাক হয়ে যেতেন। বলতেন—মা? মা কী করে জানলে যে আমি জোরে গাড়ি চালাই—

আমি বলতুম—আমি বলে দিয়েছি।

বাবু বলতেন—তা কেন তুই বলতে গেলি আমি জোরে গাড়ি চালাই?

আমি বলতুম—বা রে, মা আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলবো না?

—তোকে মা কী জিজ্ঞেস করে?

আমি বলতুম—মা আমাকে সব জিজ্ঞেস করে। কোথায় গেলুম, কী করলুম, কী খেলুম সব বাড়ি গেলেই জিজ্ঞেস করে। কার সঙ্গে দেখা হলো, কে কী বললে, সব কথা যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস

করে আমাকে।

বাবু এসব জানতেন না। আমার কাছে শুনে যেন নতুন কিছু খবর পেয়ে যেতেন।

বলতেন—আমি যে তাস খেলি তাও বলিস নাকি মাকে ?

—হ্যাঁ, তাও বলি। আপনি কত টাকা তাস খেলে হেরে যান তাও বলি।

শুনে বাবুর মুখটা গম্ভীর হয়ে যেত। তারপরে বলতেন—দ্যাখ্, সব কথা তোর মাকে বলিস নি, জানিস। সব কথা মেয়েমানুষদের বলতে নেই।

আমি তখন খুব ছোট তো। আমি ঠিক বুঝতুম না বাবুর কথা-গুলো। বুঝতুম না কেন মেয়েমানুষদের সব কথা বলতে নেই।

তবু বলতুম—আচ্ছা ঠিক আছে, আর বলবো না—

বাবু বলতেন—বলবি, তবে কিছু কিছু বলবি। আমি তাস খেলে টাকা হেরে যাই এটা বলতে নেই, জোরে-জোরে গাড়ি চালাই এটাও বলতে নেই। মেয়েমানুষরা খুব ভীতু হয় কিনা তাই ওসব কথা শুনলে ভয় পেয়ে যাবে। বুঝলি ?

আমি বলতুম—হ্যাঁ, বুঝেছি—

কিন্তু বুঝেছি বললেও আমি তখন কিছুই বুঝতুম না। আর বোঝবার চেষ্টাই করতুম না স্যার। আর বুঝেই বা কী হবে ? আমি তো তখন ছেলেমানুষ! আমার তখন কেবল চারদিকে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগতো। বাবুর বাড়ি তখন ছিল জয়পুরে। জয়পুর হলো গিয়ে আজ্ঞে উড়িষ্যার একটা সহর। সহর কিন্তু ছোট সহর নয়। বেশ বড়। জিনিসপত্র সব পাবেন সেখানে আপনি। নুন থেকে সুরু করে চুন-সুরকি-সিমেণ্ট সব পাবেন। ওদিকে ভিজিয়ানাগ্রাম ইস্টিশানের নাম শুনেছেন ? সেই ইস্টিশান থেকে হাঁটা রাস্তায় আসতে গেলে শ' দেড়েক মাইল। আর কাছেই কোরাপুট। সেখানেও বাবুকে যেতে হতো দফতরের কাজে। আর পশ্চিম দিকে সোজা চলে গেলে পড়বে জগদলপুর। সেটা হলো মধ্যপ্রদেশ।

কিন্তু জয়পুরে যেখানে আমাদের বাড়ি সেটা স্যার সহর থেকে একটু দূরে। কনট্রাকটারের থাকবার জন্যে গভর্নমেণ্ট্ থেকে বাড়িটা দিয়েছিল। জয়পুরে এলে বাবু আর আমি ওই বাড়িতেই থাকতুম।

বাড়িটার একটা দোষ ছিল স্যার। বড্ড বড়। মানুষ তো

মাত্তোর দু'জন, বাবু আর মা। আর আমি। তা আমার কথা না বলাই ভালো। আমি তখন বলতে গেলে মানুষই নই। একটা পিঁপড়েও যা খায় আমিও তাই—

বাড়িটা বুঝি ছিল কোন্ রাজার। আদিকালে কোনও রাজা হয়ত রাজত্ব করতো ওই বাড়িতে বসে। সামনে ছিল একটা মস্ত ঝিল্। ঝিল্টা তখন আর্দ্ধেক মজে গেছে। যখন আগের যুগে ডাকাত আর গুণ্ডাদের রাজত্ব ছিল তখন তাদের সর্দার ছিল ওই রাজা। তারপর ইংরেজ-ফিংরেজ কত আমল গেছে। সে-সব ডাকাতও নেই তখন, ডাকাতদের সর্দাররাও নেই। বাবু বলতেন—সে-যুগে নাকি ডাকাতের সর্দাররাই রাজার মতন দেশের রাজ-কার্য চালাতো। তারপর যখন স্বদেশী আমল হলো তখন সেই সব রাজাদের সম্পত্তি সরকার নিয়ে নিলে। তখন নতুন করে সুরু হলো রাস্তাঘাট। নতুন করে তৈরি হতে লাগলো ইস্কুল-কলেজ। সাহেবদের জায়গায় দিশি সাহেবদের রাজত্ব সুরু হলো। সেই তখনি বাবু কনট্রাকটারি কাজ পেলেন ওইখানে।

আগে বাঘ-ভাল্লুক ঘুরে বেড়াতো ওসব জায়গায়। বাবু বলতেন—আগে তো আসিস নি তুই, আগে এলে তুই ভয়েই মরে যেতিস—এই সব বাঘ-ভাল্লুক ঘুরে বেড়াতে দেখেছি আমি—

শুধু বাঘ-ভাল্লুকই নয়, নদীতেও বড় বড় কুমীর। হেমদাবাবু প্রথম প্রথম যখন এখানে এসেছিলেন তখন হাতে বন্দুক নিয়ে ঘুরতেন। বন্দুক পাশে রেখে ঘুমোতে হত তখন! তখন তো জয়পুরের রাজবাড়িও ছিল না। প্রথম প্রথম একটা খড়ের চালের ঘরের মধ্যে থাকতেন আর বালিশের পাশে বন্দুক রেখে দিতেন।

প্রথম-প্রথম মা যায় নি সেখানে। কে সেই জঙ্গলের দেশে যায় বলুন তো ? আশে-পাশে কথা বলবার লোক কি আছে একটা ?

মা যখন প্রথম গেল তখন চারদিকের সব কিছু দেখে অবাক হয়ে গেল!

বললে—এখানে থাকবো কী করে গো ?

বাবু বললেন—কেন, এত বড় বাড়ি, কত ঘর, সামনে কত বড় ঝিল্, ওই ঝিলে বড় বড় মাছ আছে, দেখ না, কত পদ্মফুল ফুটে রয়েছে, কত বাহার চারদিকে দেখ তো, এখানে এই বারান্দায় বসে বাহার দেখতেই তো দিন কেটে যায়—

বাবু বাড়িতে সময় কাটাবার জিনিসপত্তোরের কোনও অভাব রাখেননি। কলের গান থেকে আরম্ভ করে শাড়ি-গয়না-টাকাকড়ি পর্যন্ত সব কিছু দিয়েছিলেন।

বাবু সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিয়ে বাইরে যেতেন। আর ফিরে এসেই জিজ্ঞেস করতেন—কী হলো, তোমার কিছু অস্থুবিধে হয় নি তো ?

মা বলতো—না—

যেদিন জয়পুরে থাকতেন বাবু সেদিন মা'কে নিয়ে বেরোতেন। যে-ক'টা দোকান ছিল সব দোকানে দোকানে ঘুরে জিনিস-পত্তোর কিনে বাড়িতে পাহাড় করে তুলতেন। গানের রেকর্ড কিনতেন, আর সারা দিন ধরে গান শুনতেন। আমিও গান শুনতুম। বাড়িতে আরো লোক-জন ছিল বটে, কিন্তু তারা থাকতো বাইরের বাড়িতে। আমি থাকতুম বাবুর ঘরের পাশের ঘরে।

তবে বাড়িতে তো বেশি দিন একসঙ্গে থাকবার স্থবিধে হতো না। একদিন কি ছ'দিন থেকেই বাবুর সঙ্গে বাইরে ছুটতে হতো।

কিন্তু ওই ছ'দিন এলাহি রান্না-খাওয়া হতো। সকাল থেকেই হয়ত রান্না হচ্ছে। বাবু রাঁধছেন আবার মা'ও রাঁধছে। আবার কখনও আমিও রাঁধছি। ছ'তিন রকমের মাংস রান্না হচ্ছে, তারপর মাছ। তারপর পোলোয়া, মাছভাজা, ডাল, দই, মিষ্টি—সে যেন আর শেষ নেই কিছুর। কত খাবো বলুন ? খেতে খেতে পেট ফেটে যেত এক-এক সময়। সেই সময়েই সারা জন্মের মত পেট ভরে মনের সাধ মিটিয়ে খেয়ে নিয়েছি স্যার। এখন আর খেতে পাই না সে-রকম। কিন্তু রাত্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এক-একদিন তখনকার খাওয়ার কথাগুলো ভাবি।

কিন্তু সব কিছু একদিন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল স্যার। এমন করে যে সব নষ্ট হয়ে যাবে তা আমি ভাবতেও পারি নি। তাই তো বাবুর জন্যে ছঃখু হয়। যে-মানুষ জীবনে অত ভোগ করেছে, অত টাকা উপায় করেছে, সেই মানুষের যদি দশা দেখেন আজ তো আপনিও চম্‌কে যাবেন স্যার। যে মানুষ একলা একশো মাইল দেড়শো মাইল মোটর চালিয়েছে, সেই মানুষ কিনা এখন নিজের বিছানা ছেড়েই ওঠে না। দেখলে ছঃখ হবে না ?

জিজ্ঞেস করলাম—তা কেন ও-রকম হলো ?

হরিপদ বললে—ওই তো বললাম—ট্র্যাজেডি। গল্পতে তো আপনারা ট্র্যাজেডি চান, হেমদাবাবুর মতন ট্র্যাজেডি আপনি আর কখনো শোনেন নি—

বললাম—কী রকম! খুলে বলো তুমি—

হরিপদ বললে—এ প্লটের জন্যে আপনাকে কিন্তু বেশি টাকা দিতে হবে স্যার, এই আপনাকে আমি আগে থেকে বলে রাখছি। এ যা-তা প্লট নয়। এটা যদি আপনি তেমন গুছিয়ে লিখতে পারেন তো দেখবেন আপনার কী রকম নাম হয়। আপনি স্যার প্রাইজ পেয়ে যাবেন—

—প্রাইজ? কী প্রাইজ?

হরিপদ বললে—ওই যে সব আপনাদের আজকাল সাপ-ব্যাঙ কী সব প্রাইজ দেয়, শুনেছি নাকি লাখ-লাখ টাকাও দেয়, আপনার কপালেও এই গল্পের জন্যে জুটে যেতে পারে স্যার, বলা যায় না—

বললাম—বাজে কথা থাক, তারপর কী হলো তাই বলো—

হরিপদ বললে—দাঁড়ান আর একটা বিড়ি ধরিয়ে নিই—

বলে আর একটা বিড়ি ধরালে। তারপর বললে—দেখুন, অনেকদিন আগের ব্যাপার তো, তাই যাতে মনে পড়ে সেই জন্যে মনের গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে নিচ্ছি—

তারপর একটু থেমে বললে—জীবনে কত রকম লোকই দেখলুম, কত জায়গাতেই যে ঘুরলুম। কিন্তু জয়পুরের মত অমন জায়গা আর জীবনে দেখলুম না। সকাল হবার আগেই বাবু আর আমি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তুম। গাড়ি চলছে তো চলছেই। পঞ্চাশ মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ি নদী। সেই নদীর ওপর বাবুর ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। ব্রিজ পুরো তৈরি হবার আগেই হয়ত হঠাৎ নদীতে বন্যা এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। তখন আবার গোড়া থেকে সুরু করো। তখন আবার নতুন করে লোহা-সিমেণ্ট এনে নতুন ব্রিজ বানাও। এই সব ব্যাপারে বাবুর খুব লাভ হতো।

নদীর ধারেই ছিল টিনের একটা গুদাম ঘর। সেখানে মিস্ত্রীদের যন্তর-পাতি থাকতো। বেশ উঁচু পাহাড়ের ওপর ঘরটা। তার মধ্যে থাকতো ওভারশিয়ার সুন্দরলাল কাপাডিয়া।

সুন্দরলালকে আমি দেখতুম আর অবাক হয়ে যেতুম। বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারার মানুষ। খুব মদ খেতো।

আমি সুন্দরবাবুকে জিজ্ঞেস করতুম—সুন্দরবাবু আপনার ভয় করে না? যদি বাঘ-টাঘ আসে এখানে?

সুন্দরবাবু বলতো—বাঘ তো রোজ আসে—

আমি চমকে উঠতুম সুন্দরবাবুর কথা শুনে। রোজ বাঘ আসে?

—হ্যাঁ, রোজ বাঘ আসে।

আশ্চর্য। বাঘ নাকি সুন্দরবাবুর ঘরের দরজার সামনে এসে ঘুরে বেড়াতো। মাঝে-মাঝে দরজায় ধাক্কাও দিত। কিন্তু সুন্দরবাবুর কোনও ভয় করতো না। তিনি তখন খাটিয়ার ওপর বসে বোতল থেকে মদ ঢালতেন গেলাসে আর তাইতে চুমুক দিতেন। আর সঙ্গে থাকতো মাংস-ভাজা। মাংস-ভাজা দিয়ে মদ খেতে নাকি খুব ভালো লাগে, কে জানে! তখন তো আমি ছোট, ও-সব রস বুঝতুম না।

টিনের গুদাম ঘরটার মধ্যে ভাগ-ভাগ করা অনেকগুলো কামরা ছিল। একটা ঘরে কয়েকজন লোক গাদাগাদি করে শুতো। সন্ধ্যের আগে সেই যে সবাই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তো, আর বাইরে বেরোত না কেউ। বাঘের ভয়ে সবাই ঘরের ভেতরে সিক্‌ড়ি জ্বেলে চাপাটি-ডাল-তরকারী বানাতো।

সন্ধ্যের আগেই আমরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তুম জগদলপুরের দিকে। সেখানেই পি-ডবলিউ-ডির অফিস। সেই অফিসের কর্তার সঙ্গে বাবুর দেখা করা দরকার। জগদলপুরে আমাদের কাজের জন্যে প্রায়ই যেতে হতো।

রাতটা কাটাতুম হোটেলে। সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে আমরা দু-জনেই ঘুমিয়ে পড়তুম। তারপর ভোরে উঠে আমি আবার বাবুর জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতুম। আর তারপর যেতুম পি-ডবলিউ-ডি'র অফিসে।

সেখানে গিয়ে বিলের টাকা নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়তুম সেই ব্রিজের কাছে। হপ্তা দিতে হবে মজুরদের। এক সপ্তাহ কাজ করার পর তখন কুলি-কামিনরা মজুরির জন্যে ওত পেতে বসে থাকতো। সার বেঁধে সব বসে থাকতো তারা। তারপর ওভারসিয়ারের লোক এক-এক করে সকলের নাম ডাকতো আর সবাই ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে টিপ ছাপ দিয়ে মাইনে নিয়ে যেত।

এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যেত। বর্ষা আসতো, গ্রীষ্ম আসতো, শীত আসতো, আর বাবু আরো কাজের

মধ্যেই ডুবে যেতেন।

তা কাজ তো আর একটা নয়।

একটা কাজ যদি শেষ হয় তো আর একটা কাজ সুরু হয়ে যেত অন্যদিকে। এ-ব্রিজটা শেষ হলে আর একটা ব্রিজ। ব্রিজ যেমন আছে, তেমনি আছে আবার রাস্তা। যে-সব জায়গায় অজগর জঙ্গল ছিল, যেখানে মানুষ কোনওদিন ঢুকতো না, সেখানে রাস্তা হয়ে যেত। আর মানুষের যাতায়াতের জন্যে নতুন পথ তৈরি হতো এদেশ থেকে ওদেশে। এদিকে উড়িষ্যা, ওদিকে অন্ধ্র আর পশ্চিমদিকে মধ্যপ্রদেশ।

তখন ইংরেজরা চলে গেছে, বড় বড় কাজের অর্ডার আসছে। বাবু আর একলা পেরে উঠতেন না তখন। একদিকে বাবুর পকেটে অঢেল টাকা আসছে, আর ওদিকে খাটতে খাটতে বাবু খাওয়া-নাওয়ার সময় পাচ্ছে না।

শেষকালে হয়ত হঠাৎ একদিন বাবু বলতো—ওরে হরিপদ, এবার চল, বাড়ি চল—অনেকদিন হলো বাড়ির মুখ দেখি নি—

তখন আবার বাড়ির কথা মনে পড়তো আমাদের। আবার আমাদের গাড়ি ছুটতো জয়পুরের দিকে।

মা তখন একলা। আমরা বাড়িতে পৌঁছুলেই মা সামনে এসে হাজির হতো। বলতো—এতদিনে সময় হলো তোমার?

বাবু গায়ের জামা ছাড়তে ছাড়তে বলতেন—কী যে করি, যত ভাবি চলে আসবো, তত দেরি হয়ে যায়। এই হরিপদকেই জিজ্ঞেস করো না, যেদিকে নিজে না দেখবো সেই দিকেই গণ্ডগোল—

মা হাসতে হাসতে বলতো—আর হরিপদকে সাক্ষী মানতে হবে না। আমি তোমার মুখের কথাই বিশ্বাস করেছি—

বাবু বলতো—এই দেখ, তুমি দেখছি আমার কথা বিশ্বাসই করছো না মোটে—

মা বলতো—কে বললে বিশ্বাস করছি না? আমি তো বলছি তুমি কাজ করতেই ব্যস্ত ছিলে। আমি কি বলছি তুমি কাজ না করে বসে বসে আড্ডা দিচ্ছিলে?

বাবু বলতেন—না না, তুমি হরিপদকে জিজ্ঞেস করো না একবার, করো জিজ্ঞেস—

তা আমাকে আর জিজ্ঞেস করতো না মা।

আমি মা'র কাছে গিয়ে বলতুম—না মা আমরা কোথাও একদিনের

জন্যেও বসে কাটাইনি। এখান থেকে সখেরগঞ্জ গিয়েছি, সখেরগঞ্জ থেকে কোরাপুট, আবার কোরাপুট থেকে সখেরগঞ্জ, তারপর আবার সখেরগঞ্জ থেকে জগদলপুর। এই ক'দিন কেবল এই-ই করেছি। শেষকালে জগদলপুরের খাজাঞ্চিখানা থেকে টাকা নিয়ে কুলিদের হপ্তা মিটিয়ে গিয়েছি। কুড়ি হাজার টাকা হপ্তা দিতেই আমাদের সমস্ত দিন লেগে গিয়েছে। নইলে কুলি-কামিন্‌রা হাট করবে কি করে ?

মা'কে এত কথা বলবার দরকার থাকতো না আমার। তবু বলতাম স্যার। ভাবতাম সত্যিই তো আমরা বেশ আরাম করে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর মা বাড়িতে দিনের পর দিন মাসের পর মাস একলা কাটাচ্ছে।

বাবু বলতেন—এই সখেরগঞ্জের কাজটা শেষ হয়ে গেলেই আমি একটু হাল্‌কা হবো। বুঝতেই তো পারছো ছিয়াশি লাখ টাকার কন্‌ট্রাক্ট, সোজা কথা তো নয়। তখন আমি আর নতুন কাজ হাতে নেব না—

সত্যিই, আমি দেখেছি বাবু তখন আর নতুন কাজ হাতে নিতে চাইতেন না। বাবু ইন্‌জিনীয়ারিং পাশ করার পর সরকারি চাকরি করেছিলেন অনেকদিন। চাকরি করতে করতে ব্যবসার দিকে মন ঝুঁকেছিল। মনে হয়েছিল চাকরি করে সময়ও যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনি আবার টাকাও আমদানি হচ্ছে কম। অথচ খাটুনির দিকটা প্রায় সমানই। তার ওপর আছে ওপরওয়ালার হুম্‌কি। সকলের কি আর কারো তাঁবে থাকতে মন চায় ? এক-একজন লোক থাকে যাদের হুকুম মানতে কষ্ট হয়, হুকুম করতে পারলেই খুশী হয়। আমার বাবু সেই জাতের লোক স্যার।

কিন্তু এখন বাবু বলেন—সেদিন চাকরি ছাড়াই আমার ভুল হয়েছিল রে হরিপদ, নইলে আজ আমার এত দুর্দশা হতো না—

গল্প বলতে বলতে হরিপদ থামলো। তারপর বললে—এক কাপ চায়ের অর্ডার দিন স্যার, গল্পটা এবার জমিয়ে দেব—

আমি বললাম—গল্প তোমাকে জমাতে হবে না হরিপদ, তুমি শুধু পয়েণ্ট বলে যাও, জমাবার দরকার হলে আমি জমিয়ে দেব—

হরিপদ বললে—কিন্তু আমি মাল-মশলা সাপ্লাই না করি আপনি জমাবেন কী দিয়ে ? গরম-মশলা না দিলে রান্নায় স্বাদ হয় ? তা মাল-মশলা বার করতে গেলে চা লাগবে না ?

হরিপদকে চটিয়ে লাভ নেই। সুতরাং তখনই চায়ের অর্ডার দিলুম।

চা আসতেই হরিপদ চুমুক দিয়ে বিড়ি ধরালো।

বললে—আসলে কী জানেন স্যার, আমি ভেবে দেখছি, সুখ সবার কপালে হয় না। টাকা থাকলেও সয় না, টাকা না-থাকলেও সয় না, আমার বাবুর ব্যাপারটা দেখুন না, টাকা তো বাবুর কম ছিল না! সে যে কত টাকা তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। এক-একদিন চল্লিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার টাকা মাটিতে বিছিয়ে তার ওপর বিছানা পেতে আমরা ছু'জন শুয়েছি। চারদিকে বন-জঙ্গল পাহাড় আর বাঘ-ভাল্লুক; আমরা তার ভেতরে একটা টিনের ঘরে রাত কাটিয়েছি। এক-একদিন নদীতে বৃষ্টি হয়ে আমাদের ঘরের মেঝে জলে ভেসে গেছে। তবু নেশা! কীসের নেশা যে বাবুর তা বলতে পারবো না, হয়তো কাজের নেশা, নয়তো টাকার নেশা। আমরা মশাই একটা-না-একটা নেশায় মশগুল হয়ে জীবন কাটাচ্ছি। অথচ সেই নেশাখোর হেমদাবাবুর জীবনটা দেখে আমার শিক্ষা হয়ে গেছে!

বললাম—তারপর?

হরিপদ বলতে লাগলো—তা এমনি করেই তো আমাদের দিন কাটছিল। ঠিক এই সময়ে একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটলো। একদিন হঠাৎ পুলিশ এসে আমার মা'কে ধরে নিয়ে গেল। আমরা তখন সখেরগঞ্জে। সখেরগঞ্জে কুলি-কামিন খাটাচ্ছি। সামনে বর্ষা আসছে বর্ষার আগেই কাজ খতম্ করতে হবে।

আধখানা ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে আমার বাবু ব্রিজের তদারক করছেন। এমন সময় সুন্দরলালজী দৌড়তে দৌড়তে এল।

এসে বললে—হুজুর, জয়পুর থেকে আপনার টেলিগ্রাম এসেছে—

—কী টেলিগ্রাম? কে টেলিগ্রাম করেছে?

সুন্দরলালজী বললে—তা তো দেখি নি হুজুর—

ততক্ষণে আমার বাবু টেলিগ্রামের ভাঁজটা খুলে একমনে পড়ছেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের চেহারাটা দেখছি। দেখলুম মুখটা কেমন লাল হয়ে উঠলো হঠাৎ। তারপর বাবু আর সেখানে দাঁড়ালেন না।

তাড়াতাড়ি গুদাম-ঘরের দিকে চলতে চলতে আমায় বললেন—হরিপদ আয়—

আমি বুঝতে পারলুম না কী আছে টেলিগ্রামে। তাঁর পেছন-

পেছন চলতে লাগলুম। জিপ গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। ড্রাইভারও তৈরি। বাবু সেখানে উঠে বসলো। আমিও উঠে বসলুম।

ড্রাইভারকে বাবু বললেন—চল্, বাড়ির দিকে চল্—

বাবু যে হঠাৎ কী জন্যে বাড়িতে যেতে মনস্থ করেছেন তা বুঝতে পারলুম না। গাড়ি চলতে লাগলো হু-হু করে। আমি চুপ করে পাশে বসে আছি।

বাবু আবার বলে উঠলেন—একটু শিগ্‌গির শিগ্‌গির চল্ রে—বড় জরুরী কাজ আছে—

আমি বুঝতে পারলুম একটা কিছু বিপদ-আপদ হয়েছে। নইলে বাবুর মুখের চেহারা তো এমন হয় না কখনও।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—কীসের টেলিগ্রাম বাবু?

বাবু আমার কথার উত্তর দিলেন না। যেন আমার কথা শুনতেই পেলেন না।

আমি আর কথা বললুম না। কিন্তু খানিক পরেই যেন বাবুর খেয়াল হলো। জিজ্ঞেস করলেন তুই কিছু জিজ্ঞেস করছিলি আমাকে?

বললুম—হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করছিলুম কীসের টেলিগ্রাম?

বাবু বললেন—তোর মাকে পুলিশে এ্যারেস্ট করেছে—

আমি চম্‌কে উঠেছি। মাকে পুলিশে ধরেছে! আমার কান্না পেতে লাগলো। মা'কে কেন পুলিশ ধরবে! মা কী করেছে!

বাবুর মুখের দিকে চাইলুম। সে মুখে কোনও কিছু খুঁজে পেলুম না।

জিজ্ঞেস করলুম—মা'কে কেন পুলিশে ধরেছে বাবু? মা কী করেছিল?

বাবু ধমকে উঠলেন। বললেন—কেন পুলিশে ধরেছে তা আমি এখান থেকে কী করে বুঝবো?

আমি আর কিছু কথা বললুম না। বাবুর মত আমি শুধু চুপ করে বসে রইলুম। আর গাড়িটা ঝড়ের বেগে ছুটে চলতে লাগলো। কিন্তু সময় যেন আর কাটতে চায় না, রাস্তা যেন আর ফুরোয় না। সেই সন্ধ্যেবেলা বেরিয়েছি, তারপর রাত দশটা বাজলো। এগারোটা বাজলো, বারোটা বাজলো। কিন্তু তখনও রাস্তা যেন আর ফুরোতে চায় না, সময়ও যেন আর কাটতে চায় না।

শেষ রাত্রের দিকে যখন কোরাপুটের দিকের আকাশটা একটু

স্পষ্ট হতে সুরু করেছে তখন আমরা জয়পুরের কাছাকাছি এসে পড়েছি।

যখন সহরে ঢুকলুম তখন বেশ ফরসা হয়েছে চারদিকে। সহরের রাস্তায় তখন দু-একজন লোকজন চলছে।

আমাদের গাড়িটা বাড়ির দিকে গেল না। বাবু ড্রাইভারকে থানার দিকে চলতে হুকুম দিলেন।

থানার সামনে যেতেই বাবু এক লাফে নেমে পড়লেন।

থানার দারোগা তখনও থানায় আসে নি। একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল। বাবু তাকেই বলল দারোগাবাবুকে ডেকে দিতে।

পুলিশটা বোধহয় আমার বাবুকে চিনতো। বাবুকে নিয়ে থানার ভেতরে গেল।

থানার ভেতরে তখন ছোট দারোগা অফিসের ভেতরেই একটা টেবিলের ওপর ঘুমিয়েছিল।

বাবুকে দেখে ছোট দারোগা উঠে বসলো। বললে, আসুন স্যার—

বাবু বললেন—আমার স্ত্রীকে নাকি আপনারা এ্যারেস্ট করেছেন?

ছোট দারোগাবাবু বললে—হ্যাঁ—

বাবু বললেন—কেন! কী হয়েছে? কী করেছিল সে?

ছোট দারোগাবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বড় দারোগাবাবু এসে হাজির।

বড় দারোগাবাবু সব জিনিসটা বুঝিয়ে বললে।

—চক্ বাজারের কমল চৌধুরী খুন হয়েছে, তা শুনেছেন?

চক্ বাজারের কমল চৌধুরী খুন হয়েছে! ব্যাপারটা যেন কেমন গোলমেলে মনে হলো বাবুর কাছে। বাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন, খবরটা শুনে পাশের চেয়ারটাতেই ধপ্ করে বসে পড়লেন। খবরটা আমার কাছেও একটা ভয়ের খবর! আমি পাশে দাঁড়িয়ে ছিলুম, আমারও খবরটা শুনে মাথা খারাপ হয়ে গেল।

কমল চৌধুরী সাহেবকে আমিও চিনতুম। জয়পুরের কমল চৌধুরী সাহেব ছিল জাতে রাজপুত। কী করে কোন্ সুবাদে যে রাজপুতানা থেকে তাদের পূর্বপুরুষ সেই জয়পুরে এসে গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান করেছিল কে জানে!

আমি যখন থেকে দেখছি তখন দোকানের মালিক ছিল কমল চৌধুরী। চক্ বাজারের রাস্তার মোড়ের ওপরেই দোকান। কলকাতা

থেকে গানের নতুন রেকর্ড এলেই চৌধুরী সাহেব সে-গুলো দোকানের ভেতরে বাজাতো। আর সেই গান শুনতে রাস্তার লোক ভিড় করতো দোকানের সামনে। হিন্দী-বাংলা গান শুনে লোকে আর সেখান থেকে নড়তে পারতো না।

বাবু যখন সখেরগঞ্জ থেকে ফিরে আসতেন তখন মাকে নিয়ে বাজারে কেনা-কাটা করতে বেরোতেন।

আমিও বাবু আর মার সামনে থাকতুম। সহরটা তো ছোট, তাই সহরের বাজারটাও ছিল ছোট। কিন্তু মোটামুটি সব রকম জিনিসই পাওয়া যেত সেখানে। কখনও কিনতো ক্যামেরা, কখনও ক্যামেরার ফিল্ম। কখনও বাড়ির জন্যে ফার্ণিচার। আবার কখনও ঘরের আসবাব-পত্তোর। ঘরের পর্দা একটু পুরোন হয়ে গেলেই আবার নতুন পর্দা কেনা হতো। আর শাড়ী ব্লাউজ? শাড়ী ব্লাউজ যে মার কত ছিল তা মা বোধহয় নিজেই জানতো না। শাড়ী-ব্লাউজ-জুতো ছাড়া ছিল গয়না। সোনার গয়না। চক্ বাজারে স্যাকরার দোকান ছিল হু' তিনটে। সেখানে গিয়ে বাবু একটা-বা দুটো গয়না কিনবেনই।

মা বলতো—ও-সব কিনছো কেন? ও কে পরবে?

বাবু বলতেন—কেন তুমি? তুমি ছাড়া আর কে পরবে?

মা বলতো—না, আমি আর গয়না নেব না।

বাবু বলতেন—নাও না, গয়না নিলে তোমার ক্ষতিটা কী?

মা বলতো—গয়না আমি পরবো কোথায়? গয়না পরবার জায়গা তো আর নেই আমার—

বাবু বলতেন—কেন, রোজ একই গয়না পরতে হবে তার কী মানে আছে? আজ একটা পরবে, কাল একটা পরবে। আর হয়ত এবেলা একটা পরবে, আবার ওবেলা আর একটা।

মা হাসতো। বলতো—গয়না পরে সেজে-গুজে বাড়িতে বসে থাকবো?

বাবু বলতো—বাড়িতে বসে থাকবে কেন? তোমার গাড়ি রয়েছে, বাজারে আসবে, যেটা দরকার হয় কিনবে—

মা বলতো—কী কিনবো তুমি বলে দাও—

বাবু বলতেন—কেন, যা তোমার খুশী। তোমার কাছে তো চেক-বই আছে। টাকা তো তোমার নামে ব্যাঙ্কে কিছু কম রাখি নি—

মা বলতো—তা এত টাকা আমি যা-তা কিনে নষ্ট করবো? টাকা তোমার উপায় করতে বুঝি কষ্ট করতে হয় না?

বাবু বলতেন—ও ছেড়ে দাও, টাকা উপায় করছি তো তোমার জন্যেই।

—আমার জন্যে? আমি অত টাকা কী করবো?

বাবু বলতেন—টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়ে রেখে দেবে। আমি যদি মারা যাই তো সেই টাকা খরচ করে তুমি আরামে দিন কাটাবে, কারোর কাছে হাত পাততে হবে না—

এ-সব কথা যখন হতো তখন আমিও পাশে থাকতুম। দু'জনের কথা-বার্তা শুনতে আমার খুব ভালো লাগতো। সত্যি এত মিল ছিল দু'জনের মধ্যে যে কী বলবো। সত্যি, আমি যেন দু'জনের মধ্যে ঠিক ছেলের মত ছিলুম স্যার। সে-সব কথা মনে পড়লে এখন খুব মনে কষ্ট হয় স্যার। জীবনে তো নিজের বাবা-মা'কে দেখি নি, ওঁরাই ছিল আমার বাবা-মা। ওঁদের আমি বাবা-মা'র মতই দেখতুম কিনা।

কিন্তু সেই মা'কেই কিনা পুলিশে ধরলে! ভাবুন, কী অনাসৃষ্টি কাণ্ড!

তা বাবু জিজ্ঞেস করলে—কমল চৌধুরী যদি খুন হয়ে থাকে তো আমার স্ত্রীকে এ্যারেস্ট করছেন কেন?

বড় দারোগাবাবু বললে—আপনার মিসেস, মিস্টার চৌধুরীকে মার্ডার করেছেন—

বাবু চমকে উঠলেন। বললেন—আপনি ভুল করেছেন নিশ্চয় ইনস্‌পেকটার। আমার মিসেসকে আপনি চেনেন না। তিনি কখনও কাউকে মার্ডার করতে পারেন না—

দারোগাবাবু বললে—দেখুন, আমাদের হাতে প্রমাণ না থাকলে কি একজন রেসপেক্টেবল্ মহিলাকে এ্যারেস্ট করি? আমরা সব দেখে শুনেই তবে তাঁকে ধরেছি—

বাবু বললেন—আমি তাহলে জামিনের ব্যবস্থা করি—

বড় দারোগাবাবু বললে—জামিন তো এ-কেসে দেওয়া হবে না—

—কেন?

বড় দারোগাবাবু বললে—আইন নেই—

আইন তো বাবুর জানা নেই। বাবু আর কী করবেন! বাবুর

তখন মাথা ঘুরছে। একে সারা রাত ঘুমোয় নি। তার ওপর তার আগের দিনও খাটুনি গেছে বিস্তর।

কী আর করা যাবে!

বাবু খানিকক্ষণ কী ভাবলেন তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন—চল্—

আবার আমি গাড়িতে উঠলুম, বাবুও আমার আগে উঠে বসলেন। দু'জনেই চললুম উকিলের বাড়ি। ভরদ্বাজ সাহেব ছিল শহরের সব চেয়ে বড় উকিল। তার বাড়িতে দু'জনে গিয়ে হাজির। ভরদ্বাজ সাহেবের ওখানে তখন খুব নাম-ডাক। নাম-ডাক যার যত হবে তার তেমনি আবার মক্কেল। মক্কেলের ভিড়ে ভরদ্বাজ সাহেবের সময় হয় না।

কিন্তু বাবুর কথা আলাদা। বাবুর তখন জীবন-মরণ সমস্যা। সেই অত সকাল-বেলাই ডেকে পাঠানো হলো।

ভরদ্বাজ সাহেব এসে বৈঠকখানা ঘরে বসলেন। বাবুর মুখ থেকে সব ঘটনা শুনলেন।

বললেন—দেখি আমি কী করতে পারি—

বলে সেদিনকার মতো আমরা বাড়ি চলে এলুম। বাড়ি তখন খাঁ খাঁ করছে। চারদিক ফাঁকা।

আমি বাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম। মা যে-ঘরে থাকতো সে-ঘরে গেলুম। মা'র জিনিস-পত্র তখন চারদিকে ছড়ানো। শাড়িটা তখনও ছাড়া রয়েছে। মা যে-আয়নায় মুখ দেখতো সেই আয়নাটাতে তখনও যেন মা'র মুখ খুঁজতে লাগলুম। কোথায় মা। অন্যদিন আমরা ফিরে এলেই মা হাসিমুখে এগিয়ে আসতো। কত কথা শুনতো। কিন্তু সেদিন আর কেউ কোথাও নেই।

মা'র কাজের জন্যে বাবু বাড়িতে অনেক ঝি-চাকর রেখেছিলেন।

সারদা এগিয়ে এল কাঁদতে কাঁদতে।

কথা বলবে কী, তার কান্নাই আর থামে না।

বললে—পুলিশ এসে মা'কে ধরে নিয়ে গেছে বাবু, আমি কী করবো? আমি বুড়ো মানুষ একলা কিছু করতে পারলুম না। আমার কথা কেউ শুনলে না। আমি বললুম যে বাবু আসুক তারপর ধরে নিয়ে যেও মা'কে, তা শুনলে না—

বাবু জিজ্ঞেস করলেন—তা, মা কী করেছিল যে তাকে ধরলে?

সারদা বললে—কী করেছে তা কী করে জানবো ?

সারদা কথা বলে আর কাঁদে।

আমাদের নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠলো তখন। খেতেও তখন ইচ্ছে করছিলো না কারো। মা'ই যখন নেই তখন খাবো কি করে ?

মা জেলখানার মধ্যে খেতে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না কে জানে।

যা হোক, বাবু আমাকে বললেন—এবার আমি একবার বেরোচ্ছি—

আমি বললুম—আমিও যাবো বাবু—

বাবু বেরোলেন। আমিও সঙ্গে চললুম।

একেবারে সোজা থানায়। হাজত-থানায় তখন মা'কে রাখা হয়েছে।

বড় দারোগাবাবু তখন থানায় ডিউটিতে এসেছে।

বাবু জিজ্ঞেস করলে—আমিএকবার আমার মিসেসের সঙ্গে দেখা করতে পারি ? অন্ততঃ আধ ঘণ্টার জন্যে ? আমি এক্ষুনি মিস্টার ভরদ্বাজের কাছ থেকে আসছি, এই মামলাটা আমি তাঁকেই দিয়েছি প্লিড্ করতে—

বড় দারোগাবাবু রাজি হলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা কনস্টেবলকে হুকুম হয়ে গেল আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্যে। সে পাহারা দেবে।

দু'একটা কামরা পেরিয়ে যখন আমরা ভেতরে ঢুকলুম তখন দেখলুম একটা ঘরের কোণে একটা খালি তক্তপোষ রয়েছে, তার ওপরে মা চুপ করে বসে।

বাবু সেদিকে এগিয়ে যেতেই মা বললে—তুমি এসেছো ? কে খবর দিলে তোমাকে ?

বাবু বললেন—সারদা কাকে দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল—

মা বললে—ভালোই হয়েছে—আমি খুব ভাবছিলুম—

তারপর আমার দিকে চেয়ে মা বললে—কী রে হরিপদ, কাঁদছিস কেন ?

আমি মার কথা শুনে আরো কেঁদে ফেললুম। দু'হাতে চোখ-মুখ ঢেকে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলুম।

মা আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে—দেখ দিকিনি হরিপদর কাণ্ড, ও মনে করেছে আমি সত্যি-সত্যিই বুঝি খুন করেছি —ছিঃ, কাঁদে না, আমার কিছ্ছু হবে না দেখবি, আমাকে দিন কতক বাদেই ছেড়ে দেবে—

সে-কথায় কান না দিয়ে বাবু জিজ্ঞেস করলে—সত্যি বলো তো

কী হয়েছিল ?

মা বললে—সে কী, তুমি ভয় পেয়ে গেছ নাকি ?

বাবু বললেন—না, আমাকে তো উকিলকে সব বলতে হবে—

মা বললে—তোমাকে বলতে হবে না, এ খুব সহজ কেস, কাকে উকিল দিয়েছ ?

বাবু বললেন—মিস্টার ভরদ্বাজকে, উনিই তো এখানকার সব চেয়ে বড় ক্রিমিন্যাল উকিল। একশো টাকা ফিস্— ! তোমার খবরটা নিয়েই আমি একটু আগেই মিস্টার ভরদ্বাজের বাড়ি গিয়েছিলুম—

মা বললে—সত্যিই কি তোমার সন্দেহ হয় নাকি আমাকে ? আমি কাউকে খুন করতে পারি ?

বাবু বললেন—না, সে জন্যে নয়, আমি মিস্টার ভরদ্বাজের কাছে শুনলুম আমার বন্দুকটা নাকি কমল চৌধুরীর ডেড্-বডির পাশেই পাওয়া গিয়েছিল। আমার সেই বন্দুকটাও তো এখন পুলিশের হেফাজতে—পুলিশ সেটাও তো আটক্ করেছে।

—তাহলে তুমিও বিশ্বাস করলে আমি কমল চৌধুরীকে খুন করতে পারি ?

মা বললে—তুমিই তো বলেছিলে বন্দুকটা দোকানে নিয়ে গিয়ে সারিয়ে রাখতে। ওটাতে কী দোষ ছিল তা তো তুমিই জানো—

বাবু বললেন—সে যাক, তারপর ?

মা বললে—মিস্টার চৌধুরী আমার বাড়িতে সকালে এসেছিলেন, কয়েকটা খুব ভালো গানের রেকর্ড নাকি তাঁর দোকানে এসেছে, তাই বলতে। আমি বললুম আমি আপনার দোকানে গিয়েই শুনবো। আমার চক্-বাজারে যাবার কথা আছে ওঁর বন্দুকটা সারাতে দেবার জন্যে—

বাবু জিজ্ঞেস করলে—তারপর ?

বাবুর মনে পড়লো বন্দুকটা তার ঠিক মত কাজ করছিল না ক'দিন ধরে। বনে-জঙ্গলে ঘুরতে হয়, তাই বাবুর সঙ্গে বন্দুকটা থাকে সব সময়ে। কিন্তু সময় হচ্ছিল না সারাতে দেবার। মা'কে বলে রেখেছিলেন—তুমি যখন চক্-বাজারে যাবে ওটা সারাতে দিও তো—

সে কয়েকদিন আগেকার কথা। বাবু নিজেও সে-সব কথা ভুলে গিয়েছিলেন। হাজারটা কাজ যার মাথায় তার কি অত কথা মনে

থাকে। মা বলতে তবে আবার মনে পড়লো—

বললে—তারপর ?

মা বললে—আমার কথা শুনে মিস্টার চৌধুরী বললেন, বন্দুক কী হয়েছে ? তা আমি বললুম, তা জানি না। তখন মিস্টার চৌধুরী বললেন—আমাকে দেবেন আমিই সারিয়ে দেব, ও-সব ছোট-খাটো ব্যাপার, ওর জন্যে দোকানে কেন দেবেন, মিছিমিছি ওরা একগাদা টাকা নিয়ে নেবে—

বাবু উদগ্রীব হয়ে শুনছিল। বললেন—তারপর ?

মা বললে—তারপর মিস্টার চৌধুরীর কথা শুনে আমি হাসতে হাসতে বললুম, আপনি তো গানের রেকর্ড বিক্রি করেন, আপনি আবার কলকজার কাজ জানেন নাকি ?

মিস্টার চৌধুরী বললে—আমার তো গ্রামোফোন সারানোও কাজ। কল-কজা নাড়া-চাড়া করতেই তো হয় আমাকে আর তা ছাড়া আগে আমার নিজেরও বন্দুক ছিল, দরকার হলে আমার বন্দুকের ছোট-খাটো দোষ-টোষ আমি নিজেই সারাতুম—

বলে মিস্টার চৌধুরী আমার কাছে বন্দুকটা দেখতে চাইলেন। আমি সেটা এনে তাকে দেখালুম। উনি নেড়ে-চেড়ে দেখলেন।

তারপর বললেন—এ কিছু না, সামান্য ব্যাপার, এটা আমি নিজেই সেরে দিতে পারবো—মিছিমিছি কেন মিস্ত্রীদের কাছে দেবেন, তারা আপনাকে আনাড়ি পেয়ে অনেকগুলো টাকা খসিয়ে দেবে—

বলে তিনি বন্দুকটা নিয়ে চলে গেলেন। বললেন—আপনি তো বিকেল বেলা গান শুনতেই আসছেন ততক্ষণে এটা সারানো হয়ে যাবে, আমি এটা আপনাকে ফেরৎ দিয়ে দেব—

বাবু মার কথাগুলো শুনতে শুনতে আবার বললেন—তারপর ?

তারপর যেমন কথা ছিল, আমি বিকেল বেলা মিস্টার চৌধুরীর দোকানে গিয়েছি, দোকানের সামনের দিকে কেউ ছিল না। আমি বাইরের রাস্তায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকলুম। ভাবলুম মিস্টার চৌধুরী হয়তো ভেতরে আছেন। পেছনেই তো ওঁর লাগোয়া বাড়ি। আমি বাইরে থেকে ডাকলুম—মিস্টার চৌধুরী—মিস্টার চৌধুরী—

মিস্টার চৌধুরী ঠিক পেছনের ঘরেই ছিলেন। তিনি বললেন—আসুন, আসুন মিসেস বোস—

মা বলতে লাগলো—আমি তাঁর কথায় ভেতরে গেলুম। সেটা তাঁর গ্রামোফোনের যন্ত্র-পাতি সারানোর কারখানা—

আমি যেতেই মিস্টার চৌধুরী বললে—আসুন, বসুন, আপনার বন্দুকটা সারিয়ে দিয়েছি। আর একটু বাকি আছে। এই এখ্খুনি হয়ে যাচ্ছে—

বলে মিস্টার চৌধুরী আবার সারাতে লাগলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—আপনার দোকানের সামনেটা একেবারে ফাঁকা, সেই ছোকরাটা কোথায় গেল আপনার?

মিস্টার চৌধুরী বললেন—তাকে একটা কাজে পাঠিয়েছি, এখুনি আসবে সে—

বললাম—আর আপনার ভাগ্নে ছিল না একজন?

মিস্টার চৌধুরী বললেন—সে বাড়িতেই ছিল এতক্ষণ, কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে গেছে বোধহয়। সেই তো আমার সংসারের গিন্নী, সে না হলে তো আমি উপোষ করতুম। রান্না-টান্না সব সে-ই করে—

ততক্ষণে বন্দুকটা সারা হয়ে গিয়েছিল। মিস্টার চৌধুরী সেটা নিয়ে একটু নাড়া-চাড়া করতে যেতেই হঠাৎ একটা দুম্ করে শব্দ হলো। আর তারপর ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেল ঘরটা। আমার মাথায় তখন বজ্রাঘাত। আমি কী করবো বুঝতে পারলুম না। সেই অবস্থাতে কিছু ঠিক করতে না পেরে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। ততক্ষণে চারদিক থেকে লোক ছুটে আসতে সুরু করেছে। আমি আর কোনও দিকে না চেয়ে একেবারে সোজা গাড়িতে এসে বসলুম। তারপর মঙ্গলকে বললুম—মঙ্গল শিগগির চালাও, বাড়ি চলো—

ততক্ষণে দেখা করার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাবু উঠলো।

মা বললে—আবার কখন আসবে?

বাবু বললেন—বিকেলে একবার উকিলবাবুর কাছে যাবো, দেখি তিনি কী বলেন। তোমার কিছু দরকার আছে? আর একটা শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ এরা দিতে দেবে কিনা পুলিশকে জিজ্ঞেস করে দেখি—

মা বললে—আমাকে জামিন দেবে না? জামিনে আমি তো খালাস পেতে পারি—তারপর মামলা যখন কোর্টে উঠবে তখন না-হয় আসবো—

বাবু বললেন—আমি তো মামলা-মকর্দমার কিছুই জানি না,

উকিল বাবুকে জিজ্ঞেস করবোখন—

বলে বাবু চলে আসছিল। মা বললে—আমার ফুল-গাছগুলোতে একটু জল দিতে বোল মালিকে বুঝলে? গোলাপের একটা নতুন চারা পুঁতেছি, সেটা যেন মরে না যায়।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—আর ছ্যাখ্ হরিপদ, সারদাকে বলে দিস পাখিটাকে যেন খেতে-টেতে দেয়। আমি তো নেই, হয়ত কোনও দিকে কেউ খেয়াল রাখবে না—

বাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—তোমাকে এরা চা দিয়েছে? যদি না দিয়ে থাকে তো আমি এদের হাতে টাকা দিয়ে যেতে পারি, তোমার যখন যা দরকার হয় দেবেখন—

মা বললে—যদি ওরা দেয় তো দাও—

বাবু বাইরে বেরিয়ে বড় দারোগাবাবুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিলেন। বড়দারোগাবাবুও তাতে আপত্তি করলে না।

এরপর থেকে সে যে আমাদের কী দিনই কাটতে লাগলো তা আর কী বলবো! বাড়ি যেন তখন শ্মশান হয়ে গেছে। মা না থাকলে কে আর ঘর-দোর দেখবে। বাবুর কন্‌ট্র্যাক্‌টারির কাজ মাথায় উঠলো। বাবুকে দেখতুম আর আমার কষ্ট হতো স্যার।

রাত্তির বেলা একদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে, বাইরে বেরিয়েছি। দেখি বাবু ওই বিরাট বাড়িটার বারান্দায় একলা-একলা পায়চারি করছে।

আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন—কী রে, তুই?

বললাম—আমার ঘুম ভেঙে গেল বাবু—

বাবু বললে—আমারও ঘুম ভেঙে গেল।

আমি বললুম—হঠাৎ মা'র কথা মনে পড়ে গেল আমার—

বাবু বললেন—মা'র কথা আর ভাবিস নি তুই—সংসারে কেউ কারো নয়। সবাই একলা, সবাই যে-যার ভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে—

আমি একটু থেমে বললুম—আচ্ছা বাবু, মা'কে পুলিশ ছাড়ছে না কেন? মা'তো কোন দোষ করে নি?

বাবু বললেন—পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা, তুই শুনিস নি?

আমি বললুম—আজকে বাজার করতে গিয়ে কী শুনলুম, জানেন

বাবু. লোকে বলাবলি করছে মা'কে নিয়ে। বলছে—মা'রই নাকি দোষ। আমি শুনতে পেয়ে খুব গালাগালি দিয়েছি সকলকে। সবাই আমাকে তেড়ে মারতে এসেছিল, শেষকালে একজন এসে থামিয়ে দেয় তবে থামে—

বাবু বললেন—কী বলছিল লোকরা ?

—বলছিল কমল চৌধুরী সাহেবের যে ভাগ্নেটা আছে না, সে নাকি পুলিশকে বলেছে যে মা'ই চৌধুরী সাহেবকে খুন করেছে। তা শুনে আমি রেগে গেলুম। বললুম—মা'র কী দায় পড়েছে চৌধুরী সাহেবকে খুন করবার ?

বাবু বললেন—লোকে সত্যিই বলছিল ওই কথা ?

বললুম—হ্যাঁ, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নি ওদের কথা। তা আমি রেগে যাবো না ? মিথ্যে কথা শুনলে মানুষের রাগ হয় না ?

বাবু বললেন—না, তুই ওসব কথার মধ্যে থাকিস নি। মাথার ওপর যদি ভগবান থাকে তো তোর মা'র কোনও ক্ষতি হবে না।

বাবুর কথা শুনে আমি স্যার সেই দিন থেকেই রোজ ভগবানকে ডাকতুম। বলতুম, হে ভগবান, আমার মা কোন দোষ করে নি। তুমি মা'কে বাঁচিয়ে দাও। আমি তো তখন ছেলেমানুষ ছিলুম স্যার, ভগবানকে বিশ্বাস করতুম। ভাবতুম ভগবান বলে নিশ্চয়ই একজন আছে। তার কাছে কোন জিনিস লুকোন থাকে না। ভগবান সব দেখতে পায়। কেউ তাকে ঠকাতে পারবে না।

তাই যখন দেখতুম বাবু খুব কষ্ট পাচ্ছে মনে তখন প্রাণপণে ভগবানকে ডাকতুম। কিন্তু তখন কি জানতুম আসলে ভগবান বলে কেউই নেই।

বাবু রোজ উকিল-বাড়ি যেতেন। প্রথম প্রথম উকিলবাবু তাঁকে খুব সাহস দিতেন। কিন্তু শেষে একদিন বললেন—কেসটা তেমন কিছু জটিল নয়, আপনি কিছু ভাববেন না মিস্টার বোস—

কিন্তু বাবু আমার বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম—ভয় কেন পেয়েছিল ?

হরিপদ বললে—বাইরে যে তখন অন্য কথা বলাবলি করছিল লোকেরা। কমল চৌধুরীর ভাগ্নে নাকি পুলিশের কাছে জবানবন্দী দিয়েছে যে সে মিসেস বোসকে তার মামাকে খুন করতে দেখেছে।

—সে কী ?

আমিও কথাটা চক্-বাজারে শুনছিলুম ক'দিন ধরে। সবাই বলছিল ঠিকাদার সাহেবের মেমসাহেব নাকি কমল চৌধুরী সাহেবের ওপর এমন রেগে গিয়েছিল যে নিজে বাড়ি থেকে বন্দুক নিয়ে গিয়ে তাকে খুন করেছে।

—কেন? কমল চৌধুরীর ওপর রেগে গিয়েছিল কেন?

কেন যে রেগে গিয়েছিল সেইটের সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত ছিল। কেউ বলছিল, মিসেস বোসের সঙ্গে কমল চৌধুরী লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতো। ঠিকাদার সাহেব তো চিরকাল বাইরে বাইরেই কাটাতো, সুতরাং কমল চৌধুরী সেই সুযোগটাই নিয়েছিল।

শহরময় সোরগোল উঠলো এই খুনের মামলা নিয়ে। জয়পুরের লোকজন, রিক্‌শাওয়ালা থেকে সুরু করে পান-বিড়িওয়ালা পর্যন্ত ওই নিয়ে তখন আলোচনা সুরু করে দিয়েছে।

কেউ বলতো—ঠিকাদার সাহেবের বিবিটাই খারাপ।

আবার কেউ বলতো—না রে, আসলে কমল চৌধুরী লোকটাই আসামী। কথা কাটাকাটিতে যখন বন্দুক দিয়ে ঠিকাদারের বিবিকে ভয় দেখাতে গেছে তখন কী ভাবে গুলিটা নিজের বুকেই গিয়ে লেগেছে। খুন-খারাপি নয়, আসলে এটা একটা এ্যাক্‌সিডেন্ট্।

বাবু একদিন আর থাকতে পারলেন না। যত দিন যেতে লাগলো ততই নিজের স্ত্রীর ওপরই সন্দেহ হতে লাগলো।

আমাকে একদিন বাবু বললেন—ওরে, মঙ্গল সিংকে একবার ডাক তো—

মঙ্গল সিং এমনিতে বাবুর সঙ্গে তেমন বাইরে যেত না। তার তখন বয়েস হয়ে গিয়েছিল খুব। বাবুর সঙ্গে গিয়ে একশো-দু'শো মাইল গাড়ি চালাতে পারতো না আর। কিন্তু বাবু তো আর তা বলে তাকে ছাড়িয়ে দিতে পারে না। তাই মঙ্গল সিং সাধারণত জয়পুরের বাড়িতেই থাকতো। আর মাঝে মাঝে দরকার হলে মা'কে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে আনতো। মা তো আর বেশি বেরোত না। বেরিয়ে যাবেই বা কোথায়? ঘরেই তো অনেক কাজ ছিল মা'র।

মা'র বাগান ছিল। বাগানের গাছে মালি ঠিক ঠিক জল দিচ্ছে কিনা তা দেখতে হতো। তারপর মা'র ছিল পাখির সখ। পাখি পোষার কি কম ঝামেলা! ভোর রাত্রিতে উঠে পাখিদের খেতে দিতে হবে। তাই জেল-হাজতে গিয়েও মা'র ভাবনা ছিল গাছপালা আর

পাখির জন্যে।

আর বিকেল ও সন্ধ্যাবেলাটাই মা'র সময় কাটাতে কষ্ট হতো। তখন আর কোনও কাজ থাকতো না মা'র। তখন খানিকটা ছিল বই পড়া। বাবু মা'র জন্যে কলকাতা থেকে বই কিনে আনিয়ে দিতেন। যত পত্রিকা-টত্রিকা ছাপা হয় কলকাতায় সবগুলোর গ্রাহক করে দিয়েছিলেন বাবু।

কিন্তু বই পড়ে কি আর সময় কাটে সকলের? বাড়ি থেকে বেরোতেও তো ইচ্ছে করে মানুষের!

তখন মঙ্গল সিং-এর ডাক পড়তো। মঙ্গল সিং শেষ বয়সে একটু একটু আফিম্ খাওয়া ধরেছিল। বিকেল হলেই ঝিমোত। তা কাজ না থাকলে মানুষ কী করবে?

তখন মঙ্গল সিং মা'কে নিয়ে চক্-বাজারে কেনা-কাটা করতে যেত। কেনা-কাটারও তখন কিছু থাকতো না মা'র। বাবু সবই কিনে-টিনে দিয়ে যেত মা'কে। আসলে কেনা-কাটা মানে একটুখানি ঘুরে মানুষের মুখ দেখা।

মা কখনও কখনও সিনেমায় যেত অবশ্য। কিন্তু জয়পুরের চক্-বাজার তো আপনি দেখেন নি। সে বড় বেয়াড়া জায়গা স্যার। ভদ্রলোকের আরাম করে বসে দেখার জন্য সিনেমা-হাউস ছিল না সেখানে। হাউসের বাইরে কেবল পান-বিড়িওয়ালা, রিক্শাওয়ালাদের ভিড। আর যত সব কেবল বোম্বাই-মার্কা হিন্দী ছবি। হিন্দী ছবি তো স্যার ভদ্র মেয়েছেলেদের দেখার মত নয়।

তা সময় কাটাবার কথা ভাবলে কি আর ভালো-খারাপ বিচার করলে চলে?

তাই মাঝে মাঝে মা সিনেমাতেও যেত। আবার কখনও যেত শাড়ি-গয়নার দোকানে, কখনও গানের রেকর্ডের দোকানে। মঙ্গল জানতো কোথায় কোথায় মা যায়, কবে কোথায় মা গেল।

তা মঙ্গল সিং আসতেই বাবু জিজ্ঞেস করলেন—মঙ্গল তুমি মা'কে নিয়ে সেদিন কোথায় গিয়েছিলে?

মঙ্গলকে ক'দিন ধরেই এসব প্রশ্ন করছে সবাই। পুলিশও তার জবানবন্দী নিয়েছে।

কিন্তু আফিম্খোর মানুষ, যা বলে তাও মনে রাখতে পারে না, যা মনে জানে তাও ভালো করে গুছিয়ে বলতে পারে না।

বললে—হ্যাঁ বাবু, আমি তো মা'কে নিয়ে গিয়েছিলুম—

—কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে?

মঙ্গল সিং বললে—চৌধুরী সাহেবের দোকানে।

—তা সেখানে যখন গিয়েছিলে তখন কী মা'র হাতে আমার বন্দুকটা ছিল?

মঙ্গল সিং খানিকক্ষণ ভাবতে লাগলো; মনে করতে চেষ্টা করলো। তারপর বললে—আজ্ঞে না—

বাবুর কেমন সন্দেহ হলো। বললেন—তোমার ঠিক মনে আছে মা'র সঙ্গে বন্দুক ছিল না?

মঙ্গল সিং একটু ঘাবড়ে গেল। বললে—আজ্ঞে আমার ঠিক মনে পড়ছে না, আমি তো পেছনের দিকে চেয়ে দেখি নি, সামনের দিকে চেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলুম—

বাবু বললেন—পুলিশকে তুমি কী বলেছ? পুলিশ তো তোমার জবানবন্দী নিয়েছে, জবানবন্দীতে তুমি কি বলেছ যে মা'র সঙ্গে বন্দুক ছিল না?

মঙ্গল সিং আরো ঘাবড়ে গেল। একটু ভেবে নিয়ে বললে—আজ্ঞে আমি ঠিক মনে করতে পারছি না, আমি কি বলেছি—

বাবু রেগে গেলেন। বললেন—যাও, তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না, তুমি যাও—

মঙ্গল সিং বাবুর তাড়া খেয়ে চলে গেল। কিন্তু সেই দিন থেকে বাবুর মেজাজও কেমন কড়া হয়ে উঠতে লাগলো। যে-লোক দিনের-পর-দিন বছরের-পর-বছর নিজের বাড়ির দিকে তাকায় নি, শুধু কাজের মধ্যে ডুবে থেকেছে, সেই লোক কাজ ছাড়া হয়ে তখন একেবারে ছটফট করতে লাগলো।

আমি পাশে-পাশে থাকবার চেষ্টা করি সব সময়। বরাবরই পাশে পাশে থেকেছি। সুখের সময়ে ছিলুম বলে কি দুঃখের সময় পাশ ছেড়ে চলে আসবো?

দেখতুম বাবু একবার যাচ্ছেন ভরদ্বাজ সাহেবের বাড়ি, আর একবার যাচ্ছেন থানায়। আবার গিয়ে মা'র সঙ্গে দেখা করে আসতেন।

মা বলতেন—কবে ছাড়া পাবো?

বাবু বলতেন—আর বেশি দেরি নেই, আর একটু কষ্ট করো—

মা বলতো—আমার নতুন পোঁতা গাছগুলোতে জল দেওয়া হচ্ছে তো ঠিক ?

আমি বলতুম—হ্যাঁ ঠিক দেওয়া হচ্ছে, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জল দেওয়াচ্ছি, আপনি কিছু ভাববেন না মা—

—আর পাখিদের খেতে দিচ্ছিস তো ঠিক ?

মা বলতো—আমি যদি গিয়ে দেখি সব গোলমাল হয়ে গেছে তো দেখবি তোর সব মাইনে কেটে নেব আমি—

যতক্ষণ থাকতুম মা'র কাছে ততক্ষণই মা কেবল বাড়ির কথা বলতো। মা জানতো খুব শিগগিরই বাড়িতে চলে আসবে। মা বাড়িতে না থাকলে যে সংসারের সব কিছু তছনছ হয়ে যাবে তা মা জানতো। তাই কেবল বার বার বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করতো।

তারপর যখন মেয়াদ ফুরিয়ে যেত তখন আমাদের আবার বাইরে চলে আসতে হতো। বাবুর মুখ আবার গম্ভীর হয়ে উঠতো।

এমনি করেই আমাদের দিনগুলো কাটছিলো।

সেদিন দেখলুম ভরদ্বাজ সাহেবের মুখ বেশ গম্ভীর গম্ভীর।

বাবু যেতেই ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—কমল চৌধুরীর ভাগ্নে খুব খারাপ স্টেটমেণ্ট দিয়েছে মিস্টার বোস।

বাবু চম্‌কে উঠলেন—কী স্টেটমেণ্ট দিয়েছে ?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—সে বলেছে যে সে নিজে সব ব্যাপারটা দেখেছে—

বাবু বললেন—দেখেছে মানে ? আমাকে মিসেস বোস বলেছে, তখন বাড়িতে কেউই ছিল না—

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—চৌধুরীর ভাগ্নে বোধ হয় তখন ভেতরে ছিল, মিসেস বোস তাকে দেখতে পান নি—

বাবু চিৎকার করে উঠলেন। বললেন—বাজে কথা। মিসেস বোস কখনও মিথ্যে কথা বলতে পারে না—

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—আমি তা জানি, কিন্তু পুলিশের ব্যাপার তো, পুলিশ-কেসে নানা-রকম ফ্যাকড়া ওঠে, এ-সব আমার জানা আছে। তবু আপনাকে জানানো দরকার বলে জানিয়ে রাখছি—

বাবু জিজ্ঞেস করলেন—ওর ভাগ্নের নাম কী ?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—জান্‌কীপ্রসাদ—

জানকীপ্রসাদের নাম আমিও শুনি নি, বাবুও শোনেন নি।

বাবু জিজ্ঞেস করলেন—ভাগ্নেটা কী করে?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—কী আবার করবে? শুনেছি সে তো একটা লোফার। কোনও কাজ-কম্ম নেই তার। ওই মামার কাছে থাকে, ভাত রাঁধে আর মামার পয়সায় সিনেমা দেখে বেড়ায়—আর মামা মারা গেলে ওই জানকীপ্রসাদই দোকানের মালিক হবে। কমল চৌধুরীর তো আর কেউ নেই, মা-বাবা ভাই-বোন কেউই নেই কমল চৌধুরীর, ওই বাপ-মা মরা ভাগ্নেটা তাই মামার কাছে পড়ে থাকে—

বাবু জিজ্ঞেস করলেন—তা সেই জান্‌কীপ্রসাদ কী স্টেটমেণ্ট দিয়েছে?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—সে নাকি বলেছে যে মিসেস বোসকে সে তার মামাকে খুন করতে দেখেছে—

বাবু বললেন—শুধু দেখলেই তো চলবে না, প্রমাণ দিতে পারবে সে? সাক্ষী আছে তার কেউ?

ভরদ্বাজ বললেন—সে তো বলছে সে প্রমাণ দেখাবে।

কী প্রমাণ? আমার বন্দুকটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ আছে। আমি বরাবর বাইরে যাবার সময় বন্দুকটা আমার সঙ্গে থাকতো, আমি ক'মাস বন্দুকটা নিয়ে যাচ্ছিলুম না। সবাই তো দেখেছে আমার সময় ছিল না বলে আমি মিসেস বোসকে বলেছিলুম বন্দুকটা দোকান থেকে সারিয়ে এনে রাখতে। আমি মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরি, আমার বন্দুক না হলে একদিনও চলে না। তা কমল চৌধুরী বলেছিল সে বন্দুকটা নিজেই সারিয়ে দেবে। সারাতে গিয়ে কী ভাবে ভেতর থেকে গুলি বেরিয়ে বুকে লেগে গেছে। ভেতরে যে গুলি ছিল তা আমার মিসেস কিন্তু জানতো না, কমল চৌধুরীও জানতো না। এইটেই তো আসল ঘটনা। এ্যাকসিডেণ্ট। আর সেই লোফার বলতে চায় কিনা এটা খুন।

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—তাকে যা ইচ্ছা বলতে দিন না, আমি তো আছি। আর জজ তো আর ঘুষ খায় না। তা একটি কথা, আপনি যেন আবার মিসেস বোসকে এ-সব কথা বলতে যাবেন না, তিনি মিছিমিছি নার্ভাস হয়ে পড়বেন—

বাবু বললেন—না, আমি বলবো না, কিন্তু আমি ভাবছি কমল চৌধুরীর ভাগ্নেটা এত বড় স্কাউন্‌ড্রেল।

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—আপনি মাথা গরম করছেন কেন মিস্টার বোস, মিসেস বোস যে ইনোসেন্ট তা সবাই জানে। মিসেস বোস যে কমল চৌধুরীকে মার্ডার করতে পারেন না এ সহরের সব্বাই বলছে—

বাবু বললেন—কিন্তু জানকীপ্রসাদ যদি কোনও প্রমাণ দিতে পারে?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—বাজে প্রমাণ সবাই দিতে পারে। কিন্তু জাজরা তো আর ঘাস খায় না। টাকার জন্যে মানুষ সব করতে পারে, জানেন? আসলে ওই ছোকরাটা একটা লোফার—

বাবু বললেন—কীসে জানলেন লোফার?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—লোফার নয় তো কী? এতদিন মামার ঘাড়ে বসে কেবল খেত, আর ফুর্তি করে বেড়াতো। এবার মামার সম্পত্তি পেয়ে গেল। এখন কিছু দাঁও মারতে চাইছে—

—দাঁও মারতে চাইছে? তার মানে?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—তার মানে ও জানে আপনি বড়লোক, সেই হিসেবে ভাবছে যদি ভয় দেখিয়ে আপনার কাছ থেকে কিছু মোটা রকমের টাকা আদায় করতে পারে—

বাবু চমকে উঠলেন—আমার কাছে টাকা আদায় করবে? আমি টাকা দেব কেন?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—ইজ্জতের ভয়ে। আপনার স্ত্রী খুনের চার্জে হাজত-ঘরে আছে এইটেই তো যথেষ্ট ইজ্জত হানি। তার ওপর হয়রানি আছে, আর আছে অর্থ ব্যয়—

বাবু কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—আচ্ছা সেই জানকীপ্রসাদকে একবার আপনার কাছে ডাকতে পারেন না?

ভরদ্বাজ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—কেন? তাকে ডেকে কী করবো?

—তাকে ডেকে একবার জিজ্ঞেস করবেন যে সে পুলিশের কাছে কী জবানবন্দ দিয়েছে?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—কী জবানবন্দী দিয়েছে তা তো জেরার সময়েই বেরিয়ে পড়বে। আগে জেনে কী হবে?

—আগে জানতে পারলে একটা দুর্ভাবনা চুকতো। যা শুনছি তা তো সত্যিও হতে পারে।

ভরদ্বাজ সাহেব তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন—আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন মিস্টার বোস? কী করে ওর কথা সত্যি হবে? আমি প্রমাণ করে দেব ঘটনার সময় ও বাড়িতে ছিল না—

—কী করে প্রমাণ করবেন?

—সে সাক্ষী আছে আমার কাছে। সে হলফ করে বলবে যে ঘটনার সময়ে সে সহরে সিনেমার হাউসে তাকে দেখেছে।

—সে রকম সাক্ষী আছে?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—আছে বৈকি। না থাকলে কি আমি এত জোর করে বলছি?

—তা সে সাক্ষীকে একবার আমার সামনে ডেকে আনতে পারেন?

—তাকে এখানে ডেকে এনে কী করবো?

বাবু বললেন—তবু আমি একটু নিশ্চিত হতে পারতুম। ভাবনাতে ক' দিন ধরে আমার ঘুম হচ্ছে না মিস্টার ভরদ্বাজ, আর কতদিন আমি না-ঘুমিয়ে কাটাবো? আর মিসেস বোসই বা কতদিন হাজত-খানায় থাকবে? বাড়ি আসবার জন্যে ও ছটফট করছে।

মিস্টার ভরদ্বাজ বললেন—আর একটু ধৈর্য ধরতে বলুন, পুলিশের ইন্‌ভেস্টিগেসন শেষ হলেই কেস সুরু হয়ে যাবে।

বাবু বললেন—কিন্তু আপনি একবার চেষ্টা করুন আপনার সাক্ষীকে ডাকবার। আমি না-হয় কিছু টাকা রেখে যাচ্ছি আপনার কাছে।

বলে পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করলেন। বললেন—এই চারশো টাকা রইল আপনার কাছে, পরে যা লাগে আমি আবার দেব, আপনি তাকে ডেকে আর একবার কথা বলুন—

বলে আমরা চলে এলুম।

পরের দিনই হঠাৎ ভরদ্বাজ সাহেবের কাছ থেকে ডাক এল। বাবু আর আমি আবার গেলাম।

গিয়ে দেখি ভরদ্বাজ সাহেবের ঘরে একটা ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যেতেই ছেলেটা দাঁড়িয়ে উঠলো।

ভরদ্বাজ সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বললেন—এই হচ্ছে সেই সাক্ষী। এর নাম কান্‌হাইয়া।

বাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কোথায় থাকো? কী করো?

কান্‌হাইয়া বললে—আমি কিছু করি না।

—কোথায় থাকো?

—দাসপাড়ায়।

—কিছু করো না, তোমার চলে কী করে?

ছোকরাটা প্রথমে কিছু বলতে চাইছিল না। বোধহয় লজ্জা করছিল বলতে। এ রকম চেহারার ছেলে জয়পুরে তখন ছড়াছড়ি। রাস্তায়-ঘাটে তখন ওরা সব জায়গায় আড্ডা দিয়ে বেড়ায়।

দেখে কেমন সন্দেহ হতে লাগলো আমাদের। এই ধরনের ছোকরাদের স্বভাব-চরিত্র জানা আছে।

এরা টাকা পেলে সব কিছু করতে পারে।

বাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—কই, তুমি কী করো বললে না?

কান্‌হাইয়া বললে—আমি সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করি।

বোঝা গেল ছোকরা বেকার।

বাবু বললেন—তুমি কি জানকী প্রসাদকে জানো?

—খুব জানি। সে আমার ফ্রেণ্ড। আমরা একসঙ্গে আড্ডা দিই।

—তা যেদিন কমল চৌধুরী সাহেব খুন হয় তখন তুমি কোথায় ছিলে?

কান্‌হাইয়া বললে—আমি তখন সিনেমা-হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে জানকীপ্রসাদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ খবর এল চৌধুরী সাহেব খুন হয়েছে। লোকেরা দৌড়তে লাগলো চৌধুরী সাহেবের দোকানের দিকে। জানকীপ্রসাদ দৌড়ুলো, আমিও দৌড়লাম তার সঙ্গে। দৌড়তে দৌড়তে যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছুলুম তখন দেখি জায়গাটা ভিড়ে ভিড় হয়ে গেছে। জানকীপ্রসাদ তাড়াতাড়ি গিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। আমিও তার পেছন-পেছন গেলাম। গিয়ে দেখি জানকীপ্রসাদের মামা মেঝের ওপর পড়ে আছে আর তার গা দিয়ে ঝর-ঝর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। খানিক পরে পুলিশ এসে গেল। তারা জায়গাটাকে ঘিরে ফেললে। কাউকে কাছে যেতে দিলে না।

বাবু জিজ্ঞেস করলেন—তারপর?

—তারপর পুলিশের বড়-দারোগা সাহেব জানকীপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলে সে কিছু জানে কিনা। জানকীপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে ডাহা মিছে কথা বললে—

—কী বললে?

—জানকীপ্রসাদ বললে—হ্যাঁ হুজুর আমি বাড়ির ভেতরেই ছিলুম,

আমি সব দেখেছি। বোস-মেমসাহেবকে বন্দুকটা নিয়ে আমি দোকানে ঢুকতে দেখেছিলুম। আমি দেখলুম দু'জনে কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হচ্ছে—

—কী নিয়ে কথা-কাটাকাটি হচ্ছে? পুলিশের লোক জিজ্ঞেস করলে।

জানকীপ্রসাদ বললে—তা আমি শুনি নি হুজুর। আমি তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলুম। কাজ করতে করতে হঠাৎ বন্দুকের শব্দে চমকে উঠে দৌড়ে বাইরে গিয়ে দেখি মামা রক্তে ভাসছে আর বোস মেমসাহেব বন্দুকটা ফেলে বাইরের দিকে দৌড়ে গিয়ে নিজের গাড়িতে উঠছে—

পুলিশ তারপর জিজ্ঞেস করলে—তুমি তারপর কী করলে?

জানকীপ্রসাদ বললে—আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, আমি বোস-মেমসাহেবের গাড়ির পেছন-পেছন দৌড়্লুম, কিন্তু মোটর গাড়ির সঙ্গে দৌড়ে পারবো কেন? আমি ফিরে এলুম, কিন্তু ততক্ষণে আমার চেঁচানি শুনে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল, আর তারপরেই খবর পেয়ে আপনারা এসে গেলেন।

অতক্ষণ কথা বলে জানকীপ্রসাদ হাঁপিয়ে উঠলো।

পুলিশ আবার জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা মিসেস বোস তোমার মামাকে কেন খুন করতে গেলেন? তোমার কী সন্দেহ হয়?

জানকীপ্রসাদ বললে—আমার সন্দেহ হয় বোস-মেমসাহেবের রাগ ছিল মামার ওপর?

পুলিশ জিজ্ঞেস করলে—কেন রাগ থাকবার কারণ কী?

জানকীপ্রসাদ বললে—রাগ থাকবার কারণ আমার মামা বোস-মেমসাহেবের কথা শুনতো না।

—কী কথা?

—বোস-মেমসাহেব চাইতো মামা তার বাড়িতে গিয়ে রাত কাটাক। বোস-সাহেব তো ঠিকেদার মানুষ, রাত্তিরে বাড়ি থাকতো না, তাই। কিন্তু আমার মামা খুব ভালো মানুষ। মামা অনেকদিন কথা দিয়ে কথা রাখে নি তাই বোস-মেমসাহেবের খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। কথা কাটাকাটির সময় মামা কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেলেছিল তাইতে বোস-মেমসাহেব আর রাগ সামলাতে পারে নি, একেবারে মামাকে বন্দুক দিয়ে গুলি করে মেরেছে।

পুলিশ জিজ্ঞেস করলে—তা তোমার মামার সঙ্গে যে বোস-মেমসাহেবের খুব ভাল সম্পর্ক ছিল তার কোনও প্রমাণ আছে তোমার কাছে ?

জানকীপ্রসাদ বললে—হ্যাঁ, হুজুর প্রমাণ আছে।

—কী প্রমাণ ? প্রমাণটা দেখাতে পারো ?

জানকীপ্রসাদ বললে—পারি।

—তা দেখাও ?

জানকীপ্রসাদ বললে—এখন প্রমাণটা দেখাতে পারবো না হুজুর, খুঁজতে হবে।

কান্‌হাইয়া এতক্ষণ ধরে সব গল্পটা বলছিল। বাবু মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন।

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—তা তুমি তো সব জানো কান্‌হাইয়া, তুমি তো সব জানো জানকীপ্রসাদ মিথ্যে কথা বলেছে, তুমি এ-সব কথা সাক্ষী হয়ে কোর্টে গিয়ে বলতে পারবে ? বলতে পারবে যে খুনের সময় তুমি আর জানকীপ্রসাদ সিনেমা হাউসের সামনে আড্ডা দিচ্ছিলে ?

কান্‌হাইয়া বললে—তা বলবো হুজুর, কিন্তু জানকীপ্রসাদের কাছে একটা প্রমাণ আছে হুজুর, সেটা সে পুলিশকে দিয়েছে।

—কী প্রমাণ ?

কান্‌হাইয়া বললে—একটা ছবি।

বাবু বললেন—ছবি ? কীসের ছবি ? কার ছবি ?

কান্‌হাইয়া বললে—জানকীপ্রসাদের মামা আর বোস-মেমসাহেবের একটা জোড়া ছবি—

—জোড়া ছবি মানে ?

কান্‌হাইয়া বললে—দু'জনে মুখোমুখি বসে আছে, এইরকম একটা ছবি, তার মামার বাক্স-প্যাঁটরার মধ্যে পাওয়া গেছে, সেইটে জানকীপ্রসাদ পুলিশকে দিয়েছে—

কথাটা শুনে ভরদ্বাজ সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, বাবুও কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন। আমিও কেমন ভয় পেয়ে গেলুম। ও-রকম ছবি যদি জানকীপ্রসাদ পুলিশকে দিয়ে থাকে তবে তো প্রমাণ হয়ে যাবে যে মা'র সঙ্গে কমল চৌধুরীর ভেতরে ভেতরে

একটা সম্পর্ক ছিল। তাহলে কী হবে? সে-ছবি কবে তোলা হয়েছিল মা? সে-ছবি চৌধুরী সাহেবের বাক্স-প্যাটরার মধ্যে কী করে পাওয়া গেল? আমরা তো এসব খবর কিছুই জানতুম না—

ভরদ্বাজ সাহেব কান্‌হাইয়াকে বললেন—তুমি এখন যাও কান্‌হাইয়া, কোর্টে যখন মামলা উঠবে তখন তোমাকে সাক্ষী হবার জন্যে ডাকবো। এখন যাও তুমি—

কান্‌হাইয়া চলে যাচ্ছিল। বাবু আবার তাকে ডাকলেন। বললেন—শোন—

কান্‌হাইয়া আসতেই বাবু নিজের পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে তার হাতে দিলেন। বললেন—এইটে তোমার কাছে রাখো—মিষ্টি খেও—

টাকাটা পেয়ে কান্‌হাইয়া খুশী হয়ে সেলাম করে চলে গেল।

বাবু ভরদ্বাজ সাহেবের দিকে চেয়ে বললেন—এখন কী হবে মিস্টার ভরদ্বাজ?

ভরদ্বাজ সাহেব এ-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—মিসেস বোসের সঙ্গে কমল চৌধুরীর কি খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল?

বাবু বললেন—তা তো আমি বলতে পারবো না। কারণ আমি তো আমার নিজের কন্‌ট্রাকটারি কাজ নিয়েই দিন-রাত মেতে থাকতুম, আর্দ্ধেক দিন বাড়িতে আসতেই পারতুম না। যদি সত্যিই প্রমাণ হয়ে যায় যে মিসেস বোসের সঙ্গে চৌধুরীর খুব যাতায়াত মেলা-মেশা ছিল তাহলে কী হবে?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—তাহলে কেসটা জটিল হয়ে যাবে—

—জটিল হয়ে যাবে মানে?

—মানে যত সহজে মিসেস বোস ছাড়া পেতেন তত সহজে ছাড়া পাবেন না।

বাবু ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন—মিসেস বোস ছাড়া পাবে না? কন্‌ভিক্‌শন্ হয়ে যাবে?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—তা ঠিক করে এখন বলতে পারছি না। এ-ব্যাপারে কিছু বলতে গেলে মিসেস বোসের সঙ্গে আমাকে আরো কথা বলতে হবে। দেখি মিসেস বোস এ-ব্যাপারে কী বলেন।

বাবু বললেন—কিন্তু যদি শোনেন যে খুব মেলা-মেশা ছিল?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—শুনতে হবে কী রকম মেলা-মেশা ছিল, কতখানি ঘনিষ্ঠতা ছিল। দু'জনের মধ্যে রেগুলার যাতায়াত ছিল কিনা। সকলের চোখের আড়ালে মিশতেন কিনা। আপনি তো আমাকে এ-সব কথা বলেন নি আগে। আগে জানতে পারলে আমি তো সে ব্যাপারে তখনই মিসেস বোসকে সব জিজ্ঞেস করে রাখতুম—

বাবু বললেন—কিন্তু আমি তো বলেছি আপনাকে, আমি এ-সব দিকে নজর দেবার সময়ই পেতুম না, আমার ছিল কেবল কাজ আর কাজ, আমার চারটে ব্রিজ, তিনটে টানেল তৈরি করা চলছে, আমি বাড়ির দিকে দেখবার কখন সময় পেতুম, বলুন?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—তা কাজ কি শুধু আপনি একলাই করেন? আর কেউ করে না?

বাবু বললেন—তা আমার মত কাজ আর কেউ করে? বাড়ি ছেড়ে বনে-জঙ্গলে আমার মত আর কাউকে ঘুরতে হয় বছরের পর বছর?

—তা আপনি অত কাজ করেন কেন? অত টাকা নিয়েই বা আপনার কী হবে? আপনারা তো দু'জন প্রাণী! বাড়ি আগে না আপনার কাজ আগে? আমরাও তো কাজ করি, তা বলে আমরা ঘরের ভেতরে কী হচ্ছে খবর রাখি না?

এ-কথার উত্তরে বাবু আর কিছুই বললেন না। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল স্যার আমার। আপনি বুঝতে পারবেন না বাবু আর মাকে আমি কত ভালবাসতুম। আমার নিজের বাবা-মা ছিল না বলে আমি বাবু আর মাকেই আমার নিজের বাপ-মা'র মত দেখতুম। আমার তখন কান্না পেয়ে গেছে স্যার। আপনাকে কী বলবো স্যার, আমি ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলুম। তবে কি খুনের দায়ে মা'র ফাঁসি হয়ে যাবে?

যাক, সেদিনটা তো কোনও রকমে কাটলো। পরের দিন সকাল বেলাই আমরা জেল-খানার হাজতে গিয়ে মা'র সঙ্গে দেখা করলুম।

মা হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল।

বললে—কী রে, তুই অত কাঁদছিস কেন?

কথাটা শুনে আমার কান্নায় চোখ ফেটে আরো জল বেরোতে লাগলো।

মা বললে—ও কাঁদছে কেন?

বাবু এতক্ষণ কোনও কথা বলেন নি। এবার বললেন—ওর কাঁদাটাই বুঝি দোষের হলো আর তুমি যখন দোষ করলে তখন তো আমাদের কথা তোমার মনে ছিল না—

মা থমকে গম্ভীর হয়ে গেল বাবুর কথা শুনে।

বললে—আমি দোষ করেছি?

—হ্যাঁ, তুমি দোষ না করলে আজ তোমাকে এই জেল-হাজতে পচতে হয়? আর তোমার জন্যে আমাদেরও এই হয়রানি হয়? আমার কত টাকার লোকশান হয়েছে এতদিনে তা জানো?

মা চুপ করে গেল বাবুর কথা শুনে।

তারপর বললে—হঠাৎ তুমি আমাকে এ-সব কথা শোনাচ্ছ কেন?

বাবু বললেন—বলছি তার কারণ তুমি। তুমিই আমাকে বুঝিয়েছ তোমার কোনও দোষ নেই, তুমি নির্দোষ। কিন্তু মিস্টার ভরদ্বাজ যখন তোমায় সব জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন তুমি তো কিছুই বলো নি—

মা বললে—সত্যি করে বলো তো কী হয়েছে? তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!

বাবু বললেন—মিস্টার ভরদ্বাজ তোমার কাছে আসবেন, তাঁর কাছেই সব শুনতে পাবে—

মা বললে—তা তুমিই বলো না তাঁর কথাগুলো। তোমার মুখ থেকেই না হয় শুনি—

বাবু বললেন—কমল চৌধুরীর সঙ্গে একসঙ্গে ছবি তুলিয়েছ তা তো কাউকেই বলো নি, তোমার সঙ্গে কমল চৌধুরীর কীসের এত ঘনিষ্ঠতা যে একসঙ্গে তুমি ফোটো তোলালে!

—আমি ছবি তুলিয়েছি কমল চৌধুরীর সঙ্গে?

মা যেন আকাশ থেকে পড়লো।

বাবু বললেন—নিশ্চয় তুলিয়েছ। নইলে তোমাদের দু'জনের একসঙ্গে তোলা ছবি পুলিশের হাতে গেল কী করে?

মা রেগে উঠলো। বললে—তুমি এসব কী বলছো?

বাবু বললেন—যা বলছি তা ঠিকই বলছি, কোর্টে যখন মামলা উঠবে তখনই দেখতে পাবে।

মা বললে—কিন্তু যা-তা একটা প্রমাণ দিলেই হলো? একটা মিথ্যে প্রমাণ দিলেই সেটা সত্যি বলে বিশ্বাস করতে হবে?

বাবু বললেন—বিশ্বাস অবিশ্বাস পরের কথা, ক্যামেরা তো মিথ্যে কথা বলে না। সেই ক্যামেরাতে যখন তোমাদের দু'জনের ছবি তোলা হয়েছে তখন তার পেছনে নিশ্চয়ই কোনও সত্যি আছে।

সেদিন সেই হাজতখানার ভেতরে বাবু আর মা'তে দু'জনে যে-কথা কাটাকাটি হলো তা আগে আর কখনও হয় নি। বাবু আর মা ভুলেই গেল যে আমি সেখানে হাজির রয়েছি। আমার সামনেই দু'জনে দু'জনকে দোষ দিতে লাগলো। আমার মনে হতে লাগলো যে মাটিটা দু' ফাঁক হয়ে যাক আর আমি তার মধ্যে ঢুকে গিয়ে লজ্জায় মুখ ঢাকি। কিন্তু সে যে কী ঝগড়া তা আপনাকে কী বলে বোঝাবো স্যার আমি আজ বুঝতে পারছি না। একবার মা একটা কথা বলে তো বাবু তার জবাবে দশটা কথা শুনিয়ে দেয়। বাবু যে মার সঙ্গে অত ঝগড়া করতে পারে তা আমার কল্পনাতেও ছিল না। কিন্তু আমি কাকে দোষ দেব? বাবুর কি তখন মাথার ঠিক ছিল? ক'দিন ধরে বাবুর যে হেনস্থা চলছিল আমি অন্ততঃ সেদিন তার সাক্ষী ছিলুম। মা'র জন্যে ভেবে ভেবে রাত্তিরে বাবুর ঘুমই হতো না। এক-একদিন দেখেছি সারা রাত জেগে জেগে বাবু বারান্দায় পায়চারি করছেন। সে যে কী যন্ত্রণা তা আর কেউ না বুঝুক আমি তো বুঝতে পারতুম।

বাবু তখন আর নিজেকে সামলাতে পারছেন না। বললেন—তোমার জন্যে আমার কী সর্বনাশ হয়েছে তা তো তুমি বুঝতে পারছো না। আমার টাকা তো গেছেই তার ওপর আমার সম্মানটাও তুমি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছ। আমার অবস্থা এখন কী শোচনীয় হয়েছে তা যদি তুমি একবারও বুঝতে—

মা বললে—তুমি তোমার নিজের অবস্থাটার কথাই ভাবছো। আর আমার অবস্থাটার কথা একবার ভাবো—

বাবু বললেন—তা তোমার এই অবস্থার জন্যে কি আমি দায়ী?

—তুমি যদি দায়ী না-ই হও তো আমিই কী দায়ী?

বাবু বললেন—তোমারই যদি কোনও দায়িত্ব না থাকে এ-ব্যাপারে তো কে দায়ী তুমিই বলো?

মা এ-অভিযোগের জবাবে হঠাৎ কিছু বলতে পারলে না। তারপর বললে—তুমি কি তাহলে আমাকেই সন্দেহ করো?

বাবু বললেন—সন্দেহ করবার সুযোগ তো তুমিই করে দিয়েছ।

নইলে এতদিন তো তোমাকে আমি বিশ্বাসই করে এসেছি। তোমাকে বিশ্বাস করে আমি তো নিশ্চিন্ত হয়ে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে কেবল ভবিষ্যতের সংস্থানই করে যাচ্ছিলুম, যাতে জীবনে কোনও দিন তুমি আমি কোনও আর্থিক দুর্দশায় না পড়ি। কিন্তু আজ তুমি আমার এ-বিশ্বাসের মর্যাদা ভালো করেই রাখলে বটে। আমার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব ধুলোয় মিশিয়ে দিলে, ছিঃ—

মা বললে—তা হলে আমাকে বিয়ে করা তোমার ভুল হয়েছিল বলো ?

বাবু বললেন—তোমাকে বিয়ে করা শুধু ভুলই নয়, জীবনে এক মস্ত অপরাধও হয়েছিল আমার—

মা বললে—এই কথাটা তোমার মুখ থেকে একদিন শুনতে হবে, এ আমি সন্দেহ করেছিলুম।

বাবু বললেন—আর সেই জন্যেই বুঝি কমল চৌধুরীর সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে মেলামেশা করতে তোমার বাধে নি !

মাও তেমনি বাবুর রাগের কথায় কোথায় ঠাণ্ডা হবে, তা নয়, মা যেন আরো রেগে উঠলো। গলা আরো বাড়িয়ে বললে—চুপ করো, তোমার লজ্জা করে না নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে এই অপবাদ দিতে ?

বাবু বললেন—লজ্জা আমার করবে কেন ? লুকিয়ে লুকিয়ে পাপ করবে তুমি আর ধরা পড়ে গেলে লজ্জায় পড়বো আমি ? তুমি কি মনে করো এখনও লজ্জার কিছু বাকি আছে তোমার ? সারা সহরের লোকের মুখে-মুখে আজ যে নির্লজ্জ আলোচনা চলছে তা তো তোমার কানে যায় না তাই তুমি আমাকে চুপ করতে বলছো। আমি চুপ করলেই কি তারা চুপ করবে ? তাদের তুমি চুপ করাতে পারবে ?

মা বললে—তারা যা ইচ্ছে বলুক, তারা বাইরের লোক, তারা কী বললে না-বললে তাতে আমার কিছু এসে যায় না, কিন্তু তুমি ? তুমি কেন বলবে ?

বাবু বললেন—আমি বলছি আমার নিজের দায়ে। আমি সহরের একজন গণ্য-মান্য লোক, গভরমেণ্টের অফিসারদের সঙ্গে আমাকে মেলা-মেশা করতে হয়, তাদের কাছে আমি এখন থেকে মুখ দেখাবো কেমন করে, সেই ভাবনাতেই আমাকে বলতে হয়।

মা বললে—ও, বুঝেছি, তাহলে দরদটা আমার জন্যে নয়, দরদটা

তোমার নিজের সুনামের জন্যে। তোমার সুনামে দাগ লেগেছে তাই তোমার এত দুর্ভাবনা। তাহলে তোমার যে রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না সে আমার কষ্টের কথা ভেবে নয়, ঘুম হচ্ছে না তোমার নিজের সুনাম-হানির ভয়ে। তাহলে শোন, আমিও আজ তোমাকে খুলেই বলি আমি যা করেছি তা অনেক ভেবে-চিন্তেই করেছি।

মা'র কথাটা শুনে আমিও স্তম্ভিত, বাবুও স্তম্ভিত। খানিকক্ষণ আমাদের কারো মুখেই কোনো কথা বেরোল না। মা কি তাহলে সত্যিই খুন করেছে কমল চৌধুরীকে? মা'র কি তাহলে ফাঁসি হয়ে যাবে? মা যদি কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এই কথা বলে তাহলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বাবু বললেন—তুমিই তাহলে কমল চৌধুরীকে খুন করেছ?

মা বললে—হ্যাঁ, আমিই খুন করেছি কমল চৌধুরীকে।

বাবু বললেন—তাহলে যে সেদিন বলেছিলে বন্দুকটা সারাতে গিয়ে অসাবধানে গুলি ছিটকে গিয়ে কমল চৌধুরীর বুকে লেগেছে?

মা তখন যেন পাথর হয়ে গেছে। বললে—তখন আমি সব মিথ্যে কথা বলেছিলুম।

—কেন, মিথ্যে কথা বলতে গিয়েছিলে কেন?

মা বললে—তখন আমি জানতুম না যে আমাদের লুকিয়ে লুকিয়ে মেলামেশার খবর এমন করে সবাই জানতে পেরেছে।

বাবু বললেন—তাহলে এখন সহরের লোকে যা-কিছু বলাবলি করছে সব সত্যি?

মা বললে—হ্যাঁ, সব সত্যি। এক বর্ণও মিথ্যে নয়, আমি আর বাড়িতে একলা থাকতে পারছিলুম না। গাছ-বাগান পাখি সংসার আমার কাছে সব কিছু বোঝার মত ভারি হয়ে উঠেছিল। করবার মত আমার আর কিছু ছিল না। তখন আমার সামনে এমন একজন ছিল যে আমি ডাকলেই আমার কাছে আসতো, তাকে যা বলতুম তাই-ই সে করতো, আমার কোনও উপকার করতে পারলে যে নিজে কৃতার্থ হয়ে যেতো—

বাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মার কথা শুনে। বললেন—তা বলে তার জন্যে তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করলে?

—তুমি? তুমি তখন কোথায়? তোমার সঙ্গে যে বিশ্বাস-ঘাতকতা করবো তার জন্যেও তো তোমার কাছে থাকা চাই। কিন্তু

তুমি তো তখন টাকা উপায় করতে ব্যস্ত, তোমাকে পাবো কী করে ?

—তারপর ?

—তারপর আমি কমল চৌধুরীকে ধরলুম।

—কমল চৌধুরীর মত একটা লোফার দোকানদারের পেছনে ছুটতে তোমার লজ্জা করলো না ?

মা বললে—আমার তখন লজ্জা করার কিছু থাকলে তবে তো লজ্জা করবে, তুমি যে তখন আমাকে একেবারে নির্লজ্জ করে তুলেছ ! আমি যে তখন সব লজ্জার জলাঞ্জলি দিয়ে বসেছি !

বাবুর সমস্ত শরীর তখন থর-থর করে কাঁপছে। বললেন—তারপর ?

—তারপরই বাধলো গোলমাল। আমার লজ্জা না থাকলেও কমল চৌধুরীর বোধহয় লজ্জা-সরমের বালাই ছিল। একদিন সে বললে—আমি আর আসবো না—

আমি জিজ্ঞেস করলুম—কেন তুমি আসবে না ?

সে বললে—সহরের লোকেরা আমাদের ব্যাপার নিয়ে কানা-ঘুষো আরম্ভ করেছে। মিস্টার বোসের কানে গেলে তোমারও ক্ষতি হবে, আমারও ক্ষতি হবে—

আমি জিজ্ঞেস করলুম—আমার ক্ষতি হয় হোক, কিন্তু তোমার কী ক্ষতি হবে ?

সে বললে—আমার ব্যবসার ক্ষতি হবে, আমার দোকানে আর কোনও খদ্দের আসবে না।

আমি শুনে বললুম—তোমার ব্যবসার ক্ষতিটাই তোমার কাছে বড় হলো আর আমার ক্ষতিটা কিছু নয় ? আমার চেয়ে তোমার ব্যবসাটাই বড় হলো ?

সে বললে—হ্যাঁ।

তাই শুনেই আমার রক্ত গরম হয়ে গেল। ক'দিন ধরে যখন লক্ষ্য করলুম সে আসছে না। আমি সেদিন আর থাকতে পারলুম না। বন্দুকটা সারাতে নিয়ে যাচ্ছিলুম, সেখানে আগে না গিয়ে পথেই তার দোকানে নেমে গেলুম, তখন সে একটা গ্রামোফোনের মেশিন সারাচ্ছে, সেখানে দু' একটা কথার পরেই আমি তাকে খুন করলুম !

—তুমি সত্যিই তাকে খুন করলে ?

মা বললে—হ্যাঁ, খুন করলুম।

—কিন্তু পুলিশের কাছে তুমি তখন যা স্টেটমেণ্ট দিয়েছিলে আর এখন যা বলছো, তাতে তো কিছু মিলছে না। একেবারে উল্টো! তুমি জানো এতে তোমার ক্ষতি হবে ?

মা যেন তখন একেবারে বেপরোয়া হয়ে গেছে।

বললে—ক্ষতি যা হবার তা আমার আগেই হয়ে গেছে, আর কত ক্ষতি হবে আমার ?

—তাহলে জেরার সময় তুমি কোর্টে এই কথাই বলবে ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে তার পরিণতি কী তা তুমি জানো ?

—হ্যাঁ, জানি, ফাঁসি।

বাবু বললেন—দেখ তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ তুমি জেরার সময় এ-কথাগুলো বোল না। আগে যা বলেছিলে তাই-ই বোল। তাতে তোমার ভালোই হবে। কমল চৌধুরীর ভাগ্নে জানকীপ্রসাদ যা কিছু বলবে তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রমাণ আছে। কান্হাইয়া বলে একজন সাক্ষী জোগাড় করেছি, তাকে আমি অনেক টাকা দিয়েছি, সে প্রমাণ করে দেবে যে খুনের সময় জানকীপ্রসাদ বাড়িতে ছিল না। সিনেমা হাউসের সামনে তার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল। আর তুমি জানো মিস্টার ভরদ্বাজ এখানকার সবচেয়ে বড় ক্রিমিন্যাল উকিল, আমি তাঁকে এই কেসটা দিয়েছি। আমি তাঁকে বলেছি তোমাকে ছাড়াবার জন্যে যত টাকা লাগে তা আমি খরচ করবো, তিনি যেন আপ্রাণ চেষ্টা করেন। আর শুধু একটা ব্যাপার রইলো—ওই ফোটোগ্রাফখানা। ওটা যদি পুলিশকে মোটা ঘুষ দিয়ে আদায় করে নিতে পারি তো আর কোনও ভাবনা নেই আমাদের—তোমাকে শুধু আমার একটা অনুরোধ তুমি যেন জেরাতে এই সব কথাগুলো বোল না।

সেদিন আর তখন কথা বলবার সময় ছিল না। মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল, আমাদের চলে আসতে হলো।

এতক্ষণ পরে হরিপদ থামলো। বললে—স্যার, আর এক কাপ চা চাই, আমার গলা শুকিয়ে গেছে।

গল্পটা এমন এক অবস্থায় ফেলে হরিপদ চা খেতে চাইলে যে তখন আর চা না দিয়ে উপায় নেই।

চা খেয়ে আবার একটা বিড়ি ধরালে হরিপদ। ধোঁয়া ছেড়ে আমার দিকে চেয়ে বললে—কেমন লাগছে স্যার আপনার ?

বললাম—তারপর বলো।

হরিপদ বললে—তারপর সে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল কোর্টে। কোর্টে কেস ওঠে আর আমরা সবাই মিলে যাই। সারা সহর ঝেঁটিয়ে লোক গিয়ে হাজির হয় মজা দেখতে। আপনি স্যার এসব কোর্টের খুঁটিনাটি লিখবেন না। এসব বড় ভজোকটো ব্যাপার। কোর্ট-কাছারির ব্যাপার আপনারাও জানেন না, পাঠক-পাঠিকারাও কেউ জানে না। শেষকালে কোথায় একটা ভুল করে বসবেন আর উকিল-মোক্তাররা হৈ-হৈ করে উঠবে। আপনি শুধু লিখবেন আসামী বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

আমি বললাম—সে কী ? তোমার মা খালাস পেয়ে গেল ?

হরিপদ বললে—হ্যাঁ স্যার, খালাস পেয়ে গেল। সেই ছবিখানার ব্যাপারটাই ছিল গোলমেলে। তা সেটাও ফয়শালা হয়ে গেল ভরদ্বাজ সাহেবের জেরার মুখে। ভরদ্বাজ সাহেব প্রমাণ করে দিলে যে ফোটোখানা জাল। কমল চৌধুরীর একখানা মুখ আর আমার মা'র একখানা মুখ দু'খানা ছবি থেকে কেটে নিয়ে একসঙ্গে একটা ছবিতে লাগিয়ে দিয়েছিল। এমনভাবে বসিয়ে দিয়েছিল যাতে ভুল হয় যে দু'জনে বসে বসে গল্প করছে। এসব ফোটোগ্রাফারের কারসাজি মশাই। আমরা আগে ওইজন্যে যত ভয় পেয়েছিলুম সব মিছিমিছি। ভরদ্বাজ সাহেব জেরায় প্রমাণ করে দিলে যে ওটা ভুয়ো ছবি। জজ সাহেবও তাঁর রায়ে তাই বললেন। আসামীকে বেকসুর খালাস করে দিয়ে জজসাহেব বললেন—আসামী ভদ্রসমাজের সম্ভ্রান্ত সচ্চরিত্রা মহিলা, কমল চৌধুরী দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মারা গেছে, আসলে এটা মোটেই হত্যার ঘটনা নয়। সম্পূর্ণ একটা দুর্ঘটনা মাত্র, কমল চৌধুরীর ভাগ্নে জানকীপ্রসাদ একটা জঘন্য দুশ্চরিত্র যুবক, একজন নিষ্পাপ সম্ভ্রান্ত মহিলার নামে কলঙ্ক লেপন করে তাঁকে বেইজ্জৎ করে একটা রহস্যজনক উদ্দেশ্য সাধন করবার নীচ প্রচেষ্টা করেছিল। আমি আসামীকে সসম্মানে মুক্তি দিলাম।

তা মা ছাড়া পাওয়ার পর যে আমাদের কী আনন্দ হয়েছিল তা আপনাকে কী বলে বোঝাবো বুঝতে পারছি না। যখন কোর্ট বন্ধ হলো বাবু মা'কে নিয়ে বাড়িতে এলেন। সহরের আরো গণ্যমান্য

লোক আমার বাবুকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন। বাড়ি তখন লোকের ভিড়ে সরগরম। কতদিন পরে মা বাড়িতে এসেছে, আমরা আনন্দে তখন প্রায় লাফাচ্ছি।

তারই মধ্যে মা আমাকে আড়ালে ডেকে বললে—হরিপদ আমার জন্যে দোকান থেকে এই ওষুধটা কিনে আনতে পারবি?

বললুম—বলুন না কী ওষুধ কিনে আনতে হবে, আমি এখুনি নিয়ে আসছি।

মা একটা চিরকুটে ওষুধের নাম লিখে দিলে। আর একটা পাঁচ টাকার নোট দিলে।

আমি দৌড়ে সহরে গিয়ে একটা ওষুধের শিশি কিনে এনে মাকে দিলুম। তারপরে সেদিন খাওয়া-দাওয়া সারতে অনেক রাত হয়ে গেল। বাবু খুশী হয়ে সেদিন খাওয়া-দাওয়ার এলাহি বন্দোবস্ত করেছিলেন। এতদিন পরে মা বাড়িতে এসেছে, উৎসব না করলে চলে?

অনেক দিন ধরে কারো খাওয়া নেই, ঘুম নেই, সেদিন সবাই পেট ভরে খাবে, ঘুমোবে। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমোতে গেছি আমরা। তারপরে একেবারে এক ঘুমে রাত কাবার। ভোর তখন পাঁচটা কি ছ'টা, হঠাৎ শুনতে পেলুম বাবু আমাকে ডাকছেন—হরিপদ—হরিপদ—

আমি ধড়-মড় করে দৌড়ে ওপরে গিয়েছি। গিয়ে দেখি বাবু মা'র শোবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মা'কে ডাকছে—

অনেকক্ষণ ডেকে ডেকে দরজায় ধাক্কা দিয়েও যখন মা'র সাড়া পাওয়া গেল না, তখন সবাই মিলে শাবল দিয়ে দরজা ভেঙে ফেলা হলো। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখি অবাক কাণ্ড! দেখি বিছানার ওপর মা অজ্ঞান হয়ে শুয়ে পড়ে আছে। কোনও সাড়া নেই তখন আর মা'র।

আমরা সবাই কাণ্ড দেখে চুপ করে রইলুম। এমন বীভৎস কাণ্ড যে হবে তা আমরা ভাবতেও পারি নি। আমি চিৎকার করে ডাকতে লাগলুম—মা—মা—মা—

কিন্তু মা'র নিথর নিস্পন্দ শরীর তেমনি নিথর-নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। আমার ডাকাডাকিতে মা কোনও সাড়া-শব্দ দিলে না। সাড়া দেবে কে? মা কি আর তখন বেঁচে আছে?

তখন খবর পেয়ে পুলিশ এল, লোকজন এল। আমাদের জিজ্ঞেসাবাদ করলে তারা। আমরা যা জানতুম তাই বললুম।

ভাগ্যিস মা মারা যাওয়ার আগে একটা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল তাই আর কোনও গণ্ডগোল হলো না।

মা বাবুর নামে লিখেছিল—'আমি ভেবে দেখলুম আমার আর বেঁচে থাকবার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি তোমার জন্যে অনেক সহ্য করেছি। তুমি যখন তোমার নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার জন্যে দিন-রাত কাজ করে চলেছ, আমি একলা তোমার সংসারের দিকটা সামলিয়েছি। সেদিন অনেক কষ্ট মুখ বুজে এই মনে করে সহ্য করেছি যে একদিন আমাদের অনেক টাকা হবে, তখন তুমি আমি সেই টাকায় ভবিষ্যতের সুখ কিনে নিশ্চিন্তে জীবন কাটাবো। আমি তোমাকে কখনও বলি নি যে তুমি তোমার কাজ ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে থাকো। কখনও মুখ ফুটে বলি নি যে আমার একলা থাকতে খারাপ লাগছে। আমি সব কিছু সহ্য করে গিয়েছি শুধু আমাদের দু'জনের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে। কিন্তু তুমি আমায় সব চেয়ে বেশি আঘাত দিলে যেদিন তুমি আমাকে সন্দেহ করলে। যেদিন তুমি আমার চরিত্রে সন্দেহ করলে সেই দিনই আমি আমার জীবনের সব চেয়ে মর্মান্তিক আঘাত পেলাম। ভেবে দেখলাম তোমার জীবনে আমার প্রয়োজন একেবারে ফুরিয়ে গেছে। তুমি ভালোবেসেছ শুধু তোমার কাজকে আর তোমার টাকাকে। আমি শুধু তোমার নামে মাত্র স্ত্রী। আমার অস্তিত্ব তোমার কাছে উহ্য, তাই আমিও আজ নিজেকে তোমার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলাম। আরো ভেবে দেখলাম একবার যখন আমার সম্বন্ধে তোমার মনে সন্দেহ ঢুকেছে তখন আর তর্ক করে তা দূর করতে চাই না। তেমন দৈন্য থেকে ঈশ্বর যেন আমাকে বাঁচান। আমি মরলাম বটে কিন্তু আর একদিক থেকে আমি বাঁচলামও বটে। তোমার সন্দেহের পাত্রী হবার অগৌরব থেকে তো আমি অব্যাহতি পেলাম। সেই তো আমার নতুন করে বাঁচা। জজ সাহেব আমাকে যে জীবন দিলেন সে ঠিক জীবন নয় মৃত্যু, তাই আমি আজ মৃত্যুকে আশ্রয় করেই আবার বেঁচে উঠলাম। আমাকে ক্ষমা কোর।

ইতি তোমার মঞ্জু—'

গল্প বলা শেষ করে হরিপদ বললে—কী স্যার, কেমন লাগলো? ভালো?

বললাম—তুমি কোন ইংরিজী গল্প নিজের বলে চালিয়ে দিলে না তো? এ তোমার ঠিক নিজের জীবনের গল্প তো?

হরিপদ বলে উঠলো—হ্যাঁ স্যার, আমি এতদিন আপনাকে গল্প সাপ্লাই করছি, কখনও কোনও ভেজাল দিয়েছি, আপনিই বলুন? আমি গরীব লোক হতে পারি স্যার, কিন্তু তা বলে ঠকাবো না স্যার আপনাকে। আমি খাঁটি মাল দেব, খাঁটি পয়সা নেব। দিন স্যার, আরো পাঁচটা টাকা ফেলুন, আমায় আবার এখুনি রেশন কিনতে যেতে হবে।

হারাধনবাবুর নাম কে যে রেখেছিল কে জানে। অনেক সময় নামটাও লোকের চরিত্র গঠন করে হয়ত। নামের সঙ্গে মানুষের চরিত্রের কোনও যোগাযোগ আছে কি না এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। কিন্তু দু' একটা ক্ষেত্রে এমন মিলে গেছে যে মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় মানুষের নাম জিনিসটা একেবারে তুচ্ছ নয়।

এই যেমন আমাদের হারাধনবাবু।

ভোলানাথবাবু গেটের পাশের ঘরটাতেই বসতেন। বৃদ্ধ, বিরাট একজোড়া গোঁফ ঠোঁটের ওপরে। তাঁর ঘরেই সকলকে যেতে হতো নাম সই করবার জন্য। এ্যাটেন্‌ডেন্স-খাতায় সই করা দৈনন্দিন নিয়ম। দশটা বেজে কুড়ি মিনিট পর্যন্ত ওই হাজ্‌রে খাতাটা আমাদের সেকশানেই থাকতো। তারপর বড়বাবু ওটা পাঠিয়ে দিতেন ভোলানাথবাবুর ঘরে।

বাসটা যখন অফিসের সামনে থামতো তখন নামবার জন্যে আমাদের হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। আমাদের কেবল ভয় হতো হাজরে-খাতা বুঝি ভোলানাথবাবুর ঘরে চলে গেল।

আর ভোলানাথবাবুর ঘরে খাতা যাওয়া মানেই নামের পাশে লাল ঢিকে। সাড়ে দশটা বাজলে আর রক্ষা নেই।

ভোলানাথবাবু খাতাটা নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন—কেন, আজকে দেরি কেন হরেনবাবু?

হরেনবাবু ট্রানজিট-সেকশানের ক্লার্ক। ঘাড় নিচু করে বলতো—স্যার, স্ত্রীর বড় অসুখ—

ভোলানাথবাবু গম্ভীর হয়ে কথা বলতেন। উত্তরে বলতেন—তাহলে চাকরি আর না-ই বা করলেন, বাড়িতে বসে বসে স্ত্রীর সেবা করলেই পারেন। বলে নিজের ফাইলের দিকে চেয়ে কাজ করতে লাগলেন।

আমাদের সমীর বলতো—শালা ভোলানাথ মরবে কবে বল্ দিকিনি? মরলে মাইরি কালিবাড়ীতে পুজো দিয়ে আসি।

তা ভোলানাথবাবু মনে প্রাণেই ছিলেন ভোলানাথ। ভোলানাথ-বাবুর বাপ-মাও বোধহয় ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। তাঁরা বোধহয় জন্মের সময়েই বুঝেছিলেন যে ছেলে বড় হয়ে রেলের আফিসের সুপারিন-টেনডেণ্ট্ হবে আর হাজরে খাতায় লাল টিকে দেওয়ার জন্তে কেরানীদের গাল-মন্দ-অভিশাপ খাবে। যার ওই রকম চাকরি তার তো মেজাজ গরম হলে চলে না। মেজাজ গরম হলে আর যা-ই হোক রেলের আফিসের সুপারিনটেনডেণ্টের চাকরি করা চলে না। অর্থাৎ দেবাদিদেব ভোলানাথের মত নির্বিকার হতে হবে।

তা আমাদের নিয়ে ভোলানাথবাবুর তেমন কিছু দুর্ভাবনা ছিল না। কারণ আমরা লেট হতাম বটে, কিন্তু বরাবর নয়। কখনও লেট, আবার কখনও ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় গিয়ে পৌঁছুতাম।

দ্বিজপদ হয়ত তখন খাতাখানা নিয়ে ভোলানাথবাবুর ঘরে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজপদকে রাস্তায় ধরতাম।

বলতাম—দে বাবা দ্বিজপদ, তোকে আমি চা খাবার পয়সা দেব, দে, সই করি—হুড়মুড় করে আরো পনেরো জন হয়ত একসঙ্গে খাতাখানার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তো। আর দ্বিজপদ বিরক্ত হতো।

বলতো—ছাড়ুন বাবু, খাতা ছাড়ুন, ভোলানাথবাবু খেয়ে ফেলবে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। আগে ইজ্জৎ, না আগে প্রাণ। দ্বিজপদকে খেয়ে ফেললে আমাদের কীসের লোকসান? আমরা যতক্ষণ সই করা শেষ না করতাম, ততক্ষণ দ্বিজপদ খাতা নিয়ে যেতে পারতো না।

দ্বিজপদ খাতাখানা নিয়ে সোজা ভোলানাথবাবুর টেবিলে গিয়ে রেখে দিয়ে আসতো, সেদিকে ভোলানাথবাবুর এমনিতে কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। বাইরে থেকে দেখলে মনে হতো তিনি নির্বিকার, নির্বিকল্প, নিরবলম্ব। কোনও দিকে কোনও নিয়ম-অনিয়মের প্রতি বুঝি তার মনোযোগ নেই। বিরাট গোঁফ-জোড়ার সুবিরাট ঔদাসীন্যের বেড়াজালে তিনি নিজেকে সুরক্ষিত করে রেখেছেন। কিন্তু আসলে তা নয়।

আসলে সর্বদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। অফিসের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় থেকে সুরু করে অতি বৃহৎ বিষয়গুলো পর্যন্ত ছিল তাঁর নখ-দর্পণে। কে সিল্কের জামা পরে অফিসে আসছে, আর কে সকাল-সকাল ঘণ্টা বাজবার পাঁচ মিনিট আগেই অফিস ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তার সমস্ত খুঁটিনাটি খবর পর্যন্ত তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছুতো।

তবে সব চেয়ে রাগ ছিল হারাধনবাবুর ওপরে। হারাধনবাবু সকলের শেষে ধীরস্থির পায়ে এসে পৌঁছুতো, তার কোনও তাড়া নেই যেন। যেন অফিসে আসতে হয় তাই আসা। বাস থেকে নামবার সময়ও কিছু তাড়া ছিল না। অন্য লোকেরা দৌড়-ঝাঁপ করে অস্থির, তখন হারাধনবাবুর কোনও তাড়া নেই, গরজও নেই।

তারপর বাস থেকে নেমে রাস্তা পেরিয়ে অফিসের গাড়ি-বারান্দার ভেতরে ঢোকে।

ভোলানাথবাবু ঘাড় গুঁজে কাজ করতে করতে মাথা তুলতেন।

বলতেন, হারাধনবাবু—

লাল টিকের ওপর সই করতে করতে হারাধনবাবু বলতো—আজ্ঞে, বলুন—

ভোলানাথবাবু ততক্ষণে আবার নিজের কাজে মন দিয়েছেন।

কাজ করতে করতেই বলতেন—কটা বাজলো ?

হারাধনবাবু ঘড়ির দিকে চেয়ে বললে—আজ্ঞে সাড়ে এগারোটা।

—তা আমাদের অফিস ক'টায় বসে ?

—আজ্ঞে সাড়ে দশটায়।

—তাহলে এক ঘণ্টা লেট ? হিসেব কী বলে ?

—আজ্ঞে আপনার হিসেবই ঠিক।

—আচ্ছা যান্।

হারাধনবাবু আর দ্বিরুক্তি করবার লোক নয়। ছাতি আর ঝোলা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভোলানাথবাবুও আর কিছু বললেন না। নিজের মনে আরো মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে লাগলেন।

আর ট্রানজিট সেকশানে তখন পুরোদমে কাজ সুরু হয়ে গেছে।

হারাধনবাবু নির্বিকার চিত্তে ছাতা ঝোলা নিয়ে বড়বাবুর পাশ দিয়েই নিজের জায়গায় গিয়ে ঢুকলো। বড়বাবু একবার তার দিকে চেয়ে দেখলে। তারপর আবার নিজের কাজ করতে লাগলো। হারাধনবাবুকে কিছু বলা ছেড়ে দিয়েছিল বড়বাবু। প্রথম প্রথম বলতো।

হারাধনবাবুর কাজটাও ছিল তেমনি। অফিসে এলেও অফিস চলতো, না এলেও চলতো। কেউ তার জন্যে মাথা ঘামাতো না।

বড়বাবু একবার চেয়ে দেখলে হারাধনবাবুর দিকে। কোনও অভিযোগ নয়, অনুযোগ নয়। শুধু মন্তব্য করলে—এ্যাই, এতক্ষণে

বাবু এলেন।

ত হারাধনবাবুর তাতে লজ্জা নেই। ঝোলা আর ছাতিটা নিয়ে গুটি গুটি পায়ে নিজের চেয়ারটায় গিয়ে বসলো। তার বসবার চেয়ারটা এমনই একটা জায়গায় যেখানে রোদ ঢোকে না। সাধারণতঃ অফিসের বড়-সাহেব ঘরে ঢুকলে তাকে দেখতে পাবার কথা নয়। সে তখন চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছে না কাজ করছে তাও কারো জানবার কথা নয়।

যখন দুপুরবেলা টিফিন-টাইম, তখন তার কাছে যেতাম। বলতাম—কী হারাধনবাবু অত দেরি করেন কেন রোজ ?

সে বলতো—তুমি ভাই নতুন এসেছো, বুঝতে পারবে না।

আমি সত্যিই প্রথম প্রথম বুঝতে পারতাম না। বলতাম—এতে তো আপনারই ক্ষতি, আপনারই প্রমোশন হবে না।

—আরে প্রমোশন কে চায় হে ? প্রমোশন তো আমি চাই না।

আমি আরো অবাক হয়ে যেতাম হারাধনবাবুর কথা শুনে। অফিসে কেউ চাকরি করে অথচ প্রমোশন চায় না, এমন সচরাচর দেখা যায় না।

বলতাম—প্রমোশন চান না তো চাকরি করছেন কেন মশাই ? চাকরি ছেড়ে দিলেই পারেন।

হারাধনবাবু হাসতো ! হেসে বলতো—তোমরা ছেলেমানুষ, আগে আমার মতো বয়েস হোক তখন বুঝবে।

সত্যিই গোড়ার দিকে আমি বুঝতাম না। নতুন ঢুকেছি তখন অফিসে কত রকম বিচিত্র লোক পেয়েছি। বিরাট রেলের অফিস। পুরো বলতে গেলে বিরাট মহাভারত হয়ে যায়। যেন একটা আস্ত চিড়িয়াখানা সে-সব কথা যদি কখনও সময় পাই তো বলা যাবে।

এবারে শুধু হারাধনবাবুর কথাই বলি। তার কথা বলতে গেলেই সাতকাহন হয়ে যাবে।

দুপুরবেলা যখন টিফিন-টাইম হতো তখন যেতাম তার কাছে। গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম—আজ কী এনেছেন হারাধনবাবু ?

হারাধনবাবু ঝোলাটা বার করতো। একটা ছোট মাটির হাঁড়ি। মুখটা শালপাতা দিয়ে মোড়া। মুখের শালপাতার মোড়কটা খুলতেই দেখলাম, হাঁড়ি ভর্তি মিহিদানা।

বললাম—এত মিহিদানা ? এত মিহিদানা কিনেছেন কার জন্যে ?

—এই ভাই তোমাদের জন্যে।

আমাদের জন্যে মিহিদানা আনার জন্যে অফিস শুদ্ধ লোক খুশী। খবর পেয়ে সবাই এসে হাজির হলো।

হারাধনবাবু বললে—চার পয়সা করে দাও ভাই আমাকে।

তা একটা শালপাতায় একমুঠো করে মিহিদানা চার-চার পয়সায় সব বিক্রি হয়ে গেল পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

মিহিদানাগুলো ভালো। কলকাতার মিহিদানার মত শুকনো নয়। বেশ রসালো। সবাই হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে নিলাম।

এরপর থেকে আমার নেশা লেগে গেল। আমরা রোজ গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, আজকে কী আনলেন হারাধনবাবু ?

তা কোনও দিন মিহিদানা, কোনও দিন এক নাগরি খেজুরের গুড়, কোনও দিন বা এক ঝুড়ি আম।

হারাধনবাবু দেরি করে আসতো বটে। বকুনিও খেত। কিন্তু আমরা তার জন্যে কিছু বলতাম না।

সমীর বলতো—আসলে কিন্তু হারাধনবাবু এসব কিছুই কিনে আনে না, সব চোরাই মাল।

আমি তখন সবে নতুন অফিসে ঢুকেছি। অফিসের সব লোককে চিনতাম না। পরে আস্তে আস্তে অবশ্য সবই চিনলাম। কিন্তু হারাধনবাবুই বলতে গেলে আমার প্রথম আবিষ্কার।

এই হারাধনবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হলো প্রথম। কেন যেন মনে হলো আমাদের অফিসের অত লোকের মধ্যে হারাধনবাবু ছিল ব্যতিক্রম।

ক্রমে সময় পেলেই হারাধনবাবুর সঙ্গেই বেশি মেলামেশা করতে লাগলাম। আমাকেও সে একটু একটু করে পছন্দ করতে লাগলো। আমি গেলেই সে বলতো—বোস বোস রে, বোস।

আমি জিজ্ঞেস করতাম—আচ্ছা হারাধনবাবু, এত লোকের চাকরিতে প্রমোশন হয়, আপনার প্রমোশন হয়নি কেন ?

—প্রমোশন চাইনি ভাই কখনও আমি। প্রমোশন চাওয়াটাই বিপদ—কেন ? প্রমোশন চাইলেই তোমার শত্রু বাড়বে। প্রমোশন চেও না, সবাই তোমার বন্ধু থাকবে।

কথাটা মিথ্যে বলতো না হারাধনবাবু। তার কেউই শত্রু ছিল না। সে দেরি করে আসে বলে তাই ভোলানাথবাবুও কিছু বলতেন না। তিনি এককালে বোধহয় বিরক্ত হয়েছিলেন। তখন কিছু বকাবকি করেছিলেন। তারপর কতদিন ফাইন করেছেন। এমন অনেক মাস গেছে, যখন মাইনে থেকে পাঁচ টাকা সাত টাকা কেটে নিয়েছেন।

কিন্তু সেই ভোলানাথবাবুকে একদিন হারাধনবাবু হাত করে নিলেন এক অদ্ভুত উপায়ে। হারাধনবাবু একদিন এক হাঁড়ি কই মাছ নিয়ে ভোলানাথবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির।

ভোলানাথবাবু রেগেই ছিলেন হারাধনবাবুর ওপরে। কিছু একটা শক্ত কথা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই হারাধনবাবু হাঁড়িটা ভোলানাথবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন।

ভোলানাথবাবু কাজ করতে করতে হাঁড়ি দেখে অবাক।

বললেন—এটা আবার কী ?

—আজ্ঞে, এটা আপনার জন্যে এনেছি।

—এতে কী আছে, কী ?

—কই মাছ। খুব বড় বড় কই। পাঁচটাতে এক কিলো।

—তা অফিসে কই মাছ এনেছেন কেন ?

—বাড়ির পুকুরটায় খ্যাপ্‌লা জাল ফেলেছিলুম কিনা তাই কিছু কই মাগুর উঠলো, ভাবলাম তার মধ্যে কিছু আপনাকে দিয়ে আসি।

—তা আপনি সেই অত দূরের দেশ থেকে এই মাছ ভর্তি মাটির হাঁড়ি বয়ে নিয়ে এলেন ?

—তা আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ, হলোই বা একটু কষ্ট।

—বাসে ট্রামে এই হাঁড়ি তুলতে দিলে ?

—একটু কষ্ট হলো বৈকি স্যার। সেই জন্যেই তো আধ ঘণ্টা দেরি হলো আসতে। তা একটু কষ্ট হওয়া ভালো। এটা আপনার বাড়িতে দিয়ে আসি স্যার—

বলে হাজরে খাতায় সইটা করে সোজা ভোলানাথবাবুর কোয়ার্টারে চলে গেল হারাধনবাবু। তখনকার রেলের সব কোয়ার্টার সারি সারি তিনতলা বাড়ি। এক একটা বাড়িতে অমন দশ-দশটা ফ্যামিলির বাস। সেইখানে গিয়ে ভোলানাথবাবুর চাপরাশির হাতে দিয়ে এল।

এরপর থেকেই ভোলানাথবাবুর রাগটা বকুনিটা যেন একটু কমতে

লাগলো, তারপর থেকেই ফাইন করা কমে গেল। তিনি বেজার হতেন বটে কিন্তু তেমন রাগারাগি আর করতেন না।

আর শুধু কি সেই একদিনের কই মাছ? একবার সন্দেশও নিয়ে এসেছিলেন এই রকম করে।

এমনি করেই আমাদের অফিসে হারাধনবাবু তার চাকরিতে বিয়াল্লিশ বছর পাকা হয়ে রইলো। আর শুধু পাকা হয়েই রইল না। একেবারে অক্ষয় অব্যয় হয়ে রইল।

এ-জীবনে অনেক রকম মানুষ, অনেক রকম চরিত্র দেখলাম। সব ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ করে মানুষকে যেমন সংসার পরিত্যাগ করতে দেখেছি, তেমনি আবার সংসারকে জড়িয়ে ধরেও কত মানুষকে মহাপুরুষ হতে দেখেছি তার কি ইয়ত্তা আছে?

এক এক সময় ভাবি সত্যিই তো কী-ই বা পেলাম জীবনে? আর জীবনে কি কিছু পেতেই হবে? আর পাওয়ার মত বস্তুই বা সংসারে ক'টা আছে? হারাধনবাবুও বোধহয় ওই একটা জিনিসই চেয়েছিল। ওই সন্ধান। সে সারাজীবন শুধু সন্ধান করেই গেল কোথায় কোন বস্তু পাওয়া যায়। সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে কত লোক তো কত কিছু খোঁজে সবাই কি সূর্যোদয় দেখতে পায়, না সূর্যোদয় দেখতে চায়? সবাই হোটেল থেকে বেরিয়ে সূর্যোদয় দেখতেই তো আসে ওখানে। কিন্তু সূর্যোদয় দেখার ভাগ্য কি সকলের হয়? কেউ দেখে, কেউ ঢেউ গোনে, কেউ ঝিনুক কুড়োয়, কেউ বা আবার শুধু বালির ওপর নিজের পায়ের ছাপ রেখে হেঁটে চলে যায়।

কিন্তু সূর্যোদয়?

সূর্যোদয় সবাই দেখতে পায় না। সবাই দেখতে চায়ও না। তা বলে দুঃখ করে লাভ কী? সূর্যোদয় যদি না-ই দেখতে পেলাম, পাহাড় পর্বত মাঠ ঘাট তো দেখা হবে অন্ততঃ কিছু না হোক পাথরের নুড়ি কুড়ানো তো হবে।

সেই জন্যেই হারাধনবাবু লোকটাকে আমার সুরু থেকেই কেমন যেন ভালো লাগতো। যেদিন থেকে অফিসে ঢুকেছি সেইদিন থেকেই লেগেছে। অফিসে অন্য লোকের কি কিছু অভাব ছিল? কত বিচিত্র সব লোক তারা কত বিচিত্র সব ঘটনা কত বিচিত্র তাদের কাহিনী। সব কথা বলবার অবকাশ এখানে নেই। শুধু হারাধনবাবুর কথা

বললেই হয়ত তাদের কথা বলা হয়ে যাবে। তাই আজ এতদিন পরে সেই হারাধনবাবুকে নিয়ে লিখতে বসেছি।

আগে অবশ্য হারাধনবাবু সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। পরে সমস্ত কিছু জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন বুঝলাম আমরাও যা হারাধনবাবুও তাই। আমরাও সবাই এক একটা হারাধনবাবু। দোষ করেছে শুধু একলা হারাধনবাবু। প্রথম প্রথম হারাধনবাবু আর সকলের মতই স্বাভাবিক মানুষ ছিল। সেযুগে যেমন ভাবে লোকে চাকরি পেত, সেই রকমভাবেই এই রেলের চাকরি পেয়েছিল। তখন না ছিল পরীক্ষা, না ছিল নাম রেজিস্ট্রি করার নিয়ম।

সহরে সহরে কোম্পানীর লোক ঢ্যাঁড়া পিটোত। রেল-কোম্পানীর অফিসে চাকরি খালি আছে আপনারা দরখাস্ত করুন।

তা দেশের জমি জমা ছেড়ে কে বিদেশ বিভুঁইতে চাকরি করতে যাবে? কার এত মাথা ব্যথা কোথায় কোন্ বন-জঙ্গলে গিয়ে ইষ্টিশান মাস্টারের চাকরি হবে, সেখানে না আছে একটা আত্মীয় স্বজন না আছে মেশবার মতন একটা মানুষ। তারপর তীর্থধর্ম আছে। পুজো আর্চা আছে। আছে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, বিয়ে-থা। দুটো টাকার জন্যে তো সমাজ-সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে বাস করতে পারি না। দিনের মধ্যে যখন একখানা ট্রেন এলো তখনই যা একটু রবরবা। লোকজন নামা ওঠা। দুচারটে মানুষের মুখ দেখতে পাওয়া। কেউ যাচ্ছে শ্বশুর বাড়ি। কেউ বা আবার চাকরির জায়গায়। তারা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখে। ইষ্টিশান মাষ্টারের বউ হয়ত তখন জাফরির ফাঁক দিয়ে বাইরে ট্রেনখানার যাত্রীদের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কোথায় বউটার দেশ, কোথায় বাঙলা দেশের কোন সুদূর গ্রামে বউটার বাবা-মা থাকে, আর কোথায় পশ্চিমের কোন্ পাণ্ডব-বর্জিত দেশের কোন এক অখ্যাত ইষ্টিশানে স্বামীর সঙ্গে এসে বন্দী হয়ে আছে। ট্রেনখানার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে হয়ত একটু-খানির জন্যে বউটার মন বিকল হয়ে যায়। আর ট্রেনটা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার ছোট সংসারের জাঁতা কলের ভেতর কখন পিষে যেতে সুরু করে তা সে টেরও পায় না। স্বামীটি তখন হয়ত প্লাটফর্মের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সবুজ পতাকাটা হাওয়ায় ওড়াতে থাকে চাকরির খাতিরে।

এ-সব সকলেরই দেখা।

কিন্তু হারাধনবাবুর তখন উঠতি বয়েস। গ্রামেই আর পাঁচ জনের মত তাসপাসা দাবা খেলে মাছ ধরে সময় আর কাটছিল না। আর অবস্থাও তখন তেমন ভাল নয়। মাথার ওপর বাপ নেই। বিধবা মা। বাগানে বাঁশঝাড়ে কাঠ-কুটি কুড়িয়ে গাছের ফল-মূলটা পেড়ে এনে সংসার চালাচ্ছে। সেই অবস্থায় হারাধনবাবু একদিন বাড়ি ছেড়ে বেঘোরে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। গাঁয়ের লোক ভাবলো ছেলেটা বিবাগী হয়ে গেছে।

তারপর বহুকাল কেটে গেল। জমি-জমা সব গোল্লায় গেল। কোথায় গেল হারাধনবাবু, আর কোথায় গেল তার দেশ।

হঠাৎ একদিন গ্রামে এসে হাজির হলো হারাধনবাবু। সঙ্গে বউ।

নলিনী অধিকারী গ্রামের মোড়ল। জমিদার বলেও বটে, আবার অনেক টাকার মালিক বলেও বটে? লোকের বিপদে আপদে যেমন, তেমনি আবার সুখের দিনে।

গ্রামের রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়িটা যাচ্ছিল। অধিকারীমশাই হাঁক দিলেন—কে যায়?

গাড়ি থামলো হারাধনবাবু বেরিয়ে এসে অধিকারীমশাই-এর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

—কে তুমি?

—আজ্ঞে আমি হারাধন। হারাধন সরকার।

—ও, তুমি অম্বিকা সরকারের ছেলে? তা কোত্থেকে আসছো? এতদিন কোথায় ছিলে?

হারাধন বললে—আজ্ঞে আমি রেলে চাকরি পেয়েছি।

—রেলে? রেল কোম্পানীতে? কত টাকা মাইনে পাও?

হারাধন বললে—পনের টাকা। আর রেলের ফ্রি পাস আছে। রেলগাড়ি চড়তে ভাড়া লাগে না।

—পনের টাকা? বেশ বেশ, খুব ভালো। তোমার মা বেঁচে থাকলে খুব খুশী হতো। গাড়ির ভেতর কে?

—আজ্ঞে, আমার বউ।

—বৌমা? তা তুমি বিয়েও করেছ নাকি? কই, কিছুই তো জানি না। কোথায় বিয়ে করলে?

—আজ্ঞে, মুড়োগাছাতে।

—ভালো। ভালো। তা যাও এখন, তেতে পুড়ে এসেছ, বিশ্রাম

করোগে যাও।

তা সেই হলো সুরু। হারাধন সরকার বিয়ে করে বউ নিয়ে এসে সেই রাণাঘাটের গ্রামে নিজের পৈত্রিক ভিটেয় স্থিতু হলো। আর সেই দিন থেকেই ডেলি প্যাসেঞ্জারি সুরু করলে।

হারাধনবাবু বলতো—ভাই, সেই আরম্ভ করলাম ডেলি-প্যাসেঞ্জারি, আর সেই আমার কাল হলো?

আমি জিজ্ঞেস করতাম—কেন? কাল হলো কেন?

হারাধনবাবু সেই কাহিনীই বলত রসিয়ে রসিয়ে। সে কতকাল, কত বছর আগেকার কথা, তখন রাণাঘাট থেকে শেয়ালদা ষ্টেশনের মান্থলি টিকিটের দাম ছিল কন্‌শেসনে আট আনার মতন।

আমি জিজ্ঞেস করতাম—তা, কলকাতার মেসে থাকতেন না কেন?

হারাধনবাবু বলতো আগে তো মেসেই থাকতুম হে। পাঁচ টাকা ছিল মাসে খরচ। তার ওপর পূর্ণিমে আর একদশীতে লুচি-মাংস। কিন্তু দেশে নিজের বাড়ি থাকতে কেন মেসে পড়ে থাকবো? তাই দেশের বাড়িটা সারিয়ে-সুরিয়ে সেইখানেই বাস করতে লাগলুম আর মান্থলি টিকিট করে আপিসে যাতায়াত করতে লাগলাম। সেই আসা যাওয়াই আমার কাল হলো হে।

কেন যে কাল হলো সেই কথাই আমাকে বলতো। বিয়াল্লিশ বছর ধরে চাকরি করেছিল হারাধনবাবু—বেয়াল্লিশ বছরের সেই মর্মান্তিক কাহিনী একা আমিই শুধু জানতাম। সত্যিই তো, আমরা সারা জীবন কী চেয়েছি আর কী পেয়েছি? কী যে চেয়েছি তাও কি কখনও জানতে পেরেছি। কেবল চেয়েছি আরো মাইনে বাড়ুক। আরও প্রমোশন পাই। মাইনেও বেড়েছে, প্রমোশনও হয়েছে, কিন্তু শেষকালে কী পরমার্থ পেয়েছি জীবনে তা আজ আর স্পষ্ট করে বলতে পারি না।

প্রথম দিনই ঘটনাটা ঘটলো। সকালবেলা খেয়েদেয়ে হারাধনবাবু বাড়ি থেকে বেরোল। সাতবার দুর্গা নাম জপ করে ষ্টেশনের রাস্তায় আসতেই নলিনী অধিকারীমশাই-এর সঙ্গে দেখা।

বাড়ির বৈঠকখানায় বসেছিলেন অধিকারীমশাই।

জিজ্ঞেস করলেন—কী হারাধন, কোথায়? আপিসে নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। চলি, দেরি হয়ে গেছে। সাড়ে ছটায় ট্রেন।

নলিনী অধিকারীমশাই ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন—যাও, আর দেরি করো না, যাও—

হারাধনবাবু ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলো। ছুটে যাওয়ার সুবিধে এই যে আগে-ভাগে খালি কামরায় কোন্ ঘেঁষে বসা যায়। যখন নৈহাটিতে কি কাঁচরাপাড়ায় গাড়ি প্যাসেঞ্জারে ভর্তি হয়ে যাবে, তখন আর গায়ে ভিড়ের আঁচ লাগবে না।

যাহোক সেইদিনই প্রথম শিক্ষাটা হলো। শেয়ালদা ষ্টেশনে লোক্যালটা এসে পৌঁছতেই সবাই হুড় হুড় করে নেমে পড়লো। কে আগে নামবে তারই জন্যে কাড়াকাড়ি। হারাধনবাবুও হুড়োহুড়ি করে নামতে গেল। কিন্তু অন্য লোকদের সঙ্গে পারবে কেন? শেষ পর্য্যন্ত সবাই যখন নেমে গেছে তখন ফুরসৎ মিললো।

কিন্তু নামা হলো না। হঠাৎ নজরে পড়লো গাড়ির কোণের দিকে বেঞ্চির নিচেয় কী যেন পড়ে আছে নজরে পড়লো।

গাড়ির ইঞ্জিন তখন বহুদূর থেকে এসে পৌঁছে হাঁস-ফাঁস করছে। ট্রেন থেকে কুলিরা মালপত্র নামাচ্ছে, এমন সময় হারাধনবাবু নামতে গিয়েও নামলো না। তাড়াতাড়ি চারদিকে চেয়ে নিয়ে বেঞ্চিটার তলায় হাত ঢুকিয়ে দিলে।

একটা পোঁটলা পড়েছিল সেখানে। কোনও প্যাসেঞ্জার হয়ত ফেলে চলে গেছে।

পোঁটলাটা বার করে নিলে হারাধনবাবু। ভেতরে যে কী আছে মালুম হলো না। কাপড়ের ফাঁক দিকে হাত ঢুকিয়ে দিলে। হাতে যা ঠেকলো তাতে মনে হলো আলু। প্রায় সের তিনেক ওজন হবে। কেউ হয়ত কিনে আনছিল বাড়ির জন্যে, তাড়াতাড়িতে ভুলে ফেলে গেছে।

প্রথমে একটু ভয় হলো যদি আলুর মালিক আবার এক্ষুনি ফিরে আসে। ফিরে এসে বলে—এ কি মশাই, আমার আলু যে ওটা, আপনি নিচ্ছেন কেন?

পোঁটলাটা নিয়ে হারাধনবাবু খানিকক্ষণ প্লাটফরমের ওপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো কেউ আসছে কি না। কিন্তু না, সবাই তখন হু-হু করে গেটের দিকে চলে যাচ্ছে। তার দিকে চেয়ে দেখবার দায় নেই কারো।

হারাধনবাবুর একবার মনে হলো পুলিশের থানাতে জমা দিলে

হয়। থানার দিকেই সে এগোল পোঁটলাটা নিয়ে।

কিন্তু যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো। ওদিকে অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। তিনসের ওজনের মাল নিয়ে চলাফেরা করতেও কষ্ট লাগে। আর কিছু না বলে সোজা বাসে গিয়ে উঠলো। শুধু বাসে উঠেই অফিসে গিয়ে নামা তো হয় না। মাঝখানে ধর্মতলায় একবার বাস বদলানো। রাস্তার মোড়ের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখেই চমকে উঠলো। ঘড়ির বড় কাঁটাটা ততক্ষণে ছ'টার ঘরের ওপর ঝুলে পড়েছে। অফিসে পৌঁছোতে যার নাম আরো আধ ঘণ্টা। লেট হওয়া মানেই ভোলানাথবাবুর ঘরে হাজরে খাতা চলে যাওয়া।

তা মনে আছে হারাধনবাবু সেই পোঁটলাটা নিয়েই সেদিন বাসে উঠলো। তারপর সেই অবস্থাতেই সোজা অফিস।

অফিসে যেতেই ভোলানাথবাবু বললেন—এ কি. এত দেরি তোমার যে হারাধন ?

হারাধন সবিনয়ে বললে—আজ্ঞে স্যার, ট্রেন লেট ছিল—

ভোলানাথবাবু বললেন—তাহলে ওখানে লিখে দাও ট্রেন লেট।

সেদিন প্রথমবার। কলকাতার অফিসে প্রথম বদলি হয়ে ওই-ই প্রথম লেট। সুতরাং মকুব হয়ে গেল। অফিসেও বিশেষ কেউ কিছু বললে না।

সেদিন ফেরার সময় আবার সেই রাণাঘাট লোক্যাল। তিন সের আলু নিয়ে বাড়িতে পৌঁছতেই তরলা বললে —এ কী এনেছ গো ?

হারাধনবাবু গেঞ্জি জামা ছাড়তে ছাড়তে বললে—আলু।

আলু শুনে অবাক হয়ে গেল তরলা। বললে—হঠাৎ আলু আনলে যে ? বলে পোঁটলাটা খুলে ফেললে। দেখলে সত্যি আলু। তারপর জিজ্ঞেস করলে—তা এত আলু আনলে কী জন্যে ?

হারাধনবাবু বললে—এই শেয়ালদা' দিয়ে আসি তো, পাশেই বৈঠকখানা বাজার। বাজারে গিয়ে দেখলুম খুব সস্তায় আলু বিক্রি হচ্ছে, তাই ভাবলাম নিয়ে আসি। আলু তো সংসারে লাগেই।

তরলা আর কিছু বললে না। হারাধনবাবু বললে—আজকে আলুর দম করো। সেদিন আলুর দম দিয়েই ভাত উঠে গেল দু'জনের। তখন সবে নতুন বিয়ে করে বউ এনেছে। বিনা খরচে আলুটা এসে গেল। বাজারের পয়সা যা-হোক কিছু বাঁচলো।

এই হলো সূত্রপাত।

এ-জীবনে অনেক দেখে এইটুকু সার বোঝা গেছে যে যে-যা চায়, তাই-ই সে পায়। চাওয়ার পেছনে যে আন্তরিকতা দরকার, তেমনি রকমফেরও তো দরকার। সংসারে কেউ অর্থ চায়, কেউ তো আবার পরমার্থও চায়। পরমার্থ চাওয়ার লোকও তো আছে এ সংসারে।

অফিসেও তো আমাদের অনেক রকম লোক ছিল। কেউ চাইতো প্রমোশন। কেউ মেয়েমানুষ, কেউ খাওয়া, কেউ বা টাকা। আবার এমনও দেখেছি একজন টিফিন টাইমে ঝোলা থেকে একখানা পকেট-গীতা বার করে পড়তো।

হারাধনবাবুর কোনও দিকে খেয়াল থাকতো না ওই একটা জিনিস ছাড়া। ভোরবেলা সেই যে দুর্গা নাম জপ করে ট্রেনে উঠে বসতো, তারপর আর কোনও দিকে খেয়াল থাকতো না। ট্রেনখানা প্লাটফরমে আসতেই সেদিন আবার হারাধনবাবু একটা কোন্ দেখে বসে পড়লো।

তারপর ট্রেন ছেড়ে দিল।

তখন ঘুম এল হারাধনবাবুর। ভিড়ের মধ্যে ঘুমই একমাত্র আশ্রয়। একটার পর একটা ষ্টেশন আসছে আর যাচ্ছে। বাইরের দিকে চেয়ে দেখবার দরকার নেই। ডেলি-প্যাসেঞ্জার হওয়ার এই একটা অসুবিধে। ট্রেনে চড়ার আনন্দ আর থাকে না।

এক-একটা ষ্টেশন আসে, আর ভিড় ক্রমশঃ বাড়ে। বাড়তে বাড়তে শেষে আর বসবার জায়গা থাকে না গাড়িতে। সেদিকে দেখবার আগ্রহও থাকে না হারাধনবাবুর। ততক্ষণ ঘুমোলে স্বাস্থ্যটা ভালো থাকে। এবার যখন নৈহাটি ষ্টেশনে এল তখন আর তিল-ধারণের জায়গা নেই।

হারাধনবাবু একবার চোখের কোণ দিয়ে চেয়ে দেখলে। সবাই ডেলিপ্যাসেঞ্জার! তারপর এক সময়ে শেয়ালদা। বিরাট ষ্টেশন। ট্রেনটা পৌঁছবার সময় গম্-গম্ শব্দ হয় একটা।

সেদিন নামবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে। তা পড়ুক। হারাধনবাবুর সেদিকে আগ্রহ নেই। যখন সবাই নেমে গেল হারাধন উঠলো। চারদিক চেয়ে দেখলে। কোথাও কিছু আছে নাকি! বাঙ্কের ওপর চেয়ে দেখলে উঁচু হয়ে। বাঙ্ক একেবারে ফাঁকা। বেঞ্চির নিচেয় মাথা নিচু করে দেখলে। কোথাও কিছু নেই। মনটা

যেন একটু বিরস হয়ে গেল। সেদিন আলুটা ভালো ছিল। বেশ টাটকা। আলুর দমটাও বেশ রেঁধেছিল তরলা। তরলার রান্নার হাত ভালো। গোড়ার দিকে বড় কষ্ট গেছে হারাধনের। মেসে খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গিয়েছিল।

সে সব কষ্টের দিনের কথা ভাবলেই কষ্ট হতো।

হারাধনবাবু বলতো—সে-সব কী কষ্টের দিন গেছে ভাই। মেস-খরচ পাঁচ টাকা, হাতে থাকতো দশ টাকা। সেই দশ টাকায় জামা কাপড় ধোপা নাপিত সব কিছু। তারপর আর হাতে কিছু থাকতো না। মাসের শেষের দিকে হাত একেবারে খালি। তখন আর ট্রামে চড়ার পয়সা থাকতো না। একেবারে সোজা হণ্টন। সাত মাইল রাস্তা হেঁটে অফিসে আসতুম।

এসব সেই পুরোন আমলের কথা।

সে-যুগটাই ছিল আলাদা। অফিসের দরজার সামনে কাবুলি-ওয়ালারা লাঠি নিয়ে বসে থাকতো। বিশেষ করে মাইনে পাবার দিনগুলোতে। গেটের উল্টোদিকের ফুটপাথের মাটির ওপরেই ছিল তাদের আড্ডা। কাকের মত ঘাড় কাত্ করে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতো গেটের দিকে। এক-একজন মাইনের টাকা নিয়ে বেরোত আর এক-একটা কাবুলিওয়ালা কাছে গিয়ে খপ্ করে তার হাতটা ধরে ফেলতো।

বলতো—কাঁহা? রুপিয়া কাঁহা বাবু?

এমন অনেকবার হয়েছে যখন মাসের সমস্ত মাইনেটা কাবুলি-ওয়ালার হাতে তুলে দিয়ে অনেকে বাড়ি চলে গেছে। তারপর সারাটা মাস একেবারে উপোষ।

আর এখন? এখন তবু দুটো খেতে পাচ্ছি হে। পৈত্রিক ভাঙা ভিটের ওপর নতুন পাকা দালান তুলেছি। দু'টো ছেলে রাণাঘাটে দোকান করে মোটামুটি রোজগার করে ঘরে টাকা আনছে। একটি মেয়ে ছিল ভাল জামাই দেখে তার বিয়ে দিয়েছি। এখন সব ঝক্কি শেষ। তা এ বয়েসে আমি ভোলানাথবাবুর মুখ ঝাম্টা সহ্য করতে যাবো কেন বলো দিকিনি বাপু? আর চাকরিতে উন্নতি করেই বা আমার লাভ কী হবে বলো?

তা সত্যিই হারাধনবাবুর বাহাদুরি আছে বলতে হবে। সেই পনের টাকা মাইনেতে জীবন সুরু। তারপর বহু ঘাটের জল খেয়ে শেষে এসে ঠেকেছেন এই রেল-আপিসের রেকর্ড সেকশানে।

আমি বলতাম—তা আপিসে আসতে লেট করেন কেন?

—আমি ভাই চিরকাল লেট। কত সাহেব এল গেল, কেউ আমার এই লেট বন্ধ করতে পারেনি।

—তা আগের ট্রেনে এলেই পারেন। একটু সকাল-সকাল বাড়ি থেকে বেরোলেই হয়।

—কেন আগে বেরোব? আমার কিসের দায়?

আমি বলতাম—তা হলে আর ভোলানাথবাবুর গোমড়া মুখ দেখতে হতো না। সোজা গট্-গট্ করে একেবারে নিজের সেকশানে বসতে পারেন।

হারাধনবাবু বলতো—আরে তাতে গায়ে ফোস্কাও পড়ছে না, চাকরিও যাচ্ছে না। কেন অত কষ্ট করতে যাবো? বউকে তাহলে রাত তিনটের সময় উঠে ভাত চড়াতে হয়—এই বুড়ো বয়সে কাজ কী অত ঝঞ্ঝাটে।

আমি বলতাম—তা আপনার ট্রেন তো শেয়ালদায় এসে পৌঁছায় সকাল সাড়ে আটটায়, আর অফিস বসে সাড়ে দশটায়। এই দু'ঘণ্টা সময়েও আপনার কুলোয় না? ততক্ষণ আপনি করেন কী?

হারাধনবাবু বলতো—আরে ভাই, তোমরা ছোকরা মানুষ, তোমরা কী বুঝবে? শেয়ালদা থেকে ধর্মতলার মোড় পর্য্যন্ত হেঁটে এসে যে পয়সা বাঁচাই। যাতায়াতে রোজ যে চার গণ্ডা পয়সা বাঁচাই। রোজ যদি চার গণ্ডা পয়সা বাঁচে তো মাসে কত টাকা হলো সেটা হিসেব করো।

এ একেবারে অকাট্য যুক্তি। এর আর জবাব নেই। পাড়াগাঁয়ের লোক, হাঁটতে তাদের ব্যাজার নেই। হেঁটে এসে যদি হারাধনবাবু গাঁটের পয়সা বাঁচায় তো তাতে বলবার কিছু থাকতে পারে না। আর রেলের চাকরি, সে তো কারো যায় না। বরং যাওয়ানোটাই শক্ত। হারাধনবাবু হাজার চেষ্টা করলেও চাকরি তার যাবে না।

কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। সেটা অনেক পরে শুনলাম।

দু'তিন দিন পরেই আবার সুযোগ এল। হারাধনবাবু ঐদিন থেকেই মনটা খারাপ যাচ্ছিল। মন খারাপ যাওয়ার কারণ ছিল। বউ যেমন যথারীতি ভোরে উঠে রান্না চড়াতো তেমনি চড়িয়েছে। কিন্তু সকাল ছ'টার সময়ই তাগাদা।

—কী গো ? ভাত হলো ?

তরলা বললে—এই হলো বলে, আর বেশি দেরি নেই। ডালটা সাতলেই ভাত বেড়ে দিচ্ছি।

হারাধনবাবুর মেজাজ বিগড়ে গেল। বললে—ডাল-ফাল্ চাই না। শুধু ভাতেভাত হলেই চলবে আমার। তোমার জন্য দেখছি আজকে আমার অফিসে বকুনি খেতে হবে।

বউও চেঁচিয়ে উঠলো—তুমি আপিসে বকুনি খাবে তাতে আমার কী ? আমি কি তোমার কেনা বাদী যে ভোর চারটায় উঠে রান্না করে দেব ? আমি পারবো না। আমি আর অত খাটুনি খাটতে পারবো না।

হারাধনবাবু হঠাৎ আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলো। বললে—আমিও আর ভাত খাবো না, এই চললুম।

বলে ধুতির ওপর জামা চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লো। ধুত্তোর। সংসারের নিকুচি করেছে। কার জন্যে সংসার ? কীসের কী ? যেদিকে দুচোখ যায় বেরিয়ে পড়বো। আর বাড়িতেই রোজ ফিরবো না। যেমন মেসে থাকতাম তেমনি থাকবো। সংসার খরচের টাকা মাসে মাসে পাঠিয়ে দিলে খালাস।

বাড়ি থেকে ইষ্টিশান আধ ঘণ্টার রাস্তা। তাও রাস্তাটা সর্টকাট। বড় রাস্তা দিয়ে ইষ্টিশানে গেলে যার নাম চল্লিশ মিনিট !

পেছন থেকে হঠাৎ কে যেন মেয়েলি গলায় ডাকলে—ও বাবা—বাবা—

হারাধনবাবুর প্রথম সন্তান মেয়ে। হারাধনবাবু অনেক সাধ করে নাম রেখেছিল শিবানী। শিবানীরই গলা।

—বাবা, ভাত খেয়ে গেলে না ? মা যে ডাকছে তোমাকে।

হারাধনবাবু দাঁড়িয়ে পড়লো। পেছন ফিরে দেখলে শিবানী দৌড়ে দৌড়ে তার দিকেই আসছে।

হারাধনবাবু বললে—কী রে ?

শিবানী এসে বাবার হাতটা চেপে ধরলে। বললে—মা বলছে তুমি ভাত খেয়ে যাও।

—তুই বাড়ি যা, আমি ভাত খাবো না। আমার ট্রেনের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বলে আর দাঁড়ালো না। সত্যিই রাগ হয়েছিল হারাধনবাবুর।

তাড়াতাড়ি যদি ভাতই না পাওয়া গেল তো বিয়ে করে লাভটা কী? তাড়াতাড়ি ভাত পেলে তবেই তো ঠিক সময়ে ট্রেন ধরতে পারবে, ঠিক সময়ে কাজ-কর্ম চলবে। রাস্তায় নলিনী অধিকারী মশাই হঠাৎ ডাকলেন—কী গো হারাধন, অফিস যাচ্ছো নাকি?

হারাধন ঘাড় বেকিয়ে বললে—আজ্ঞে, হ্যাঁ কাকাবাবু।

—তা এত সকাল-সকাল কেন? ট্রেনের তো এখনও দেরি আছে হে।

—একটু আগে আগে যাওয়া তো ভালো, তাই যাচ্ছি—নলিনী অধিকারী বললেন—হ্যা তাই যাও, মন দিয়ে কাজ করা ভালো, পরে উন্নতি হবে। এখন কত মাইনে হলো?

—এই তো ইন্‌ক্রিমেণ্ট নিয়ে এবার কুড়ি টাকা হলো।

নলিনী অধিকারী মশাই বললেন—বাঃ, খুব ভালো, আরো মন দিয়ে কাজ করে যাও, আরো উন্নতি করো। তোমার বাবা খুব কষ্ট করে তোমাকে মানুষ করে গেছেন, তাঁর নাম রেখো।

অত্যন্ত সৎ উপদেশ সব। সৎ উপদেশ দিতে নলিনী অধিকারী মশাই-এর জুড়ি নেই। কিন্তু তখন আর উপদেশ শোনবার সময় নেই। অত উপদেশ শুনতে গেলে ওদিকে ট্রেন চলে যাবে।

হন্ হন্ করে হারাধনবাবু ষ্টেশনে গিয়ে দাঁড়ালো। ঘড়ির দিকে চেয়ে সময়টা একবার দেখে নিলে। প্ল্যাটফরমে তখন ডেলি-প্যাসেঞ্জার-দের ভিড়। হারাধনবাবু তার নিজের জায়গাটা নিয়ে দাঁড়ালো।

ওই জায়গাটা হারাধনবাবুর নিজস্ব। নিজস্ব মানে ওই জায়গাটাতে কেউ দাঁড়ায় না। ওই জায়গাটা হারাধনবাবুর একলার।

তারপর যখন ট্রেনটা প্লাটফরমে এসে দাঁড়ায় তখন টপ্ করে উঠতে হয়। টপ্ করে উঠেই কোনের দিকের জায়গাটা দখল করার কথা। ওইটে যদি একবার বেদখল হয়ে যায় তো মুশকিল।

গাড়ি ছাড়বার দশ মিনিট আগে প্লাটফরমে এসে খালি গাড়িটা দাঁড়ায়। হারাধনবাবু তাক্ করে ছিল। ঠিক কামরাটা কাছে এসে দাঁড়াতেই লাফিয়ে উঠে কোনের জায়গাটা দখল করে বসে পড়লো।

রাণাঘাটের অনেক লোক ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে। কেউ যায় কাঁচরাপাড়ায় কেউ নৈহাটিতে, কেউ বেলঘরিয়া। সব জায়গাতেই অফিস কাছারি কারখানা আছে। সকলেরই তাড়া।

—এই যে হারাধনবাবু, কাল কোন্ ট্রেনে ফিরলেন? কাল যে

দেখতে পাইনি আপনাকে ?

—আমাকে এই একই কামরায় পাবে রোজ। তোমাদের মত আমি কামরা বদলাই না হে।

আরো দু'চার জন নানা রকম জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। কেউ দেশের অবস্থা, চালের দর, ছেলের অসুখ। আবার কেউ অফিসের বড়বাবু অসংখ্য সকলের অভিযোগ, অসংখ্য তাদের আলোচনার বিষয়-বস্তু।

এখন হারাধনবাবু থলি থেকে আর একটা ছোট থলি বার করলে। সেটা গোল করে পাকিয়ে মাথায় দিয়ে চোখ বুজে রইল। পেটে ভাত নেই। পেটে ভাত পড়লে ঘুমটা ভালো করে জমে। কিন্তু খালি পেটে কতক্ষণ চুপ করে থাকা যায় ? ঘুমের মধ্যেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—ধুত্তোর—

পাশ থেকে ভদ্রলোক বললে—কী হে, ধুত্তোর বলছো কাকে ?

লজ্জায় পড়লো হারাধনবাবু। বললে—না ভাই, আর পারছি না।

—কেন, কীসের কী পারছো না ?

—সংসার হে সংসার। সংসারের জ্বালায় আমি আর পারছি না। সকাল সকাল একটু রেঁধে উপকার করবে তাও পারে না। তাহলে বিয়ে করাটা কীসের জন্যে বলো ?

হারাধনবাবু কথাটা বলে আবার চোখ বুঁজলো। সে-ঘুমটা যখন ভাঙলো তখন একবারে কামরা খালি হয়ে গেছে। হারাধনবাবু চার দিকে চেয়ে দেখলে। রাণাঘাটের জানা-শোনা লোক কামরার মধ্যে তখন কেউ নেই। আরো সব নতুন লোক উঠেছে। কখন উঠেছে তারা তার খেয়াল নেই। আরো অনেক মোট-ঘাট উঠেছে। কেউ উঠেছে চাকদা থেকে; কেউ শিমুরালি থেকে। কেউ আবার হালিশহর থেকে। সবাই মফঃস্বল থেকে নানা জিনিসপত্র নিয়ে কলকাতার কোনো মার্কেটে চলেছে। হয়ত বৈঠকখানার বাজারে।

ততক্ষণে দম্-দম্ জংশন এসে গেছে। তখন একটু চাঙ্গা হয়ে বসতে হয়। ভালো করে কামরার বাঙ্ক আর বেঞ্চির তলাগুলো দেখে নিলে। অনেক জিনিস-পত্র ঠাসা। সেদিনের মত যদি আলু-টালু ফেলে যায় তো তবু কিছু সুরাহা হয়।

শেয়ালদা ষ্টেশনে এসে ট্রেনটা পৌঁছোবার আগেই সবাই তৈরি হয়ে গিয়েছে। যেন এক-মিনিট দেরি না হয়। যারা অফিসে যাবে

ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে তাদের তাড়াই সব চেয়ে বেশি। তাদের অফিস পৌঁছতে দেরি হয়ে গেলে লাল চিকে পড়ে যাবে। আর যারা ব্যাপারী তাদেরও দেরি হলে লোকসান। বাজারে যত তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারবে ততই তাদের লাভ। সবাই দাঁড়িয়ে উঠে দরজার সামনে ভিড় করে আছে। ট্রেণটা থামলেই সবাই লাফিয়ে নামবে। কিন্তু হারাধনবাবু চুপ করে বসে রইল। সবাই নামুক, তারপরে নামা যাবে। যখন সবাই নেমে গেছে তখন হারাধনবাবু লক্ষ্য করলে একটা মাটির তিজেল হাড়ি তখনও বেঞ্চির তলায় পড়ে রইল। একবার এদিক-ওদিক চাইলো হারাধনবাবু। সবাই নেমে চলে গেছে। প্লাট-ফরমের ওপরে তখন ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের স্রোত বয়ে চলেছে। সেবার এমনি করেই দু'সেরটাক আলুর পোঁটলা পাওয়া গিয়েছিল। এবার হাড়ির মধ্যে কী আছে জানা নেই।

ষ্টেশনের কতকগুলো লাল-জামা পরা কুলি হুড়-মুড় করে ঢুকে পড়লো। এদিক-ওদিক ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। তারপর বেঞ্চির তলায় হাড়িটা পড়ে থাকতে দেখেই সেটার দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, হারাধনবাবু সঙ্গে সঙ্গে হা-হা করে উঠলো।

বললে—ওটো হামারা মাল হ্যায়—তোম্ কেও লেতা হ্যায়?

হারাধনবাবু ভাঙা-হিন্দী শুনে কুলীগুলো তাড়াতাড়ি কামরা থেকে অন্য কামরার দিকে চলে গেল।

হাড়ির ভেতরে কী আছে তখনও জানা নেই। ভয়ে ভয়ে হাড়িটা বাইরে টেনে বার করে আনলে। মুখটা মাটির সরা দিয়ে বাঁধা। হাতে ঝোলাবার মত একটা দড়ি বাঁধা আছে। দড়িটা হাতে ঝুলিয়ে হারাধন-বাবু কামরা থেকে প্লাটফরমের ওপর নামলো। তখন আর সঙ্কোচ-লজ্জা ভয় থাকলে চলবে না।

তখন সঙ্কোচ করলেই লোকে সন্দেহ করবে।

ষ্টেশনের বাইরে তখন তুমুল ভিড়।

ভিড়ের মধ্যে হারাধনবাবু হাড়িটা নিয়ে চলতে লাগলো। এক হাতে ছাতা ঝোলা, আর এক হাতে হাড়ি।

ট্রামের প্যাসেঞ্জাররা হাঁড়ি দেখেই হৈ-হৈ করে উঠলো।

—উঠবেন না মশাই, উঠবেন না, ট্যাক্সি করুন।

কিন্তু হারাধনবাবু দমবার পাত্র নয়। বললে—দয়া করে একটু জায়গা দিন, বেশিদূর যাবো না—

বেশিদূরে যাবো না বলতে হয়। নইলে মাল নিয়ে কেউ উঠতেই দেয় না। অফিস টাইমে শুধু হাতে ওঠাই শক্ত, তার ওপর হাঁড়ি, ছাতা, ঝোলা।

ধর্মতলায় ট্রামটা বদলাবার দরকার হয়। সেখানে অন্য ট্রাম ধরতে হবে। কিন্তু হারাধনবাবু তা করলে না। কার্জন পার্কের বাগানের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। সেখানে গিয়ে একটা ঝোপ দেখে বসলো। সেখানে আস্তে আস্তে হাঁড়ির মুখের সরাটা খুলে ফেলল।

খুলতেই সে উঁকি মেরে দেখলে—এক হাঁড়ি ভর্তি মিহিদানা।

সকালে বউ ভাত রেঁধে দেয়নি, পেটটা চোঁ-চোঁ করছে এখনও। একমুঠো মিহিদানা তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলে। আঃ, মুখটা যেন জুড়িয়ে গেল। আর একমুঠো খেলে। মিষ্টি খেতে বরাবরই ভালাসতো সে। সেই মিষ্টিই বিনা-পয়সায় মিলে গেল। এরই নাম ভাগ্য। প্রথমবারে পেয়েছিল আলু, আর এবারে মিহিদানা।

কয়েকটা কাক তখন মিহিদানার গন্ধ পেয়ে আশে-পাশে জুটেছে। কা-কা করে চিৎকার করছে। সে হাত তুলে তাড়া করে উঠলো—হুশ্-হুশ্—ভাগ্ এখান থেকে। সকালবেলা পেটে ভাত পড়েনি, তার ওপর কাকের অত্যাচার। কারো ভালো লাগে?

ওদিকে অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ পেছন থেকে যেন কার গলা গেল—এই যে ভায়া, এখানে?

হারাধনবাবু মুখ তুলে চাইলে।

—বিনয়বাবু না?

বিনয়ভূষণ সরকার। ইনিই একদিন হারাধনবাবুকে রেলে চাকরি করে দিয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠে বিনয়বাবুর পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালে।

—থাক্ থাক্, পায়ে হাত দিতে হবে না—বলে দুটো হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারপর বললেন—অফিস নেই? এখানে এত বেলা পর্যন্ত বসে বসে কী করছো? এতে কী?

একটু লজ্জায় পড়ে গেল হারাধনবাবু। বললে—আজ্ঞে, এ মিহিদানা—

—এক হাঁড়ি মিহিদানা যে একেবারে।

—বললে—এই নৈহাটি ষ্টেশনে সস্তায় পেলুম তাই কিনলুম—

—একেবারে এক হাঁড়ি মিহিদানা কিনে ফেললে? এত মিহিদানা

খাবে কে? বাড়িতে ছেলে মেয়ে কটা?

হারাধনবাবু বললে—বড়টি মেয়ে, এই আট বছর হয়েছে, আর পরেরটা ছেলে, এখনও হাঁটতে শেখেনি—

—তা এত বেলা পর্য্যন্ত এই কার্জন-পার্কে বসে আছো কেন? অফিসে কাজ নেই?

হারাধনবাবু বললে—আজ সকাল সাড়ে আটটার ট্রেনে বেরিয়েছি, ভাত খাওয়া হয়নি। তাই এখানে বসে একটু জল খেয়ে নিচ্ছি আর কি—

—ভালো, বলে বিনয়বাবু সেই ঘাসের ওপর বসে পড়লেন।

হারাধনবাবুকে এই বিনয়ভূষণ সরকার একদিন চাকরি করে দিয়েছিলেন। সেই জন্যেই হারাধনবাবু বিনয়বাবুর ওপর কৃতজ্ঞ। বিনয়বাবু কয়েক বছর হলো রিটায়ার করে গেছেন।

—আপনি কোথায় যাচ্ছেন এখন?

বিনয়বাবু বললেন—এই যাচ্ছি ইনসিয়োরেন্স অফিসে প্রিমিয়াম দিতে। রিটায়ার করার পর থেকেই যত কাজ-কর্ম বেড়ে গেছে ভাই। তা অফিসের সব কী খবর? কালিকাবাবু কোথায়? রিটায়ার করেছেন নাকি?

—না, সেই চাকরিতেই আছেন। খুব হম্বিতম্বি করছেন।

—তুমি এখন কোন্ সেক্শানে কাজ করছো? প্রমোশন-ট্রমোশন হলো? হারাধনবাবু বললে—আপনি নেই, কে আর প্রমোশন দেবে?

—তাহলে সেই রেকর্ড সেকশানেই আছো এখনও? সেই গুদাম-ঘরের ভেতরে?

হারাধনবাবু বললে—ঠিকই বলেছেন আপনি। গুদাম ঘরই বটে। রেল কোম্পানীর অত টাকা অথচ রেকর্ড সেকশানটা ও রকম করেছে কেন? একটা জানলাও নেই কোথাও। দিনের বেলাতেই ইলেক-ট্রিকের আলো জ্বালিয়ে কাজ করতে হয়—

বিনয়বাবুর কাছে এই হারাধনবাবু কৃতজ্ঞ। এই বিনয়বাবুই একদিন হারাধনবাবুকে হাতে ধরে চাকরি করে দিয়েছিলেন। তখন মানুষের মত মানুষ ছিল অফিসে।

চাকরিতে ঢোকার দিন বিনয়বাবু বলে দিয়েছিলেন—খুব মন দিয়ে কাজ করবে হারাধন, সময়মত আপিসে আসবে। কোনও ঝামেলার মধ্যে থাকবে না। সেদিন ঘাড় নেড়ে বিনয়বাবুর কথায় হারাধনবাবু

সায় দিয়েছিল।

তখন কলকাতার মেসে থাকতো। হেঁটেই অফিসে আসতো আর হেঁটেই অফিস থেকে মেসে ফিরতো। হারাধনবাবুর কাজে কেউ কখনও ফাঁকি পায়নি, কিন্তু বিনয়বাবু চলে যাবার পর থেকেই অফিসের হাল-চাল্ সব কেমন বদলে যেতে লাগলো।

বিনয়বাবু বললেন—এখন ডি-টি-এস কে আছে গো? মরিস সাহেব তো রিটায়ার করে গেছে—

হারাধনবাবু বললে—হ্যাঁ, সাহেবের আবার ফেয়ারওয়েল হলো, আমরা সবাই একটাকা করে চাঁদা দিলাম।

—তা এখন ডি-টি-এসের চেয়ারে কে বসছে?

হারাধনবাবু বললে—মজুমদার সাহেব।

বিনয়বাবু বললেন—ভালো, মজুমদার সাহেবের লাক্‌টা ভালো হে! দেখ না, ওই মজুমদার আর আমি একসঙ্গে চাকরি পাই। একই দিনে। এখন সে কোথায় উঠে গেল, আর আমি আজ কোথায় বলো দিকিনি! সবই কপাল হে! তারপর একটু থেমে বললে—আর ভোলানাথ? ভোলানাথ এখন কোথায়? হারাধন বললে—আজ্ঞে, উনিই এখন আমাদের ডিপার্টমেন্টের সুপারিনটেনডেণ্ট।

বিনয়বাবু বললেন—ওরও কপাল। তিরিশ টাকায় ঢুকেছিল, জানো? সেই তিরিশ টাকা থেকে এখন সাড়ে সাতশো টাকার গ্রেড্। একেই বলে কপাল। অথচ কাজকর্ম কিছ্ছু জানে না। আমার কাছে এককালে কত বকুনি খেয়েছে ভোলানাথ। তা কাজ-কর্ম চালাতে পারছে?

—ও সব তো জানি না। আমি রেকর্ড সেকশানে থাকি, হাজরে খাতায় সই করি আর বাড়ি চলে আসি।

বিনয়বাবু বললেন—এখন তাহলে আর অফিসে কাজ-কর্ম কিছু হয় না, কী বলো? এখন তো শুনেছি অফিসে চিঠি দিলে নাকি রিপ্লাইও পাওয়া যায় না।

—আজকাল রেকর্ড সেকশান থেকে ডেশপ্যাচ্ সেকশানে চিঠি যেতে চোদ্দদিন লাগে।

বিনয়বাবু বললেন—আমি চলে আসার পরই তাহলে দেখছি অফিসটা গোল্লায় গেছে।

—আরো গোল্লায় যাবে। এখন হয়েছে কী?

—তা তুমি যে এই দেরি করে যাচ্ছো তাতে ভোলানাথ কিছু বলবে না? হারাধনবাবু হেসে ফেললে। বললে—রোজই বলেন। রোজই বকুনি খেতে হয়। তা লেট হলে তো আর কারো চাকরি যায় না আজকাল।

—ফাইন টাইন করে নাকি ভোলানাথ?

হারাধনবাবু বললে—তাও করে।

বিনয়বাবু বললেন—অথচ দেখ, আমি তোমাদের কোনও দিন ফাইন করেছি? কত লোক কত লেট করে আসতো, আমি কিছু বলেছি?

—কী যে বলেন আপনি! আপনি আর ভোলানাথবাবু? বিনয়বাবু উঠলেন। বললেন—যাই, তোমারও দেরি হচ্ছে, আমিও উঠি। তবু অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, অফিসের খবরাখবর সব পেলুম। হারাধনবাবুও উঠলো মিহিদানার হাঁড়িটা নিয়ে। বাঁ হাতে ছাতি আর ঝোলাটা তুলি নিয়ে। বললে—আপনার কথা আমি কখন ভুলবো না বিনয়বাবু। সেদিন আপনি যদি চাকরিটা না দিতেন তাহলে আমি কবে উপোষ করে মরতুম।

বিনয়বাবু উদার সৌজন্যে বললেন—পৃথিবীতে কে কার জন্যে করে হে? ইচ্ছে করলেই কেউ কি কারো জন্যে কিছু করতে পারে? তোমারও গত জন্মের কিছু সুকৃতি ছিল, তাই চাকরি পেয়েছ, আর আমারও বোধহয় কিছু ঋণ ছিল তোমার কাছে, সেটা শোধ হল। সবই ভবিতব্য, ভগবানের ওপর ভরসা রেখে চালিয়ে যাও, দেখবে কিছুই আটকাবে না।

বলে বিনয়বাবু ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে চলে গেলেন। হারাধনবাবু তখনও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। তারপর আস্তে আস্তে বোঝা নিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে চলতে লাগলো। সঙ্গে প্রায় চার পাঁচ সের মিহিদানা।

মাটির হাঁড়ি কি বাসের কনডাক্টাররা তুলতে দেয়?

—আরে, অফিস-টাইমে মাটির হাঁড়ি নিয়ে কোথায় উঠছেন? যদি ভেঙে যায়?

হারাধনবাবু একটু কাকুতি-মিনতি করে বলে—এগারোটা বাজতে চললো, এখন আর অফিস টাইম কোথায় বাবা? খাবার জিনিস আছে এতে, কোথায় ফেলবো?

বসে বেঞ্চির নিচে হাঁড়িটা টেনে নিরাপদে রেখে দিলে। দু'একজন যাত্রী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো। তাদের লক্ষ্য করে হারাধনবাবু বললে—সামান্য জিনিস মশাই, এর জন্যে ট্যাক্সি করবো ? তাহলে ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে—

তা এ-কথায় কেউ কোনও মন্তব্য করলে না। সকলেরই নানান রকম ঝামেলা সকলেরই মধ্যবিত্ত অবস্থা। অন্যের ঝামেলার দুঃখটাও সবাই বোঝে। তারা সবাই জিনিসটা হজম করে নিলে।

তারপর অফিসের সামনে বাসটা যখন এলো তখন হাঁড়ি নিয়ে নামা এক সমস্যা। তাও দয়া করে লোকজন একটু রাস্তা করে দিলে। দু'একজন একটু টিপ্পনি কাটলে—একি মশাই, হাঁড়ি নিয়ে বাসে উঠেছেন ? এ তো বড় উৎপাৎ—ও-সব কথায় কান দিতে নেই। সংসারে ও-রকম কত কথা লোকে বলবে। বউও তো কত কথা শোনায় দিনরাত। সব কথা কি হারাধনবাবু কানে তোলে ? অফিসের বড়বাবুও তো কোনোদিন মিষ্টি কথা বলেনি। ভোলানাথবাবু তো হারাধনবাবুকে দেখলেই মুখ গম্ভীর করে ফেলেন। তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে ? তাতে কি হারাধনবাবু চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছে ?

হাঁড়িটা বাইরের কোরিডোরে রেখে হারাধনবাবু ভোলানাথবাবুর ঘরে ঢুকতো। ভোলানাথবাবু তখন একমনে কাজ করছিলেন। হারাধনবাবুকে ঢুকতে দেখেই দেয়ালের ঘড়িটার দিকে চাইলেন, আর তারপর যেমন করছিলেন, আবার তেমনি কাজ করতে লাগলেন।

টেবিলের কোণার দিকে হাজ্‌রে খাতাখানা খোলা পড়েছিল। পাশে রাখা কলমটা নিয়ে লাল-চিকের ওপর নিজের নামটা লিখে তাতে সময় লিখে দিলে। তারপর অপরাধীর ভঙ্গিতে যেন নিজের মনেই বলে উঠলো—ট্রেনটা স্যার নৈহাটি ষ্টেশনে আটকে গিয়েছিল।

ভোলানাথবাবু সে-কথায় কান না দিয়ে বললেন—ঠিক আছে, আপনি যান্—আর কোনও কথা নয়। ঘরের বাইরে এসে হাঁড়িটা হাতে নিয়ে নিজের সেকশানে গিয়ে ঢুকলো।

হরলাল পাশের চেয়ারে বসে। বললে—কী হারাধনদা, এত দেরি যে ?

হারাধনবাবু ঘাম মুছতে মুছতে বললে—আরে ভাই, সে এক মহা বিপদ হলো। হরলাল বললে—কী বিপদ ?

—আরে নৈহাটিতে এসে ট্রেন আর চলে না। শেষকালে এগারোটার সময় এসে ট্রেনটা শেয়ালদা পৌঁছুলো···

—এতে কী? এই হাঁড়িতে?

হারাধনবাবু বললে—এ ভাই নৈহাটিতে এক মিষ্টিওয়ালার পাল্লায় পড়ে গুণোগার দিতে হলো। কিছুতেই ছাড়ে না। পাঁচটা টাকা গচ্চা গেল। হরলাল বলল—কী মিষ্টি? রসগোল্লা?

—আরে না, রসগোল্লা হলে তো বাঁচতুম, এ হলো মিহিদানা?

হরলাল অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কী? পাঁচটাকার মিহিদানা কিনে বসলেন?

হারাধনবাবু বললে—কী করবো, লোকটা তিনদিন খেতে পায়নি বলে কান্নাকাটি করতে লাগলো, আমারও কেমন দয়া হলো লোকটার চেহারা দেখে। আরে ভাই, দুনিয়ার টাকাটাই কী সব? লোকে দান-খয়রাতও তো করে। ভাবলাম টাকাটা না হয় পকেট-মার হয়ে গিয়েছে—

খবর পেয়ে আরো দু'চারজন তখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সকলের আগ্রহ হাঁড়ির ভেতরে কী আছে।

হরলাল বলল—দেখি, হাঁড়ির মুখটা খোল তো হারাধনদা, দেখি কী রকম মিহিদানা?

হাঁড়ির মুখের সরাটা খুলে ফেলা হলো। সবাই উঁকি মেরে দেখলে ভেতরে। প্রায় হাঁড়ির মুখ পর্যন্ত ভর্তি মিহিদানা।

সবাই হাঁক-পাঁক করে উঠলো।

বললে—এ যে অনেক মিহিদানা দাদা—

হরলাল বললে—প্রায় দশ সের হবে রে—

একজন জিজ্ঞেস করলে—কত নিলে হারাধনদা?

হারাধনবাবু বললে—দশটাকা।

হরলাল বললে—অত মিহিদানা আপনি বাড়িতে নিয়ে কী করবেন? তার চেয়ে আমাদের কিছু দিয়ে দিন না। দু'আনা করে সবাই ভাগাভাগি করে নিয়ে নিচ্ছি—

তা তাই-ই ঠিক হলো। টিফিন-টাইমে একে-একে সবাই এল। এক-একটা শালপাতায় সবাই কিছু কিছু করে কিনে নিলে। সব চার আনা করে ভাগা। দেখতে দেখতে আর্দ্ধেক হাঁড়ি উঠে গেল। চার আনায় সবাই টাট্‌কা মিহিদানা খেতে পেলে। এখনও হাঁড়ির

ভেতর অনেক রয়েছে। ওটা বাড়ির জন্যে থাক্।

হারাধনবাবু বললেন—জিনিসটা ভালো করেছে, কী বলো?

সবাই খুশী তখন। সস্তায় টিফিন সারতে পারলে খুশী কে না হবে?

বিকেল যখন পাঁচটা তখন আবার হাঁড়িটা নিয়ে অফিস থেকে বেরোলে হারাধনবাবু। আবার সেই বাসের ভিড়। আবার সেই প্যাসেঞ্জারদের আপত্তি। আবার সেই ধর্মতলার মোড়ে নামা। আর তারপর ট্রামে উঠে শেয়ালদা ষ্টেশনে পৌঁছোন।

রাত্রে বাড়ি পৌঁছতেই শিবানী দৌড়ে এল। তরলাও এল পেছন পেছন। হাতে হাঁড়ি দেখে শিবানী বললে—এতে কী এনেছ বাবা?

—মিহিদানা।

তরলা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। বললে—সকালবেলা ভাত না খেয়ে যে চলে গেলে, সারাদিনটা উপোষ গেল তো?

শিবানী বলে উঠলো—জানো বাবা, মা-ও আজকে সারাদিন খায়নি।

—কেন? তুমি খাওনি?

শিবানী বললে—না বাবা, তুমি খাওনি বলে মা-ও খেলে না।

হারাধনবাবু বললে—কী কাণ্ড দেখ দিকিনি। এতো মহা মুশকিল হলো দেখছি। আমি খেলুম না বলে তুমিও খেলে না? আরে, আমি তো সেই জন্যে নৈহাটি ষ্টেশন থেকে মিহিদানা কিনে নিলুম।

—এক হাঁড়ি মিহিদানা কিনলে?

—সস্তায় পেলুম তাই কিনলুম।

—সস্তায় পেলে বলে একেবারে একহাঁড়ি মিহিদানা কিনতে হয়?

—মিষ্টিওয়ালাটা যে কান্নাকাটি করতে লাগলো, বললে তিনদিন খেতে পায়নি, তাই পাঁচ টাকায় এক হাঁড়ি মিহিদানা দিয়ে দিলে—

—তারপর?

—তারপর শেয়ালদা ষ্টেশন থেকে ট্রামে চড়ে ধর্মতলায় গিয়ে একটা নির্জন পার্কের মধ্যে বসে খানিকটা মিহিদানা খেলুম। পেটটা ভরলো। তারপর অফিসে গিয়ে চার আনা করে সকলকে বেচে দিলুম। আমার খরচ উঠে গেল।

তরলা বললে—তা এখন ভাত খাবে তো?

—কেন? ভাত রাঁধোনি নাকি?

—না, রেঁধেছি। আমার সকালবেলার ভাত ক'টা জল দিয়ে রেখেছিলুম। আমি জল দেওয়া ভাতই খাবো। তোমাদের নতুন করে ভাত রেঁধেছি।

হারাধনবাবু বললে—একটু মিহিদানা মুখে দিয়ে দেখ না। এত কষ্ট করে আনলুম। ও রেখে দিলে গন্ধ হয়ে যাবে।

সকালবেলার মেঘলা আবহাওয়াটা খানিক পরেই কেটে গেল। সামান্য কুড়িয়ে পাওয়া মিহিদানার যে এত গুণ তা সকালবেলা কল্পনা করতেও পারেন নি। প্রথম দিন আলু, দ্বিতীয়বার মিহিদানা। হারাধনবাবুর মনে হলো তার জীবন যেন সার্থকতার পথেই দশ হাত এগিয়ে গেল।

এর পর থেকে যেন একটা নেশা হয়ে গেল। লোকের নানা রকম নেশা থাকে। কারো বিড়ি সিগারেট, কারো মদ-ভাঙ্। আরো কত রকমের নেশা আছে সংসারে। সেই নেশার টানেই মানুষ উজান ঠেলে এগিয়ে চলে। সেই নেশায় মানুষ বুঁদ হয়ে থাকতে ভালোবাসে। সংসার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, চাকরি জীবিকা সব কিছুর ওপরেও আর একটা নেশা থাকে। সেই নেশাটা হারাধনবাবুর হলো। মদ নয়, মেয়েমানুষ নয়, বিড়ি নয়, সিগারেট নয়। ওই শুধু ট্রেনে বসে চলতে চলতে নজর রাখা কে কোথায় কী জিনিস রাখলে, কোন্ জিনিসটা ফেলে গেল।

তারপর থেকেই নেশাটা যেন বেড়ে যেতে লাগলো। মানুষ অফিসে যেতে একটু আলিস্যি করে, গড়িমসী করে। কামাই করতে পারলে আর ছাড়ে না। কিন্তু হারাধনবাবু যেন অফিসে যেতেই যত আগ্রহ। রবিবার দিনগুলোতে মন-মরা হয়ে যায়।

রাণাঘাটের অন্য অন্য ডেলি-প্যাসেঞ্জাররা শনিবার থেকেই রবিবারের আশায় বসে থাকে। কোনও রকমে শনিবারটা অফিস করেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে—আঃ, বাঁচলুম, কালকের দিনটা বাড়িতে আরাম করে ঘুমোব। আর ট্রেনে চড়তে হবে না—

কিন্তু হারাধনবাবুর মনে হয় যেন একটা দিন নষ্ট হলো।

রবিবারের দিনগুলোতে ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের বড় আরাম। সেদিন আর তাদের বউদের ভোর রাত্তিরে উঠে উনুনে আঁচ দিতে হবে না।

বাবুদেরও সেদিন শীতে কাঁপতে-কাঁপতে পুকুরে ডুব দিতে হয় না। আরাম করে বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোও, তারপর চা খেয়ে পাড়ায় আড্ডা দিতে যাও। তারপর বেলা করে ভাত খেয়ে দিবা নিদ্রা যাও। আর সন্ধ্যেবেলা? সন্ধ্যেবেলা ইচ্ছে হলে বাড়িতে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বোস, আর নয় তো পাড়ায় নলিনী অধিকারী মশাইয়ের বাড়ির তাসের আড্ডায় গিয়ে তাস খেলে রাত দশটা বাজিয়ে দাও। তারপর সোমবারের কথা সোমবারে ভাবা যাবে।

কিন্তু হারাধনবাবু এই ডেলি-প্যাসেঞ্জারির মধ্যেই কোথায় যেন একটা নেশা জোগাড় করে বেঁচে গেল। বড় শান্তি যেন ওই ডেলি-প্যাসেঞ্জারির মধ্যে। এত শান্তি যেন বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেও পাওয়া যায় না। ট্রেনে উঠলেই নিশ্চিন্ত। তারপর যখন খুশী সে চলুক। তার জন্যে কোনও দুশ্চিন্তা থাকে না তার। সে যেন তার জীবনের সমস্ত দায়িত্বভার ট্রেনের ইঞ্জিনের ড্রাইভারের ওপর ছেড়ে দিয়েই দায়মুক্ত। ট্রেন যদি দেরিতে পৌঁছায় তার জন্যে তাকে দায়ী করা চলবে না, দায়ী কাউকে যদি করতে হয় তো দায়ী করো রেলকোম্পানী-কে। আমি কী জানি?

এক-একবার হারাধনবাবুর মনে হয় সারা জীবনটা ট্রেনের কামরার মধ্যে কাটাতে পারলেই যেন নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। কিন্তু মুশকিল হয় এক-সময়-না এক সময় ট্রেন ষ্টেশনে পৌঁছোবেই তখন অফিস যাওয়ার কথা ভাবলেই মাথাটা গরম হয়ে যায়।

ট্রেনে ওঠবার সময় প্রথমটা একটু ভাবনা থাকে শুধু। ঠিক জায়গাটায় বসতে পাবে তো? মানে এমন একটা বসবার জায়গায় যেখান থেকে সমস্ত কামরার লোকগুলোকে দেখা যায়। কে কোন্ মাল কোথায় রাখলো, কে কোন্ মালটা নিয়ে নামতে ভুলে গেল এ-সব দেখার মধ্যে যে কী রোমাঞ্চ তা তো কোনও শালা বুঝবে না। তোরা চাকরিতে উন্নতি কর্, তোরা সাহেবের পায়ে তৈল দিয়ে মাইনে বাড়িয়ে নে। আমি ওর মধ্যে নেই। আমার এই-ই ভালো। এই ডেলি-প্যাসেঞ্জারির প্রথমে পাঁচ কিলো আলু, তারপর দশ কিলো মিহিদানা, এতেই তো তিন মাসের মান্থলি টিকিটের দাম উঠে গেছে। তারপর যদি কপালে থাকে তো কারো ফেলে যাওয়া গয়নার বাক্সও পেয়ে যেতে পারে। কার ভাগ্যে কী আছে কেউ বলতে পারে?

রাণাঘাটের এ-এস-এম হরিপদবাবুর সঙ্গে মুখ চেনা ছিল বরাবর।

হারাধনবাবুকে দেখলে আর টিকিট দেখতে চাইতো না।

সেদিন সরাসরি কথা বললে।

জিজ্ঞেস করল—এ কি, আপনার এত দেরি?

হারাধনবাবু বললে—আজ্ঞে এই আর কি একটু কেনা কাটা করছিলুম বৈঠকখানা বাজারে—

—কী কিনলেন?

—এই এক ঝুড়ি ফুলকপি।

হরিপদবাবু কপির ঝুড়িটার দিকে চাইলে। বললে—কত নিলে?

হারাধনবাবু বললে—খুব সস্তায় পেলুম। পাঁচ টাকা শ'—

—সে কী?

চম্‌কে উঠেছে হরিপদবাবু। পাঁচ টাকায় একশো ফুলকপি?

—এত কপি কী করবেন?

হারাধনবাবু বললে—কী আর করবো? একে-ওকে দেব। সস্তা দরে পেলে সবাই নিয়ে নেবে, আপনি নেবেন?

হরিপদবাবু টিকিট চেক্ করা মাথায় উঠলো। গেট ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে বললে—দিন না একটা—দেবেন?

হারাধনবাবু পাশে গিয়ে কপির ঝুড়িটা নামালো।

টিকিট চেকার কপির ঝুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখে আরো কিছু কিছু লোক জুটে গেল।

—এখানে কী করছেন হরিপদবাবু?

সবাই কপি দেখে অবাক। অসময়ের কপি বলে সকলেরই লোভ তার ওপর! কত করে দর দাদা?

হরিপদবাবু বললে—এ তো বিক্রির জন্যে নয় মশাই, এই হারাধনবাবু শেয়ালদা থেকে কিনে এনেছেন, আমাকে একটা দিচ্ছেন দয়া করে—

সকলে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়লো কপির ঝুড়ির ওপর।

একজন বললে—আমি একজোড়া নিলাম—

বলে দু'টো কপি তুলে নিলে। তারপর একটা আধুলি গতিয়ে দিলে হারাধনবাবুর হাতে। হারাধনবাবু আধুলিটা নিয়ে কী করবে প্রথমটায় বুঝতে পারলে না। তারপর দেখতে দেখতে আরো লোক পয়সা এগিয়ে দিলে। পকেট ভর্তি হয়ে গেল। চেকার হরিপদবাবু পয়সা দিতে যাচ্ছিল, হারাধনবাবু তাঁর হাত চেপে ধরলে।

বললে—আপনার কাছে আর পয়সা নিতে পারবো না, মাফ করবেন আমাকে—

হরিপদবাবু বললে—সে কী? আপনি তো আর দান-ছত্তর করতে বসেন নি, আপনি তো পকেটের পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে এসেছেন।

শেষ পর্য্যন্ত হরিপদবাবুর কাছ থেকেও পয়সা নিতে হলো বাধ্য হয়ে।

যখন সবাই কপি নিয়ে চলে গেছে তখন ঝুড়িতে বাকি পড়ে আছে মাত্র গোটা কয়েক। কিন্তু দু'পকেট তখন খুচরো পয়সাতে ভর্তি হয়ে গেছে। বিশ পয়সায় পাওয়া কপি থেকে কয়েকটা টাকা লাভ হয়ে গেল।

বাড়িতে ঢুকতেই বউ এল, বললে—ঝুড়ি কীসের?

ঝুড়ির ভেতরে গোটা কয়েক মাত্র কপি দেখে অবাক।

বললে—এ কি, এত বড় ঝুড়ি আর চারটে কপি মোটে?

হারাধনবাবু বললে—এনেছিলুম এক ঝুড়ি ভর্তি, সস্তায় পেয়েছিলুম, ভাবলুম অসময়ের কপি খাবো। কিন্তু সবাই কেড়ে নিলে—

—সবাই মানে?

—আরে টিকিট চেকার হরিপদবাবুকে কি 'না' বলতে পারি? তারপর সবাই কাড়াকাড়ি করতে লাগলো কাউকে কিছু বলতে পারলুম না। শেষকালে চারটে কপি যখন রইল তখন হাত জোড় করলাম। বললাম—না বাবা আর বেচতে পারবো না, আমার ছেলে মেয়ে খাবে।

বলে হাত-মুখ ধুতে চলে গেল।

রাত্রে যখন বউ মেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন হারাধনবাবু উঠলো। এটা হারাধনবাবুর নিয়ম। তখন একটা নোটবই বার করে তাতে লিখতে লাগলো। ওটা হিসেবের খাতা। ওতে দুটো পয়সা আয় হলেও লেখা থাকে, ব্যয় হলেও তা লিখতে হয়। মাসের শেষে তা যোগ-বিয়োগ হয়। তাতে জীবনের ডেবিট ক্রেডিট হয়ে যায়। ডেবিট থাকলে ডেবিট, আর ক্রেডিট থাকলে ক্রেডিট। তা ক্রেডিট থাকে সাধারণতঃ হারাধনবাবুর।

বসে বসে মিহিদানার হিসেবটা হারাধনবাবু লিখতে লাগলো। আগের বারে আলুতে লাভ ছিল পাঁচ টাকা বারো আনা। দশ দিনের বাজারের আলু কেনা বেঁচে গিয়েছিল। এবারে কপির হিসেবটা নিয়ে

বসলো। পকেটের একগাদা খুচরো পয়সা বার করে মেঝের ওপর রাখলে। তারপর সিকি দু'আনি, আনি, পয়সা সব গুণে গুণে এক দিকে রাখতে লাগলো। মোট বারো টাকা ক্রেডিট। ইনভেষ্টমেণ্ট করতে হলো না একটা পয়সাও লাভ পুরোপুরি।

যখন সব হিসেবপত্র হলো, নোট খাতায় লিখে টোট্যাল টানা হলো তখন ছুটি। আলো নিভিয়ে আবার নিঃশব্দে গিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। বউ তবু জেগে উঠেছে। তক্তপোষটা বোধ হয় একটু নড়ে উঠেছিল।

ঘুমের ঘোরেই জিজ্ঞেস করলে—কে ? কে ?

হারাধনবাবু সসঙ্কোচে বললে—কেউ না, আমি।

—তুমি ? তুমি কী করছিলে ?

—এই বড্ড জল তেষ্টা পেয়েছিল একটু জল খেয়ে এলুম।

—ও—বলে বউ আবার পাশ ফিরে শুলো। শুয়েই আবার অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো।

হারাধনবাবুও আর দেরি করলে না। সারাদিন বড় ধকল গেছে। চোখ দুটো যেন ঘুমে জুড়ে আসছে। দু'চোখ এক করতে যা দেরি। তারপরেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তার আর খেয়াল রইল না।

সেদিন ওই রকম আর একটা জিনিস পেয়ে গেল।

এক এক সময় হারাধনবাবুর হাসিও আসতো। হাসি আসতো মানুষের ভুলো মন দেখে। এত ভুলো মন হলে কি চলে গো ? ট্রেনে উঠবে, উঠে জিনিস-পত্র বেঞ্চির তলায় রাখবে, কিম্বা বাঙ্কের ওপরে। কিন্তু নামবার সময় কেন খেয়াল থাকে না বাপু ?

অবশ্য লাভ তাতে হারাধনবাবুরই। মাসে যদি এমনি করে দশ পনেরো টাকার মালও হাতে আসে তাতেই কি কম লাভ ? মাসে দশ-পনেরো টাকা হলো বছরে দাঁড়ায় একশো পঞ্চাশ কি একশো আশি টাকার মতন। তাই-ই বা কম কী ? মাসে দু'টাকা মাইনেও তো বাড়বে না। দুটাকা দূরে থাক। আট আনা মাইনে বাড়াবার জন্যে বললে ভোলানাথবাবু রেগে কাঁই হয়ে যাবে। মুখ খিঁচিয়ে বলবে—অফিসে লেট করে আসার সময় তো মনে থাকে না ? আবার মাইনে বাড়াবার কথা বলছো ?

তার চেয়ে এই-ই ভালো। এতে তবু দুটো বাড়তি পয়সায় মুখ

দেখছে। তাই তো সবাই যখন ট্রেনের ভিড় নিয়ে আলোচনা করে তখন হারাধনবাবু রেগে যায়।

বলে—ভিড় হলো তো দোষের কী মশাই? মানুষ ট্রেনে চড়বে না তা বলে? একজন মরুব্বিয়ানার সুরে বলে—তাবলে এত ভিড়? এ মানুষ না পঙ্গপাল? হারাধনবাবু বললে,—ও কথা বলবেন না, মানুষ হলো লক্ষ্মী। মানুষ না হলে পৃথিবী চলতো? মানুষ আছে বলেই ট্রেন চলছে। নইলে কে ইঞ্জিন চালাতো?

মানুষ যে লক্ষ্মী তা সবাই বোঝে তবু সব কিছু বুঝেও মানুষ অবুঝ হয়ে যায়। কেউ নতুন জুতো ময়লা পা দিয়ে মাড়িয়ে দেবে। নতুন জামা পরবার উপায় নেই কারো. কারো ছাতার খোঁচা লেগে ছিঁড়ে যাবে। অফিস টাইমের ট্রেনের ভেতরকার চেহারা আরো ভয়ানক। ঘেঁষাঘেষি গাদাগাদি করে প্যাসেঞ্জাররা দাঁড়িয়ে থাকবে অন্য লোকের ঘামে নিজের জামা ভিজে যাবে। কেশে গয়ার ফেলবার জায়গা থাকে না একতিল। এত ভিড়ে বিরক্ত হওয়াই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু নির্বিকার মানুষ হারাধনবাবু। ভিড় না হলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায় হারাধনবাবুর। খেয়ে দেয়ে প্লাটফরমে গিয়ে যদি দেখে লোকজনের ভিড় নেই তো বড় মন খারাপ লাগে।

চেকার হরিপদবাবুকে দেখে জিজ্ঞেস করে—কী ব্যাপার, আজকে প্লাটফরমে ভিড় নেই কেন বলুনতো?

হরিপদবাবু বলে—আজ যে ছুটি।

—ছুটি?

ছুটি শুনে চমকে যায় হারাধনবাবু। তার অফিসেরও ছুটি নাকি? কই, কিছু তো সারকুলার বেরোয় নি।

—কীসের ছুটি বলুন তো?

—জামাই ষষ্টি যে।

—তা অফিসে কি জামাই ষষ্টিরও ছুটি হচ্ছে নাকি আজকালে? আমাদের অফিস তো ছুটি দেয়নি।

হরিপদবাবু বললে—ছুটি কি আর দেয়? অফিসে না-গেলেই ছুটি। কেউ যাবে না অফিসে। বিকেল বেলায় ট্রেনে সবাই শ্বশুর বাড়ি যাবে। তারা তো আর আমাদের মত নয়। আমাদের ছ্যাচড়া চাকরি, তাই আসতে হয়। কিন্তু ব্যাপারিরা? ব্যাপারিদের তো আর জামাই-ষষ্টি নেই।

হরিপদবাবু বললে—ব্যাপারিরা যাবে ঠিক। দেখুন না, তারা এসে পড়লো বলে—

সত্যিই খানিক পরে ব্যাপারিরা এসে পড়লো। এরা সকাল বেলা এখান থেকে কলকাতায় যায় সারাদিন বড়বাজারে কেনা বেচা করে, আর শেষ ট্রেনে আবার ফেরে, এদের সঙ্গে মালপত্রও থাকে আবার নিজেদের সংসারের খুঁটিনাটি জিনিষও থাকে। কখনও জামা ফ্রক, কখনও বা জুতো কাপড় গেঞ্জি। কলকাতা সহরের জিনিসপত্রের ওপর রাণাঘাটের মানুষদের অনেক লোভ।

তা সেদিন হঠাৎ এক জোড়া নতুন জুতো দেখে বউ অবাক।

জুতোর বাক্স দেখে বউ বললে—এ জুতো নাকি? জুতো আনলে কার তোমার? তুমি তো এই সেদিন জুতো কিনলে?

হারাধনবাবু বললে—না, আমার নয়।

—তবে, খোকার?

বাক্সটা খুলে অবাক। এ কার পায়ের জুতো গো?

হারাধনবাবু বললে—কার আবার? কারোরই নয়।

—কারোর জন্যেই নয়? তাহলে কিনলে কেন?

—বললে—আরে সস্তায় পেলাম তাই কিনলাম।

—সস্তায় মানে? কত দাম নিলে?

—বললে—পাঁচ টাকা।

—পাঁচ টাকা সস্তা হলো? পাঁচ টাকায় এক সের মাংস হতো। এ জুতো কারোর পায়ে হবে না, শুধু শুধু পাঁচ টাকা দিয়ে জুতো কিনতে গেলে কেন?

—বললে—বাক্স্ স্কিনের জুতো, এ তুমি পাঁচ টাকায় কোথায় পাবে? কেউ দেবে তোমার মুখ দেখে? অন্ততঃ কিছু না-হোক পঁচিশটা টাকা গালে চড় মেরে নিয়ে নেবে।

বউ রাগ করতে লাগলো। তার মাথায় এ-সব ঢোকে না। কখনও তো টাকা উপায় করতে হয়নি নিজেকে। তাই জিনিসের মর্ম বোঝে না। হাজার হোক, মেয়েমানুষের মাথায় আর কত বুদ্ধি থাকবে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই আর দেরি করলে না হারাধনবাবু। বললে—ভাত দাও।

বউও আর দেরি করলে না। তাড়াতাড়ি ভাতে ভাত চড়িয়ে

দিয়েই সংসারের কাজগুলো সেরে নিলে। ততক্ষণে স্নান সেরে নিলে হারাধনবাবু।

বউ শুধু একবাব জিজ্ঞেস করলে—আজ এত তাড়াতাড়ি কেন যাচ্ছো ?

—রেগে গেল। বললে—সব কথাতে তোমার থাকা কেন বলো দিকিনি ? তোমার ঘর-সংসারের ব্যাপারে আমি থাকি ?

বলে রেগে মেগে তাড়াতাড়ি ভাত গিলে নিয়ে উঠলো। তারপর গায়ে জামা গলিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলো ষ্টেশনের দিকে।

কিন্তু নলিনী অধিকাবী মশাই ধরে ফেলেছে। বৈঠকখানাতেই বসে ছিলেন তিনি।

বললেন—কী গো হারাধন, আজ এত সকাল সকাল যে, ছটা সাতচল্লিশ ধরতে বুঝি ?

—দাঁড়ালো। বলল—আজ্ঞে না, এই জুতো কিনে মুশ্‌কিলে পড়েছি—

বলে হাতের জুতোর বাক্সটা উঁচু করে দেখালে।

নলিনী অবিকারী মশাই বললে—জুতো ? জুতো কীসের ? জুতো কিনলে নাকি ? দেখি, কী জুতো কিনলে ?

—খানিক দাঁড়ালো।

জুতোর বাক্সটা উঁচু করে দেখালো।

নলিনীবাবু একটু আগ্রহ দেখালেন। দাঁড়ালেন—বললেন—দেখি, কী রকম জুতো ?

—বললে—আমার আবার ট্রেন লেট হয়ে যাবে।

জুতো দেখে নলিনীবাবু বললেন—কত নিলে ?

হারাধনবাবু বললে—দশ টাকা—

—দশ টাকা।

শুনে চমকে উঠলেন নলিনীবাবু। দশ টাকায় এত ভালো জুতো।

বললেন—দেখি দেখি,—

বলে জুতো-জোড়াটা উল্‌টে-পাল্‌টে টিপে দেখতে লাগলেন। চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হলো জুতোটা তাঁর পছন্দ হয়েছে। বললেন —কোন দোকান থেকে কিনলে ?

হারাধনবাবু বললে—কোনও দোকান-টোকান থেকে নয়। এমনি একজন শেয়ালদা স্টেশনে ধরলে। খুব অভাবগ্রস্ত লোক। বললে

লোকটা খেতে পাচ্ছে না। তাই দয়া হলো, দশ টাকা দিয়ে নিয়ে নিলুম—

—তা এখন ফেরত নিয়ে যাচ্ছো কেন?

বললে—পায়ে হচ্ছে না। আমার পায়ে হচ্ছে না। তাই আপিসে নিয়ে যাচ্ছি, যদি কারোর পায়ে হয়, বেচে দেব।

নলিনী অধিকারী মশাই বললেন—তাহলে, দাও তো, আমার পায়ে হয় কি না দেখি—

হারাধন জুতোটা বাড়িয়ে দিলে।

নলিনীবাবু একটা জুতো নিয়ে পায়ে গলালেন। তারপর আর একটা জুতোও পায়ে গলালেন। জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে ঘরের মেঝের ওপর খানিকক্ষণ পায়চারি করে বেড়ালেন। হাত দিয়ে টিপলেন। নানাভাবে পরীক্ষা করলেন।

তারপর বললেন—আমার পায়ে তো ফিট্ করেছে মনে হচ্ছে —না?

হারাধনবাবু এতক্ষণ নজর দিয়ে দেখছিল।

বললে—হ্যাঁ, আপনার পায়ে তো বেশ ফিট্ করেছে—

—তাহলে এটা আমাকেই দিয়ে দাও না হারাধন!

বললে—তা নিন্ না আপনি। আমার নিজের পায়ে তো ঠিক হচ্ছে না। তখন ইষ্টিশানে তাড়াতাড়িতে ভালো করে দেখে নেওয়া হয়নি।

—যে-টাকায় কিনেছি, সেই টাকাতেই দিয়ে দেব। আমি তো লাভ করবার জন্যে বেচছি না। দশ টাকায় কিনেছি, দশ টাকাই দেবেন—

নলিনীবাবুর জুতো জোড়া পছন্দই হয়েছিল প্রথম থেকে। ভেতর থেকে দশটা টাকা এনে দিতে বললেন চাকরকে টাকা দিয়ে জুতো জোড়া রেখে দিলেন।

শেষকালে অফিস সুদ্ধ লোক হাল ছেড়ে দিয়েছে। রেল অফিস যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগলো। কারো জন্যে তো কোনও জিনিস কখনও আটকায় না। রেলও আটকালো না। গড়-গড় করে লাইনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলতে লাগলো। কত লোকের প্রমোশন হলো, কত লোকের বদলি হলো, কত লোকের কত কী হলো তার

ইয়ত্তা নেই।

মানুষের জীবন একটা বিন্দু থেকে শুরু হয়ে কত উত্থান-পতনের বন্ধুর পথ মাড়িয়ে আবার একটা ছোট বিন্দুতে গিয়ে শেষ হয়। মাঝখানটার নাটকে জড়িয়ে পড়ে কেউ মাথা উঁচু করে ওঠে, আবার কেউ বা অতলে তলিয়ে যায়। রেল-অফিসেও তাই হলো। আমাদের সমীর ছোট চাকরিতে ছোট মাইনেয় ঢুকেছিল। সে ইন্‌স্পেক্‌টার হয়ে বড় মাইনের ডিসট্রিক্টে বদলি হয়ে গেল। ভোলানাথবাবু রিটায়ার করলেন। বিনয়বাবুর জায়গায় এসেছিলেন ভোলানাথবাবু। সেই ভোলানাথবাবুও চলে গেলেন একদিন। তার জায়গায় এলেন রামলিঙ্গমবাবু।

কিন্তু হারাধনবাবুর সেই একই মাইনে, একই চেয়ার। একই ঘর। তার কাজও নেই কামাইও নেই। রামলিঙ্গমবাবুও হারাধনবাবুকে ঘাঁটালেন না। বললেন—ওকে যেতে দাও হে, ওকে আর ঘাঁটিও না—

ঘটনাচক্রে আমিও একদিন বদলি হয়ে বাইরে চলে গেলাম। হারাধনবাবুর সঙ্গে আমারও আর কোনও যোগাযোগ রইল না।

কিন্তু যোগাযোগ না-রাখলে কী হবে। কলকাতাতে তো আসতে হতো মাঝে মাঝে। যখনই আসতুম গিয়ে দেখা করতুম হারাধনবাবুর সঙ্গে। সেই চেয়ার সেই পাশে থলিটা থাকতো।

জিজ্ঞেস করতুম—আজকে কী এনেছেন হারাধনবাবু? থলিতে কী আছে?

হারাধনবাবু লজ্জার হাসি হাসতো।

বলতো—আরে ভাই, রোজ কি আর থলিতে কিছু থাকে? সস্তা কিছু পেলে তবে কিনি। ওই নেশা আর কি—

বললাম—আজকে কী আছে, তাই বলুন না।

—এই ভাই এক নাগরি গুড় আছে।

কখনও গুড়, কখনও মিহিদানা, কখনও আলু, কখনও জুতো, আবার কখনও বা ফুলকপি। সেই তখনও অভ্যেস দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। অনেক মানুষই অভ্যেসের দাস। সুতরাং হারাধনবাবুকে দোষ দিয়ে লাভ কী?

এক এক সময় নিজেই ভাবতাম, শুধু তো হারাধনবাবু নয় আমরাও তো এক একজন আস্ত হারাধনবাবু। আমরা যেখান থেকে পারি কত

ক্ষী কুড়িয়ে কুড়িয়ে সংগ্রহ করে বেড়াই। ভাবি পরমার্থ পেলাম। কিন্তু তারপর ?

তারপরের কথা পরে বলবো। এবার হারাধনবাবুর জীবনের আর এক দিনের ঘটনা বলি।

সেদিন হঠাৎ ট্রেণের কামরার মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেল। রাণাঘাট থেকে ছাড়বার সময় তেমন কিছু ভিড় ছিল না। কিন্তু ভিড়টা বাড়লো নৈহাটি থেকেই। শেষকালে আর বসবার জায়গা নেই একতিল। বাকি লোক দাঁড়িয়ে রইল। পরের ষ্টেশনে আরো লোক উঠলো।

পাশের লোকটা বললে—আজকে এত ভিড় কেন মশাই—জ্বালাতন করলে তো দেখছি—

শুধু লোক নয় লোকের সঙ্গে আবার তেমনি মাল-পত্র। প্রথম থেকেই চোখ বুজে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিল। তারপর থেকে সজাগ দৃষ্টি কে কোথায় কী জিনিস রাখলো। একজনের সঙ্গে একটা সুটকেস। মনে হচ্ছে সুটকেসের ভেতরে দামী কিছু আছে।

কড়া নজর রাখতে হবে। তার পাশের আর একটা লোকের হাতে একটা গুড়ের নাগরির তলায় একটা বিঁড়ে। লোকটা সেটাকে বেশ নিরাপদে ঢুকিয়ে রেখে দিলে। তারপর ব্যাগটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপরেই গণ্ডগোলটা বাধলো। জায়গা নিয়ে সূত্রপাত। তাই থেকে চেঁচামেচি গালাগালি।

একজন বললে—তা বলে আপনি আমার পা মাড়িয়ে দেবেন ?

অন্য লোকটা বলে উঠলো—একটু সাবধান হয়ে পা রাখতে পারেন না ?

আগেকার ভদ্রলোক বললে—মশাই আমার পা কোথায় রাখবো সে আমি ভাববো, আপনি আমাকে শেখাতে আসবেন না—

অন্য লোকটা বললে—আলবৎ শেখাবো, আপনি বেশি বক্‌বক্ করবেন না—

—বেশ করবো বক্‌বক্ করবো।

—খবরদার বলছি, মুখ সামলে কথা বলবেন।

আবহাওয়া গরম হয়ে উঠলো। গাড়ি সুদ্ধ লোক অতক্ষণে সজাগ হয়ে উঠলো। দু'একজন এই ঝগড়ার মধ্যে মাথা গলালো।

একজন বললে—মশাই, আপনারই তো দোষ। আপনিই তো প্রথমে ওকে গালাগালি দিলেন—

—কী বলছেন আপনি? আমি প্রথমে গালাগালি দিলুম না উনি প্রথমে আমাকে গালাগালি দিলেন?

—না মশাই, আমরা তো গোড়ার থেকে শুনছি, আপনারই তো দোষ!

ভদ্রলোক চটে গেল। বললে—আপনি কেন কথা বলতে আসেন মশাই আমাদের মধ্যে? আপনি কে?

এবার গাড়ি সুদ্ধ লোক যোগ দিলে।

একজন বললে—আপনি তো অন্যায় কথা বলছেন মশাই—

—অন্যায় তো আপনারই, আপনি কেন পা মাড়িয়ে দিলেন ওর?

বলতে বলতে সবাই যেন মারমুখী হয়ে গেল। কে একজন বুঝি ঘুঁষি তুলেছিল আর একজন সত্যি-সত্যিই ঘুঁষি মেরে দিলে একজনকে।

তারপরই সুরু হয়ে গেল দাঙ্গাবাজি। সে এক তুমুল কাণ্ড। ট্রেণ তখন হু-হু করে চলেছে। ট্রেণও চলেছে, দাঙ্গাও চলেছে। কামরা সুদ্ধ লোক ভয়ে অস্থির। ছাতা-জুতো ছোড়াছুড়ি সুরু হয়ে গেছে।

একজন কিছু উপায় না পেয়ে ট্রেণের চেন্ টেনে দিলে।

কিন্তু ট্রেণ থামলো না।

হারাধনবাবু এক কোণে বসে সব দেখছিল। কোনও উচ্চ বাচ্য করলে না। মজা দেখছিল গোড়া থেকে। খুব ভালো লাগছিল। মনে হচ্ছিল আরো চলুক। যতক্ষণ না ট্রেণ শেয়ালদায় পৌঁছায় ততক্ষণ চলুক।

শেষ পর্যন্ত তাই-ই হলো। যা ভেবেছিল হারাধনবাবু ঠিক তাই। শেয়ালদায় ট্রেণ পৌঁছতেই পুলিশ এল। পাঁচ-সাতজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে থানার হাজতে পুরলো।

সকলের শেষে উঠলো হারাধনবাবু। দেখলে সুটকেসটা আর সেই গুড়ের নাগরিটা তখনও পড়ে আছে।

কামরা ফাঁকা হয়ে গেছে।

হারাধনবাবু ডাকলে—এই কুলি, কুলি—

একজন লাল কুর্তা পরা কুলি আসতেই হারাধনবাবু বললে—এই মাল দু'টো ওঠা—চল্—

কুলিটা মাল দু'টো মাথায় তুলে নিয়ে প্লাটফরম পার করিয়ে দিলে। বললে—কীসে যাবেন রিকস্া, না ট্যাক্সি?

মহা মুসকিলে পড়লো হারাধনবাবু। এখন এত মাল নিয়ে

কোথায় যায় ?

অফিসে এত মাল নিয়ে গেলে সবাই কী-ই বলবে ?

বললে—দাঁড়া বাবা, একটু ভাবি—

বাসে তখন ভীষণ ভিড়। ট্রামেও তাই। লোকই পা রাখবার জায়গা পাচ্ছে না। তার ওপর স্যুটকেস আর গুড়ের নাগরি দেখলে তেড়ে মারতে আসবে।

এমন সময় একটা রিক্সাওয়ালা এল।

—বাবু, কাঁহা যাইয়ে গা ?

—ধর্মতলা যাবো, কত নিবি ?

বেটারা যা হেঁকে বসে তাতে কথা বলা যায় না ! শেষ পর্যন্ত আট আনায় রফা হলো। বৌবাজার পর্যন্ত। বৌবাজার থেকে আর একটা রিক্সায় ধর্মতলা। ধর্মতলা থেকে আবার রিক্সা। এই রকম করে পাঁচ খেপ্-এ অফিসের দরজায়। রিক্সায় বসে বসেই হারাধনবাবু দেখে নিচে স্যুটকেসটা খুলে। ভেতরে কাপড়ের থান। খুব দামী থান। অন্ততঃ দশ থান কাপড়। কিছু কম করেও সাত টাকা করে গজ হবে থানের। বেচলে দু'তিনশো টাকার মাল হবে বেকসুর।

আর গুড়টা ? দু'টাকা করে সের হলেও দশ সেরের দাম কুড়ি টাকার মতন। অফিসের গুর্খা দারোয়ানটাও অবাক।

বললে—বাবুজী, এ সব কেয়া হ্যায় ?

হারাধনবাবু, বললে—আরে বাবা, মাল হ্যায় মাল, দেশ সে আতা হ্যায়—

অর্থাৎ দেশ থেকে জিনিস-পত্র নিয়ে আসছে। দেশ থেকে যখন আসছে তখন হাতে তো জিনিস-পত্র থাকবেই।

সেকশানে আসতেই সবাই ধরে বসলো এতখানি থান নিয়ে কী করবে হারাধনবাবু।

তারা বললে—আপনি এত কাপড় কী করবেন মশাই ? আপনি কি বুড়ো বয়েসে কোট প্যাণ্ট পরে সাহেব সাজবেন ?

তা শেষ পর্য্যন্ত তাই হলো। আট টাকা করে গজ দিয়ে সবাই কিনে নিলে। কিন্তু টাকা কেউ নগদ দিলে না। মাইনের দিনেই দেওয়া নিয়ম এসব ব্যাপারে। দশ ইন্‌টু আট টাকা মানে আশি টাকা। একদিনে আশি টাকা শুধু কাপড় বেচেই। আর বাকি রইল গুড় আর স্যুটকেশ।

গুড়টাও খানিকটা বিক্রি হয়ে গেল। তিন টাকা গুড় থেকেও এল। মোট তিরাশি টাকা। তখন বাকি রইল খালি স্যুটকেশটা, আর সের দুএক গুড়। সের দুয়েক গুড় বাড়িতেই খেয়ে নেবে।

সেদিন বাড়িতে গিয়ে বউও অবাক।

অনেক দিন অনেক রকম জিনিস এনেছে কর্তা, কিন্তু পুরোন স্যুটকেশ কখনও আনেনি। এক হাতে স্যুটকেশটা আর এক হাতে গুড়ের নাগরি।

—এ কি, স্যুটকেশ কীসের?

—কিনলুম আমি।

—পুরোন স্যুটকেশ কিনলে?

হারাধনবাবু, বললে—পুরোন স্যুটকেশ হলে কী হবে? জিনিস-পত্র রাখবার জায়গা ছিল না, তাই কিনলাম।

—কত নিলে?

—তিন টাকা। কত সস্তায় পেলুম বলতো! তিন টাকায় আটাশ ইঞ্চি স্যুটকেশ কেউ পাবে? নতুন একটা স্যুটকেশের দাম কত জানো? চল্লিশ টাকার কমে কেউ ছাড়বে না—পুরোন স্যুটকেশ হলে ক্ষতিটা কীসের? বাইরে কেউ জানতে পারছে না তো যে স্যুটকেশটা পুরোন—

বউ যেন কিছুটা বললো। বললে—তা ঐ গুড়? গুড়টা কত নিলে?

হারাধনবাবু, বললে—গুড়ের কথা আর বোল না। এখন নলেন গুড় কোথায় পাবে লোকে? চেখেই কাড়াকাড়ি করে দিলে সবাই। অফিসে একসঙ্গে কাজ করতে হয়, 'না' বলি কেমন করে?

বউ গুড়ের নাগরিটা খুলে ভালো করে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো। নাক কাছে নিয়ে গিয়ে গন্ধ শুঁকলো। তারপর বললে—আহা, বেশ গন্ধ—

কিন্তু দিন তো কারো বসে থাকে না। হারাধনবাবুর দিনও বসে রইল না। দিন বেড়ে চললো, পৃথিবীও এগিয়ে চললো হারাধন-বাবুর সংসার তখন বেড়ে গেছে। ছেলে-মেয়ে হয়ে সংসারের ঝামেলাও তখন বেড়ে গেছে। বউএর সময় নেই। সবগুলোর পেটের খোরাকের ব্যবস্থা করতে বউ নাজেহাল।

যখন মেজাজ ভালো থাকে না তখন যত চাপ পড়ে হারাধনবাবুর,

ওপর। আর হারাধনবাবুর ওপর ছাড়া কার ওপরেই বা চাপ পড়বে।

রাগের ওপর বলে ফেলে—আমি আর পারবো না সংসার করতে। সংসার তোমার রইল, আমি যে-দিকে দু'চোখ যায় চলে যাবো—

হারাধনবাবু বলে—তা যাবে তো, কিন্তু সেখানে গিয়ে খাবে কী?

বউ-এর তখন মাথা গরম। বললে—কচু খাবো ঘেঁচু খাবো—

হারাধনবাবু হো-হো করে হেসে ওঠে।

বললে—কচু ঘেঁচু তো খাবে, কিন্তু অসুখ হলে তখন কী করবে? তখন কে ডাক্তার দেখাবে? ডাক্তারের টাকা কে দেবে?

বউ রেগে যায়। বলে—তুমি আর হেসো না। তোমার হাসি শুনলে আমার গা জ্বলে যায়, কোনও কাজে-কম্মে নেই, কেবল কথা!

হারাধনবাবু বললে—তা আমি কী করবো বলো? আমি তো আপিস কামাই করতে পারি না তাবলে? তুমি তো অফিসে কাজ করোনি কখনও। কাজ করলে বুঝতে আমার কত জ্বালা। বাড়িতে যেমন তোমার জ্বালা, তেমনি জ্বালা আমার আপিসে—

—রাখো তোমার আপিস। বাপের জন্মে আমি অমন আপিস দেখিনি। এই তো এ দেশে কত লোক আপিসে কাজ করে, কে তোমার মত এত সকালে আপিসে যায়? তোমার কি ছুটি বলেও একটা জিনিস নেই। মুখপোড়ার আপিসে কি ছুটিও দিতে নেই? এত আপিস থাকতে ও আপিসে ঢুকলে কেন? অন্য আপিসে ঢুকতে পারলে না?

কথাটা বউ মন্দ বলেনি। শুধু বউ কেন, ও-কথা অনেকেই বলে।

সবাই বলে—এ তোমাদের কী রকম আপিস হে? ছুটি নেই?

হারাধনবাবু বলে—রেলের আপিস যে, ছুটি হলে রেল চলে? রেলের আবার ছুটি কী? শ্মশানে যাদের চাকরি তাদের কি ছুটি আছে?

বাইরেয় যা-ই জানুক, ছুটি হলে কি হারাধনবাবুই বাঁচতো? ছুটি মানেই তো লোকসান। দিন গেলে বাড়ি কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে এতগুলো লোক খেতে, এতে শুধু শুখো মাইনেতে কি পেট ভরে?

এসব কথা মেয়েমানুষে বুঝবে না। মেয়েমানুষ শুধু হাঁড়ি-কুড়ি ঠেলতেই জানে। কত ধানে যে কত চাল তো জানে না ওরা, শুধু মুখ-ঝামটাই দিতে পারে। মাইনের টাকা তো সাতদিনের মধ্যেই ফরসা। তার পরে বাকি মাসটা চলে কী করে?

তা বলুক তো, ও-রকম কত লোকে কত কী বলবে, তা নিয়ে মাথা ঘামালে চলে? বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো।

কিন্তু যত দিন যায় ততই যেন শরীরে ক্লান্তি লাগে। আগেকার মত শরীরে আর জোর পায় না হারাধনবাবু, ভোরবেলা উঠতে হয় সকাল-সকাল ট্রেন ধরবার জন্যে। তার আগে বাজার করা আছে, চান করা আছে। তারপর এতখানি রাস্তা! খেয়ে উঠে জোরে জোরে হাঁটতে গেলে হাঁপ ধরে।

তবু নেশার ঘোরে যেটুকু ঘোরা। মাতালের মতন বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে। তখন মাথাটা ভোঁ-ভোঁ করে। মাথার ওপর সূর্যটা টা টা করে। কিন্তু তবু শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। সোজা ইষ্টিশানের দিকে হেঁটে যায়।

চেকারবাবু তারপর থেকে চিনতে পারতো।

—কী হারাধনবাবু, চলেছেন?

শুধু ওইটুকু কথা। হারাধনবাবুও নমস্কার করতো—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই দিনগত পাপক্ষয়—

তারপরে যথারীতি ট্রেন। আর ট্রেনে উঠেই সেই এককোণে বসে ঘুম। তা শেষকালের দিকে আর তেমন ঘুম আসতো না। চোখ বুজে পড়ে থাকতো ঘাপটি মেরে। একটু ঘুম হলে তবু কিছুটা শান্তি হতো। কিন্তু তা আর হবার নয়।

একদিন রেলের ডাক্তারখানায় গিয়ে হাজির হলো।

বুড়ো কম্পাউণ্ডার বললে—কী হয়েছে?

হারাধনবাবু বললে—ডাক্তারবাবুকে একবার দেখাবো?

—কার অসুখ? আপনার না ছেলে-মেয়ের?

—আমার।

—ভেতরে যান—

ভেতরে ডাক্তারবাবু বড় ব্যস্ত তখন। দশটা রুগী ঘিরে রয়েছে তখন তাকে। একটার হাতের নাড়ি টিপে রয়েছে, অন্যটার জিভ পরীক্ষা করছে। সেই অবস্থাতেই হারাধনবাবুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী অসুখ?

হারাধনবাবু বললে—আজ্ঞে ঘুম হয় না—

ডাক্তারবাবুর অত সময় নেই যে সকলের সব কথা মন দিয়ে শোনে, রেলের চাকরি ডাক্তারবাবুর। রোগী মরলো কি বাঁচলো তার

দায়-দায়িত্ব ডাক্তারের নয়। তার চাকরি বজায় থাকলেই হলো। রোগী মরলেও তার চাকরি থাকবে। তার চেয়ে বরং বাড়িতে কল্ দাও, আমি ফিস্ নিয়ে ভালো করে মন দিয়ে রোগী দেখে আসবো।

খানিক পরে ডাক্তারবাবু আর কথা বললে না। অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। হারাধনবাবু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর ডাক্তারবাবু খাতায় কী যেন লিখলে। তারপর একটা কাগজ লিখে দিলে এগিয়ে। হারাধনবাবু কাগজটা নিয়ে কম্পাউণ্ডারবাবুর কাছে দিলে।

বললে—কী লিখে দিলে মশাই ঘষ্ ঘষ্ করে, দেখুন তো—

কম্পাউণ্ডারেরও কাজের শেষ নেই। এক হাতে ওষুধ দিচ্ছে আর মুখে দু'একটা কথা বলছে।

বললে—হবে হবে, অসুখ ভালো হবে—

হারাধনবাবু জিজ্ঞেস করলে—ঘুম হবে?

কম্পাউণ্ডারবাবু বললে—ডাক্তারবাবু যখন বলেছে তখন তো হবেই—

ওষুধটা নিয়ে হারাধনবাবু চলে এলো। কিন্তু সন্দেহ হলো একটু। ভালো করে দেখলে না ডাক্তার, এ ওষুধে কি কাজ হবে?

রাত্রে ওষুধটা খেয়ে বেশ চোখ বুঁজে খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল।

বললে—কী হলো, আজকে কথা বলছো না যে?

হারাধনবাবু বললে—ঘুমের ওষুধ খেয়েছি, তাই ঘুমোতে চেষ্টা করছি—

এর পর আর কোনও কথা হলো না। একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব শুধু এল ঘণ্টা দুএকের জন্যে। তারপর শেষ রাত্রের দিকে আবার যে-কে সেই। আর ঘুম এলো না চোখ দু'টো অন্ধকারের মধ্যেই খুলে রাখলে। আর মাথার মধ্যে যত রাজ্যের চিন্তা। দুটো ভগবানের নাম নয়, চাকরির চিন্তা নয়। কেবল মনে হতে লাগলো লোক্যাল ট্রেন ঝিক্-ঝিক্ করে চলেছে। আর প্যাসেঞ্জারে ভরে গেছে সারা কামরাটা। আর হারাধনবাবু যেন চোখ পিট্-পিট্ করে বেঞ্চির তলাগুলো দেখছে, বাঙ্কের মাথাগুলো দেখছে।

কিন্তু আর বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারলে না।

পাশের বউকে ঠেলতে লাগলো—ওগো, ওঠো-ওঠো—

বউ ধড়মড় করে উঠলো। চারদিকে চেয়ে দেখলে। অন্ধকার

তখনও ভালো করে কাটেনি।

বললে—এত রাতে ডাকছো কেন?

হারাধনবাবু বললে—রাত কোথায়? ভোর হয়ে গেছে—

—ভোর? তবে এত অন্ধকার কেন?

হারাধনবাবু বললে—মেঘ করেছে হয়ত। ওঠো ওঠো, আজকে ভোরের লোকাল ধরতে হবে—

আর দেরী করলে না তরলা। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। উঠেই হাজারটা কাজের তাড়া। কাজগুলো যেন বাঘের মত সামনে হাঁ করে থাকে। কোন্ কাজটা ফেলে কোন কাজটা করবে সেইটেই হলো এবার আসল সমস্যা। আগের দিনের এঁটো বাসন সেগুলো পুকুরে গিয়ে মেজে আসতে হবে। তারপর উনুনে আগুন দেওয়া। চাল ধোওয়া, তরকারি কোটা। ততক্ষণে ছেলে-মেয়েগুলো ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। তাদের চ্যাঁ-ভ্যাঁ। তখন আর নিঃশ্বেস ফেলবার সময় থাকে না তার।

ওদিকে হারাধনবাবুর, তাগাদা কী গো, ভাত হলো?

কিন্তু সেদিন এক কাণ্ড হলো।

হঠাৎ বাড়ির সদর দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

—কে?

শিবানী দৌড়ে গেল। দরজা খুলতেই দেখলে—কে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে অচেনা লোক।

—আপনি কাকে খুঁজছেন?

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলে—এটা হারাধনবাবুর বাড়ি তো?

—হ্যাঁ।

—তুমি তার মেয়ে বুঝি?

—হ্যাঁ।

—তা তোমার বাবা কেমন আছেন?

শিবানী বললে—বাবা তো কলকাতায় গেছে।

—কলকাতায় মানে? আপিসে?

—হ্যাঁ। ভোর বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেল। বললে—কিন্তু আমি তো আপিস থেকেই আসছি। আজ তিন-দিন থেকে তো তোমার বাবা আপিসে যাচ্ছে না, আমি ভাবলাম অসুখ-বিসুখ হলো কিনা দেখতে এলুম—

শিবানীও অবাক ভদ্রলোকের কথা শুনে।

বললে—বাবার অসুখ কেন হতে যাবে। বাবা তো বেশ ভালো আছে—রোজ আপিসে যায়—

—আশ্চর্য্য তো!

ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—অফিসে আমাদের সবাই ভাবছে হারাধনবাবুর, জন্যে। একটা খবর পর্য্যন্ত দেয় নি। আমি এদিকে একবার এসেছিলুম তাই খবর নিয়ে গেলুম আর কি—

ভদ্রলোক খানিকটা অবাক হয়ে চলে গেল।

তরলা পেছন থেকে কথাগুলো শুনছিল। অবাক সেও হলো। তবে যে বলে অফিসে খুব কাজ, অফিসে না গেলে বড়বাবু বকাবকি করবে। তাহলে অফিসে না গিয়ে কোথায় যায় মানুষটা?

কিন্তু রাত যখন দশটা বেজে গেছে তখন হারাধনবাবু, হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির। হাতে বিরাট একটা বোঝা।

তরলা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো হারাধনবাবুর মুখের দিকে।

হারাধনবাবু হাতের বোঝাটা নামিয়ে বললে—উঃ, আজকে আপিসে যা খাটনি গেছে, খেটে খেটে একেবারে মরে গিয়েছি—

তারপর একটু হেসে বললে—দাও, এক গেলাস জল দাও—

তরলা রান্নাঘর থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে এসে দিলে।

ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়ে নিয়ে খালি গ্লাসটা আবার বউএর হাতে ফেরত দিল।

বললে—কী রেঁধেছ আজকে? এই দেখ কী এনেছি—

বলে হাতের বোঝাটার দড়ি খুলতে লাগলো। দড়ি খুলতেই একগাদা বেগুন উঁকি মারতে লাগলো। তা প্রায় সের দশেক বেগুন হবে।

বেগুনগুলো দেখে হারাধনবাবুর, নিজের চোখই চক্ চক্ করে উঠলো।

বললে—দেখেছ কী চমৎকার বেগুন? এখানে একটাকার কমে কিলো দেবে না এরা। সস্তায় পেলুম তাই নিয়ে এলুম। কত করে নিয়েছি বলো তো? বলে বউএর মুখের দিকে চাইলে।

বউএর কিন্তু তখনও মুখ ভার।

কীরকম যেন মনে হলো হারাধনবাবুর। এ-রকম তো করেনা

কখনও তরলা। অন্যদিন কিছু আনলে নাড়া-চাড়া করে, দর জিজ্ঞেস করে। কখনও বা বকুনিও দেয়। কিন্তু আজ কিছুই বলছে না।

কিন্তু বেশিক্ষণ আর চাইলেন না বউএর মুখের দিকে।

বেগুনগুলো তুলতে তুলতে বলতে লাগলো—একেবারে কচি ফুল, জানো? এ বেগুন ভাজা খেতে খুব ভালো লাগবে, বেশ আলগা তেলে একখানা করে ভাজবে আর একখানা করে লুচি ভেজে দেবে, তবে খেতে ভালো লাগবে। আর সেসব দিনও নেই, সে সব খাওয়ায় নেই। এখন যত সব চালানি বেগুন, তার না আছে সোয়াদ না আছে—

তরলা কথার মাঝখানেই বাধা দিল।

বললে—তুমি থামো!

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। সোজা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। হারাধনবাবু অবাক। এ কী হলো। এমন তো হয় না। অন্য দিন যখন জিনিস-পত্তর নিয়ে আসে তখন তরলা সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। পছন্দমত জিনিস হলে খুশী হয়। আজ তো সে-রকম হলো না।

তরলা তখন রান্নাঘরে থালায় ভাত বাড়ছিল।

হারাধনবাবু সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী হলো তোমার? শরীর খারাপ নাকি?

তরলা সে-কথার উত্তর না দিয়ে ভাতের থালাটা নিয়ে সোজা এসে মেঝের ওপর ঠক্ করে রেখে দিল। যেন মেঝের উপর রাখলে না তরলা, হারাধনবাবুর কপালের ওপর রাখল। বুড়ো মানুষ হয়েছে হারাধনবাবু। শব্দ হলে মেজাজও বিগড়ে যায় আজকাল।

বললে—কী হলো কী তোমার?

তরলা বললে—কিছু হয়নি। হবে আবার কী? আর আমার যদি কিছু হয়ই তো তোমার কী? তুমি কেবল তোমার আলু-বেগুন-পটোল নিয়েই থাকো। আমি যখন মরবো তখন ওই আলু-বেগুন-পটোল দিয়ে আমাকে পুড়িও—

মুখের খাওয়া মুখেই রইলো। হারাধনবাবু যেন বিষ খাচ্ছে মনে হলো।

বললে—কী হলো বলো দিকিনি তোমার? আমি মরে মরে সংসারের জন্যে সাশ্রয় করবার চেষ্টা করছি, আর আমাকে কিনা ওই

কথা বলছো ? আমি তাহলে কার জন্যে খাটছি ? আমার জন্যে ? আমার নিজের জন্যে ?

এবার তরলাও গলা চড়িয়ে দিলে।

বললে—তাহলে রোজ কোথায় যাও শুনি ? আপিসে যাবার নাম করে কোথায় যাও শুনি ?

হারাধনবাবু বললে—কোথায় আবার যাই। অফিসে যাই। সংসারের পিণ্ডি গেলাবার জন্যে অফিসে যেতে হবেনা ?

তরলা বললে—বুকে হাত দিয়ে তুমি বলতে পারো যে আপিসে যাও তুমি ? আমাকে মেয়েমানুষ পেয়ে তুমি যা বলবে তাই আমি বিশ্বাস করবো ভেবেছ ?

তার মানে ?

তরলা বললে—তুমি আর কথা বোল না। তোমার জারি জুরি সব আমি চিনে নিয়েচি। আমার মরণ হলে বাঁচি। আমাকে আলু-বেগুন দিয়ে ভোলালে আর ভুলছি নে—

বলে সেখান থেকে বেরিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল।

—খাওয়া আর হলো না। উঠলো পিঁড়ি ছেড়ে। বউ-এর কাছে গিয়ে বললে—তোমার জ্বালায় আমি তো আর থাকতে পারছি না। শেষে কি আমি বিবাগী হয়ে যাবো বলতে চাও ?

তরলা বললে—চেঁচিয়ো না। ছেলে-মেয়ে ঘুমোচ্ছে, চেঁচিয়ে আর কেলেঙ্কারি কোর না।

হারাধনবাবু এবার গলা নিচু করলো।

বললে—কী হয়েছে বলো তো সত্যি করে ? তোমাদের জন্য আমি এত খেটে মরছি আর তুমিই কিনা বেঁকে বসলে। একেই বলে—যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।

তরলা উঠলো বিছানা থেকে।

উঠে ঘরের বাইরে এলো। বললে—তুমি আপিসে যাও কিনা সত্যি করে বলো তো ?

—বললে—অফিসে যাই না কোথায় যাই ?

—তাহলে তোমাদের আপিস থেকে আজ লোক এসে অন্য কথা বলে গেল কেন ? সে লোকটা কি মিথ্যে কথা বলে গেল বলতে চাও ?

—মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো। বললে—আমাদের অফিস থেকে লোক এসেছিল ? কে এসেছিল ? কেন এসেছিল ? নাম কী

তার ? কী বলে গেল সে ?

তরলা বললে—এতদিনে বুঝেছি তোমার এতদিনকার কথা সব মিথ্যে। তুমি কোথায় যাও বলো দিকিনি সত্যি করে ?

হারাধনবাবু বললে—কোথা থেকে কে এসে কী বলে গেল আর তুমিও তাই বিশ্বাস করলে ? আমি অফিস যাইনি তো কোথায় গিয়েছিলুম ?

—কোথায় যাও তা তুমিই জানো।

—অফিসে যদি না-যাই তো মাসে মাসে টাকা আসে কোত্থেকে ? এই যে আলু-বেগুন-পটোল-গুড়-জুতো-জামা, এসব কোত্থেকে হচ্ছে ? কোত্থেকে এতগুলো পেট চলছে ?

তরলা বললে—আমি অত-শত জানিনে বাপু, লোকটা আমাকে যা বলে গেল তাই বললুম। এখন তোমার যা-খুশী তাই করো। আমি আর পারছিনে, আমার ঘুম পাচ্ছে। সারাদিন খেটে-খুটে তোমার সাথে আর বক্ বক্ করতে পারি নে।

বলে তরলা চলে গেল। আর কোনও কথা বললে না। হারাধনবাবুও আর কিছু না বলে নিজেও শুতে গেল। কিন্তু মনে কাঁটার মত বিঁধতে লাগলো কথাগুলো। অফিস থেকে কে এসেছিল তার বাড়িতে।

সেদিন অফিসে যেতেই সবাই ছেঁকে ধরলে।

—কোথায় ছিলেন এতদিন হারাধনবাবু ? কী হয়েছিল ?

হারাধনবাবু বললে—আরে ভাই, শরীর খারাপ হলে কী করবো ? শরীর তো আমার হাতে নয়!

আমি বললুম—কিন্তু অবিনাশবাবু যে আপনার বাড়িতে গিয়েছিলেন, তিনি বললেন আপনি বাড়িতে নেই, আপনার মেয়ে যে বলেছে—দেখ দিকিনি কাণ্ড! মেয়ে জানবে কী করে আমি কোথায় গেছি ? আমি তো সকাল বেলায় বেরিয়ে গেছি ডাক্তারের কাছে।

অবিনাশবাবুকে ডাকা হলো সঙ্গে সঙ্গে। হারাধনবাবু বললে—তুমি কী হে ? বলা নেই কওয়া নেই, সেই রাণাঘাটে গিয়ে হাজির হলে ? সেই যদি গেলে তো বিকেলবেলার দিকে গেলে না কেন ? দেখতে আমি চিৎপাত হয়ে আছি।

তা হতে পারে। কথাটা যুক্তিসঙ্গত। হারাধনবাবুর কথায় সবাই চুপ করে গেল।

হারাধনবাবু আর কোনও কথা না বলে র‍্যাক্ থেকে ফাইল পেরে নিয়ে হস্ত-দস্ত হয়ে, কাজ আরম্ভ করে দিলে। যত সব লোকের ভিড় হয়েছে অফিসে।

আমি টিফিনের সময় কাছে যেতেই দেখি হারাধনবাবু এক মনে ফাইল নিয়ে ব্যস্ত।

বললুম—খুব মন দিয়ে কাজ করছেন দেখছি।

হারাধনবাবু কাজ করতে করতে মুখ না তুলে বললে—না ভাই, তুমি আর আমার কাছে এসো না। তোমাদের সকলকে চিনে নিয়েছি আমি। তোমরা আমার পেছনে স্পাই লাগিয়েছ বুঝতে পারছি। তোমাদের সঙ্গে ভাই আমার সমস্ত সম্পর্ক কাট্-অফ্ হয়ে গেল আজ থেকে—এই বলে রাখলুম। এ সংসারে কেউ কারো নয়, এইটে সার জেনে নিয়েছি।

দেখলুম হারাধনবাবুর মুখটা অন্যদিনের চেয়ে একটু ভার-ভার।

এরপর একদিন রিটায়ার করবার দিন এল। যেদিন শেষ অফিসে এল সেদিন আর কোনও কাজকর্ম নয়। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা, গ্রাচুইটি, এই সব নিয়েই ব্যস্ত রইল সারাদিন। এসট্যাবলিশমেণ্ট সেকশানেই তার সমস্ত দিন কেটে গেল। এতদিনকার অফিস, এখানে আসা চিরকালের মত বন্ধ হলো।

যখন বেলা পাঁচটা বাজে-বাজে তখন এল বড়বাবুর কাছে। বললে —যাই বড়বাবু—

বড়বাবু তখন বিপিনবাবু। তিনি চাইলেন হারাধনবাবুর দিকে। বললেন—তাহলে চললেন?

হারাধনবাবু বললে—চলি। অফিস যখন এক্সটেনশান দেবেনা তখন আর উপায় কী বড়বাবু? আপনাদের অনেক জ্বালিয়েছি। বরাবর লেট্ করে অফিসে এসেছি। কত ফাইল নিয়েছি তারও ঠিক নেই। সেই বিনয়বাবু একদিন চাকরি দিয়েছিলেন, তারপর থেকেই এতকাল এক চেয়ারে বসে কাটালুম। আর দেখতে দেখতে দিন ফুরিয়ে গেল। মনে হচ্ছে যেন এই সেদিনের ব্যাপার।

বিপিনবাবু শেষকালে বললেন—এবার বাড়িতে বসে আরাম করুন গে—

—আরাম আমার কপালে নেই বড়বাবু। দুটো মেয়ে গলায় ঝুলছে, ছেলেটাও নাবালক, আরাম করলে কি চলে আমার?

বলে সকলকে নমস্কার করলে হারাধনবাবু। তারপর ঝোলাটা নিয়ে হন্-হন্ করে সেকশানের বাইরে চলে গেল। সামনেই বাসের রাস্তা। একটা বাস আসতেই তার ভেতরে উঠে পড়লো। সেখান থেকে সোজা ধর্মতলায় বাস বদলে একেবারে শেয়ালদা।

তারপর আমাদের সঙ্গে হারাধনবাবুর সমস্ত সম্পর্ক শেষ।

সম্পর্ক শেষ বটে—কিন্তু কাহিনীর শেষ নয়। এ-কাহিনী যে আবার অন্য পথে মোড় ঘুরবে তা আমরাও জানতাম না।

সামন্তবাবু এসেই খবরটা আমাদের প্রথম দিলে। বললে—আরে আমি যাচ্ছিলুম খড়দায় আমার শালীর বাড়ি। ট্রেনে দেখি আমাদের হারাধনবাবু। হাতে সেই ছাতা আর ঝোলা। সেই এক চেহারা প্রথমে তো বিশ্বাস হয়নি। উইক-ডেতে কোথায় চলেছে। আমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—হারাধনবাবু না?

হারাধনবাবু আমাকে দেখে চমকে উঠেছে! বললে—সামন্ত?

আমি বললুম—আপনি যে আবার ঝোলা নিয়ে বেরিয়েছেন? আপনি তো রিটায়ার করে অফিস থেকে চলে এলেন। প্রভিডেণ্ট্ ফাণ্ড্ গ্রাচুইটি সব কিছু চুকিয়ে নিলেন। এর পরেও বেরিয়েছেন?

হারাধনবাবু যেন লজ্জায় পড়ে গেল। সামলে নিয়ে বললে—কিন্তু তোমার অফিস নেই? তুমি কোথায় যাচ্ছো?

আমি বললুম—আমি অফিস থেকে একদিনের ছুটি নিয়েছি, যাচ্ছি খড়দায় শালীর বাড়িতে। কিন্তু আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—আমি?

কী-রকম যেন একটু ঘাবড়ে গেল। বললে—আমি? আমি যাচ্ছি একবার এই এদিকে। সামনের ষ্টেশনে একটা কাজ আছে। তা তোমাদের সব খবর ভালো? বিপিনবাবু কেমন আছেন? আর রামলিদমবাবু? কাজকর্ম সব ভালো চল্‌ছে-টল্‌ছে তো? আর ভাই, আমি তো রিটায়ার করে বসে আছি, এখন আমাদের দিন কাল তো ফুরিয়ে গেল···

বলতে বলতে একটা ষ্টেশন এসে গেল। হারাধনবাবু আর দেরি করলে না। হন্তদন্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ট্রেন থেকে নেমে গেল।

সামন্তবাবুর কাছ থেকে খবর পাবার পরও অতটা বিশ্বাস হয়নি। বিশ্বাস হলো আরো কয়েকজনের কাছ থেকে শোনবার পর। কেউ

না কেউ ঠিক ওই অবস্থাতেই দেখেছে হারাধনবাবুকে। পরিতোষবাবু দেখেছে, কান্তিবাবু দেখেছে। সকলেরই ওই এক কথা। হাতে ছাতা আর ঝোলা। ট্রেনের মধ্যে এক কোণে বসে থাকা সেই চেহারা।

ষ্টেশনের প্লাটফরমের ধারে একদিন টিকিট কালেক্টার ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা।

বললে—এ কি হারাধনবাবু, আপনি যে এখন অফিস যাচ্ছেন? আমি যে শুনলুম আপনি রিটায়ার করেছেন?

হারাধনবাবুর ট্রেন তখন ছাড়ো-ছাড়ো। কথা বলবার সময় নেই। বললে—না, রিটায়ার আর করলুম কোথায়? আবার এক্সটেনশান দিলে সাহেব, ছাড়লে না কিছুতেই। সাহেব বললে—হারাধন, আরো কিছুদিন কাজ চালিয়ে দাও তুমি, তুমি চলে গেলে অফিসের কাজকর্ম চলবে না। তা ভাবলুম সাহেব অত করে বলছে, যাই।

বলে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গিয়ে ট্রেন ধরে।

তারপর শেয়ালদা ষ্টেশনে নেমে কোনও দিন যেত ব্যাণ্ডেল. কোনও দিন খড়দা, কোনও দিন বজ্‌বজ্, কোনও ঠিক নেই। যখন যে ট্রেনে পারতো উঠে পড়তো। সঙ্গে সেই ছাতা আর ঝোলা। তারপর ট্রেনে উঠেই একটা কোণ দেখে বসে পড়তো।

একদিন তরলা আর পারলে না। বললে—পুজোর ছুটির দিনেও তা বলে তোমার আপিস? তুমি আমাকে মেয়েমানুষ পেয়ে ভেবেছ যা বোঝাবে আমি তাই বুঝবো?

হারাধনবাবু বললে—তুমি মেয়েমানুষ, যা বোঝনা তা নিয়ে কথা বোল না। ছুটি বলে কি রেল চলবে না? পুজো বলে কি অফিসের কাজ থাকবে না? কী যে বলো তুমি তার ঠিক নেই। আমি অফিসে না গেলে চলে?

—তা হলে বিয়ে করেছিলে কেন? বিয়ে না করে আপিস নিয়ে থাকলেই পারতে?

হারাধনবাবু তখন রেগে গেছে খুব। আর দাঁড়ালো না। তাড়াতাড়ি ছাতি আর ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। যাবার সময় শুধু বউ-এর দিকে চেয়ে হাত নেড়ে বললে—ওই তোমাকে বিয়ে করাটাই আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল।

বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। আর কোনও দিকে তাকালো না। সামনের একটা ট্রেন দেখতে পেয়েই উঠে পড়েছে হারাধনবাবু।

তারপরে সেখান থেকে শেয়ালদা। শেয়ালদা ষ্টেশনে এসে একবার ভেবে নিলে কোথায় কোন্‌দিকে যাবে ? মান্থলি টিকিট ছিল রাণাঘাট থেকে শুধু শেয়ালদা পর্যন্ত। কিন্তু তাতে তার কোনও অসুবিধে নেই ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের চেহারা দেখলেই টিকিট কালেক্টাররা বুঝতে পারে। কোথায় খড়দা, বোলপুর, ব্যাণ্ডেল লোক্যাল ট্রেন তাতে উঠে পড়ে হারাধনবাবু।

পুজোর ছুটি চলছে। সকলেরই খুশী-খুশী ভাব যেন। অনেক মাল-পত্র নিয়ে চলেছে। এ-সব টাইম হারাধনবাবুর মওকার টাইম। কার মাল কোথায় কে রাখলে সেই দিকেই নজর হারাধনবাবুর, আজ যেন হারাধনবাবুর আর তর্ সইছে না। আর কোনও ভাবনা নেই। প্রভিডেণ্ট্ ফাণ্ডের টাকাগুলো পোষ্টাফিসের ব্রাঞ্চে রেখে দিয়েছে। কেউ জানতে পারেনি। ওদিকে বয়েসও হয়ে যাচ্ছে। শিগ্‌গির শিগগির কাজগুলো গুছিয়ে নিতে হবে সব। দুটো মেয়ে। দুটো মেয়ের বিয়ে দিলেই সব দায়িত্ব শেষ। তারপর ? তারপর পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আরাম করবে। আর আগেকার মত শক্তিও নেই। এখন ট্রেনে ট্রেনে ঘুরতে কষ্ট হয়।

ট্রেন চলেছে। প্যাসেঞ্জাররা কেউ উঠছে কেউ নামছে। একবার বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে হারাধনবাবু। কোন্ ষ্টেশন এলো ? নামটা পড়া গেল না। যাকগে মরুক গে। যে ষ্টেশনই আসুক, তাতে তার কী এসে যায় ? যেখানে হোক গিয়ে থামলেই হলো। আর যদি কোথাও গিয়ে রাত হয়ে যায় তো ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে পড়ে থাকলেই হলো। আর ওয়েটিং-রুম না থাক ষ্টেশনের বেঞ্চি তো আছে। বেঞ্চি জোড়া থাকে তো প্লাটফরমের সিমেণ্ট বাঁধানো মেঝের ওপর থলিটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লেই হলো। খোলা আকাশের নিচে বেশ আকাশের তারা দেখতে দেখতে ঘুমোও। আর, বৃষ্টি পড়লে শেড্ আছে। শেডের তলায় গিয়ে শোও। চোর ডাকাত এলেও কোনও ভয় নেই হারাধনবাবুর। পয়সা কড়ির বালাই থাকে না হারাধনবাবুর কাছে। থাকবার মধ্যে কয়েক আনা খুচরো পয়সা থাকে কাছে। আর কিছুই থাকে না সঙ্গে। তারপর ভোরবেলা যদি ট্রেন থাকে তো সেই ট্রেনেই উঠে আবার শেয়ালদা ষ্টেশনে আসা। এবার শেয়ালদা ষ্টেশনে আসতে পারলেই একেবারে নিশ্চিন্ত। শেয়ালদা ষ্টেশনে বাড়ির চেয়েও বেশি আরাম। কল্-পায়খানা জল

খাবার কিছুরই অভাব নেই। যেমন করে উদ্বাস্তুরা রয়েছে তেমনি করে তাদের সঙ্গে মিশে গেলেই হলো। তখন তোমাদের মত আমিও উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তুদের যখন খাবার দিতে আসে লোকেরা, তখন হারাধন-বাবুও তাদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে। কোনও দিন দুধ-পাঁউরুটি, কোনও দিন খিচুড়ি, কোনও দিন বা অন্য কিছু। কিন্তু যা দেয় তারা, তাতে পেটটা বেশ ভরে যায়। বাড়ির চেয়ে বেশি আরাম শেয়ালদা ষ্টেশনে।

তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার একটা ট্রেনে উঠে বসে। যখন বাড়িতে ফেরে তখন তরলা ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে।

বলে—তুমি কী বলো দিকিনি? কোথায় ছিলে এ্যাদ্দিন? একটা খবর পর্যন্ত দাওনি, আমি ভয়ে একেবারে আধমরা—ষষ্ঠি পুজোর দিনে তুমি আমাকে কী ভাবিয়ে তুলেছিলে বলো তো?

হারাধনবাবু খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ করে ওঠে। বলে—খবর আবার দেব কী? অফিসের কাজ পড়লে আমি কী করবো? অফিসের কাজ আগে, না বাড়ি আগে? অফিস আছে বলে তবু তো তোমরা দুবেলা খেতে পাচ্ছো। অফিস না থাকলে কী হতো বলো দিকিনি? ওই জন্যেই তো বলে মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ কি আর গাছে ফলে?

কিন্তু সর্বনাশটা বড় হঠাৎ এলো।

সর্বনাশ বোধহয় সকলের জীবনে হঠাৎই আসে। নইলে আমরা তো সবাই আমাদের জীবন-যাত্রা নিয়েই ব্যস্ত। কেউ তো কারো খবর রাখি না। আমরা মনে করি এমনি করেই বুঝি সব চলবে। চিরকাল এমনি করেই আমরা টাকা সংগ্রহ করবো, সুখ সংগ্রহ করবো, সংসার পরিচালনা করবো। আমাদের বুঝি আর কখনও শেষ হতে নেই, আমাদের বুঝি আর কোনওদিন সর্বনাশও হতে নেই।

পরিতোষবাবুই খবরটা আনলে প্রথমে। সে চাক্‌দায় থাকে। অফিসে এসেই দৌড়ে আমাদের সেকশানে এসেছে।

—শুনেছেন? হারাধনবাবু মারা গেছে!

থমকে গেলাম খবরটা শুনে। মুখ দিয়ে একটা 'আহা' শব্দ বারু

করতেও ভুলে গেলাম। অনেকদিনের পরিচিত মানুষ। কিন্তু শেষ তো একদিন সকলেরই হবে। আমরাই কি অশেষ! কিন্তু তা বলে ওই রকম মৃত্যু?

পরিতোষবাবু বললে—বেলুড়ে একটা ট্রেনের মধ্যে তার ডেড্‌বডি পাওয়া গেছে—

—তারপর?

খানিকক্ষণ কারোর মুখেই আমাদের কোনও কথা বেরুল না। এমনও হয়! এও তো এক রকমের নেশা!

পরিতোষবাবু বলতে লাগলো—তারপর খবরটা শুনে গেলাম হারাধনবাবুর বাড়িতে। ছেলে-মেয়েরা খুব কান্নাকাটি করছে। হারাধনবাবুর বউ-এর সঙ্গেই দেখা করলুম। বউ আমাকে প্রভিডেন্ট্ ফাণ্ডের টাকার কথা জিজ্ঞেস করছিল। আমি তো শুনে অবাক। আমি বললুম—হারাধনবাবু তো অনেকদিন আগে রিটায়ার করেছেন, প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেছে প্রভিডেন্ট্ ফাণ্ডের টাকাকড়ি সব তো নেওয়া হয়ে গেছে—

হারাধনবাবুর বউ আমার কথাগুলো শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—কিন্তু আমরা তো জানতুম না, এই তো পরশুও ভাত খেয়ে আপিসে গেলেন—বললেন আপিসে কাজ আছে।...

আমার কানে তখন সে-কথাগুলো ঢুকছে না। আমার কেবল মনে হচ্ছিল আমরা সবাই-ই তো এক-একজন হারাধনবাবু! ছোটবেলা থেকে সুরু করে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমরা তো সবাই-ই কেবল বিষয়-বস্তু সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছি। কেউ পাপ সংগ্রহ করছি। কেউ পুণ্য সংগ্রহ করছি, কেউ বা আবার চাল-ডাল-গয়না-টাকা-খ্যাতি-প্রতিপত্তি সংগ্রহ করছি। সবাই আমরা ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধে আহরণের জন্যে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হচ্ছি। আমরা তো সবাই-ই এক-একজন মূর্তিমান হারাধনবাবু।

আমার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো হারাধন-বাবুর জন্যে নয়, পড়লো আমারই নিজের জন্যে। এ যেন আমারই ব্যক্তিগত দুঃখ, আমারই ব্যক্তিগত বিষয়।

কিন্তু আসল খবরটা আরও আশ্চর্যের।

পরিতোষবাবু আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এল। বললে—একটা কথা তোমাকে ভাই চুপি চুপি বলি। কাউকে বোল না যেন। হারাধনবাবুর বউটাও শুনলুম নাকি বিয়ে করা বউ নয়—

আমি অবাক হয়ে গেলুম। বললুম—কে বললে?

পরিতোষবাবু বললে—পাড়ার লোকেই বললে। ট্রেনে ঘুরতে ঘুরতেই নাকি কোত্থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। তাকেই ফুল-বেলপাতা আর ধান-দুর্বো দিয়ে বউ করে নিয়েছিল।

কথাটা শুনে আমি খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলুম। তারপর মনে হলো—হারাধনবাবু আর কি এমন অন্যায় করেছে। আমরা সবাই-ই তো তাই। নামেই আমরা কেবল বলি সংসার। কিন্তু এ-সংসারের সবটুকুই তো কুড়িয়ে পাওয়া। কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের পাহাড়।

যখন 'বেগম মেরী বিশ্বাস' লিখি তখন এই গুলজারি বাঈএর কাহিনীটা লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল ও-কাহিনীটার কোথাও তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেব।

নবাবী খান্দানি আদব-কায়দা নিয়ম-কানুন রীতি-প্রকৃতি কয়েক বছর ধরে খুব পড়াশোনা করতে হয়েছিল। বলতে গেলে ওই বইটা লেখবার সময়ে মুসলমানি সংস্কৃতির মধ্যে একেবারে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলুম। গল্পটার জন্যে নয়। গল্পটা তো উপলক্ষ্য মাত্র। আসল হচ্ছে সেই যুগ। বই পড়তে পড়তে যদি সেই যুগের আবহাওয়ার মধ্যে না ডুবে যেতে পারি তো সে বই পড়েও লাভ নেই, লিখেও লাভ নেই।

সেই সময়েই এই গুলজারি বাঈএর ঘটনাটার কথা জানতে পারি।

কলেট সাহেব যখন কাশিমবাজারে এসেছিল তখনও জানতো না গুলজারি বাঈএর কথা। তারিখ-ই-বাঙলা নামে যে ফার্শী বই আছে তাতে সব কথা লেখা আছে, কিন্তু গুলজারি বাঈএর নামের উল্লেখ নেই। বিরাজ-উম্-সালাতিনেও নেই। গোলাম হোসেনও অন্য সব কথা লিখে গেছেন, কিন্তু গুলজারি বাঈএর কথা লিখে যান নি।

কলেট সাহেব কাশিমবাজার কুঠির কর্তা।

ক্যাপটেন ড্রেক সাহেব যখন মাঝে-মাঝে ডেকে পাঠাতো তখন কলেটকে গিয়ে মুর্শিদাবাদের সব রিপোর্ট দিতে হতো।

নবাব আলিবর্দী মারা যাওয়ার পর আরো বেশি করে ডাক পড়তো কলেটের।

ড্রেক জিজ্ঞেস করতো—মুর্শিদাবাদের হাল-চাল কী?

কলেট বলতো—হাল-চাল ভালো নয়, ওমরাওরা বোধহয় রিভোল্ট্ করবে এবার।

—কীসে বুঝলে তুমি রিভোল্ট্ করবে?

কলেট বলতো—সবাই আমাদের কাছে এসে তাই বলছে।

—সবাই মানে কে? কারা।

কলেট বলতো—যারা নবাবের আশে-পাশে ঘোরে, তারাই বলছে।

—কী বলছে তাই বলো ?

কলেট বলতো—ইয়ার-লুৎফ্ খাঁ, একজন বড় মনসব্দার। সে আমাদের দলে আসতে চায়।

—আর কে ?

—মহতাপচাঁদ জগৎশেঠ। নবাবের ব্যাঙ্কার। তারপর আছে নদীয়ার মহারাজা কৃষনচন্দর—

মাঝে মাঝে এই রকম সব খবর দিয়ে আসতো কলেট। কলকাতায় এলেই কলেট বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতো। খানা-পিনা করতো।

কাশিমবাজার আর কলকাতায় অনেক তফাৎ। কলকাতায় এলেই নানা ফুর্তিতে দিন কাটতো কলেটের। ইংরেজদের বড় পেয়ারের বন্ধু ছিল উমিচাঁদ। লোকটা দিলদার মেজাজের। বাড়িতে দিন-রাত এলাহি বান্না চলছে। মোগ্লাই-খানা, ইংরেজী-খানা, হিন্দু-খানা। সব রকম খানা রান্নার বন্দোবস্ত আছে উমিচাঁদের বাড়িতে।

কলেট সেখানেও হাজির হতো।

—কী খবর সাহেব ? মুর্শিদাবাদের হাল-চাল কী ?

উমিচাঁদের বাড়িতে যদি কোম্পানীর কোনও সাহেব আসতো তো লুকিয়ে-চুরিয়ে আসতো। মুর্শিদাবাদের নবাবের বন্ধু উমিচাঁদ। শেষকালে নবাব জানতে পারলে উমিচাঁদ সাহেবেরও বিপদ, কোম্পানীরও বিপদ।

এখানেই আলাপ হয়েছিল ছাব্বিশ বছরের ছেলে ক্যাম্পবেল সাহেবের সঙ্গে।

জন্ ক্যাম্পবেল। এই গল্পের নায়ক।

কবে একদিন কী উদ্দেশ্য নিয়ে ইণ্ডিয়ায় এসেছিল কে জানে!

কলেট জিজ্ঞেস করলে—একে কোত্থেকে জোগাড় করলে উমিচাঁদ সাহেব। কোম্পানীর লোক তো এ নয়।

ক্যাম্পবেল হাসতে লাগলো মিটি-মিটি।

বললে—আমি ডাক্তার—

উমিচাঁদ বললে—আমার পায়ে বাত হয়েছিল, ক্যাম্পবেল এক দাওয়াই দিয়ে সব সারিয়ে দিয়েছে, আমার বাত বিলকুল সেরে গেছে।

—কোত্থেকে ডাক্তারি শিখলে তুমি ? লণ্ডন থেকে ?

ক্যাম্পবেল বললে—আমি লণ্ডনে কখনও যাইনি। পাড়াগাঁয়ের

ছেলে আমি, কেবল জাহাজে-জাহাজে ঘুরে বেড়িয়েছি—

—তাহলে ডাক্তারিটা শিখলে কোথায় ?

ক্যাম্পবেল বললে—লাহোরে। জাহাজে উঠে পড়েছিলুম একদিন ইংলণ্ডের একটা পোর্ট থেকে, তারপরে জাহাজ যেখানে যায়। কিন্তু জাহাজটা আট মাস পরে ইণ্ডিয়ায় এসে পড়লো। আমিও সঙ্গে-সঙ্গে ইণ্ডিয়ায় এলুম। এসেই একেবারে দিল্লী। দিল্লী থেকে লাহোর। সেখানে এক হেকিমের সঙ্গে কিছুদিন ছিলুম—

সত্যিই সেই হেকিমের সঙ্গে থাকতে থাকতেই দেখতে লাগলো কী করে সে দাওয়াই বানায়। ক্যাম্পবেল হেকিমের কথামত হামান্‌দিস্তেতে হরতুকী কোটে, বড়ি বানায়, ওষুধগুলো আবার রোদে দেয়, তারপর সেগুলো পাথরের জারের ভেতরে পুরে রাখে।

কলেট জিজ্ঞেস করলে—তুমি পারা-রোগ সারাতে পারো ?

—পারা-রোগ সারাতে না পারলে কি হেকিমি করা চলে ? নবাব-বাদ্‌শা-ওমরাওদের তো পারা রোগই হয়। পারা রোগ হয়, গর্মিরোগ হয়, সুজাক্‌ হয়, মালেখুল্লিয়া দিমাগী হয়। কত রকম রোগ হয় নবাব বাদশাদের—

—মালেখুল্লিয়া দিমাগী কাকে বলে ?

—ওই আমাদের ইউরোপের সিফিলিসের মত।

—তা তুমি কাশিমবাজারে যাবে ? সেখানে আমাদের কোম্পানীর হাউস্‌ আছে। যাকে ইণ্ডিয়াতে বলে কুঠি।

ক্যাম্পবেল হাসলো। বললে—ইণ্ডিয়ায় যখন একবার এসে পড়েছি, তখন যেখানে বলবে সেখানে যাবো। জাহান্নমে যেতে বললে সেখানেও যাবো। আমি নরকেও যেতে তৈরি।

তা তাই-ই হলো।

উমিচাঁদ বললে—ঠিক আছে, তুমি যাও সাহেব। যখন দরকার পড়বে আমাকে খবর দিও। আমার দরজা তোমার জন্য খোলা পড়ে রইল। আমি থাকি আর না-থাকি তুমি এখানে এসে উঠবে, থাকবে, খাবে, কেউ কিছু আপত্তি করবে না।

উমিচাঁদের চাকর জগমোহনকেও সেইরকম হুকুম হয়ে গেল।

কলেট সেবার অন্যবারের মত একলা ফিরলো না কাশিমবাজারে, সঙ্গে নিয়ে এল এক পাগলা সাহেবকে।

তা পাগলা সাহেবই বটে।

ক্যাম্পবেল সাহেবের কোনও লাজ-লজ্জার বালাই নেই। গরমের দেশ, ঘামের দেশ বাঙলা দেশ। একটা প্যান্ট্ পরে খালি গায়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় টো-টো করে। চাষা-ভুষোদের সঙ্গে বিড়ি খায়, তামাক খায়। হুঁকো নিয়ে কলকেয় টান দেয়। চাষীদের বাড়ি গিয়ে পান্তাভাত গেলে কাঁচা লঙ্কা আর নুন দিয়ে।

আর কারো রোগ-টোগ করলে ওষুধ দেয়। বাতের ওষুধ, হাজার ওষুধ, খুশ্‌কির ওষুধ।

টাকা-পয়সার চাহিদা নেই। পাওনার কথা মুখে আনে না। সেরে গেলে সাহেবের আনন্দ। ওষুধে কাজ দিয়েছে।

কলেট মাঝে-মাঝে দফ্‌তরে কাজ করতে করতে সাবধান করে দেয়। বলে—এসব কী বেলেল্লাগিরি করছো বেল্‌?

বেল্‌ বলে—কেন? আমি তো হেকিমি করি—

কলেট বলে—কিন্তু ওদের সঙ্গে অত মাখামাখি করছো কেন? ওরা হলো গিয়ে রাজা-বাদশার জাত, আর আমরা হলুম বেণে। ওদের মধ্যে অনেক স্পাই ঘুরে বেড়ায়, তা জানো?

—স্পাই?

—হ্যাঁ স্পাই। নবাব আমাদের সন্দেহ করে। নবাব জানতে পেরেছে যে আমরা কলকাতায় ফোর্ট বসিয়েছি, কেল্লা বানানো তো ক্রাইম। আমরা ট্রেড্‌ করতে এসেছি কিন্তু ওরা মনে করে আমরা এম্পায়ার বসাতে চাই এখানে—

বেল্‌ বললে—কিন্তু আমি কে? আমি তো কোম্পানীর কেউ নই। আমি তো ডাক্তার, যার অসুখ হয় তার রোগ সারাই।

সত্যিই রোগ সারানো একটা নেশা হয়ে গিয়েছিল ক্যাম্পবেলের। তামাক খেয়ে যদি কেউ কাশতো তো সাহেব একটা বড়ি বার করে দিত।

বলতো—খাও, বড়িটা খেয়ে নাও, কাশি বেমালুম সেরে যাবে।

শুধু কাশি নয়, মেয়েদের বাধক, সুতিকা, সে-সব রোগের অব্যর্থ দাওয়াই দিত সাহেব। কুঠির সাহেবরাও নিশ্চিন্ত। রোগ-ভোগের জন্যে আর ইণ্ডিয়ান-কোয়াক্‌দের দরজায় ধর্না দিতে হবে না।

কলেট বললে—তুমি ওদের সঙ্গে মেশো বেল্‌, কিন্তু দেখো যেন ইংরেজদের ইজ্জৎ থাকে।

কিন্তু অনেক বই ঘেঁটেও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে অমন অদ্ভুত

চরিত্রের ইংরেজ আর একটাও খুঁজে পাইনি। চেহারা নয় তো যেন অ্যাপোলো। ফরসা টুক্-টুক্ করছে গায়ের রং, তার ওপর গায়ে-গলায়-বুকে-পিঠে একটাও ঘামাচি নেই। এটা বড় দেখা যায় না।

—তোমার গায়ে ঘামাচি হয় না কেন, বেল্ ?

বেল্ বলতো—আমি যে রাত্তিরে গায়ে আমার হেকিমি দাওয়াই মেখে শুই—

তারপর থেকে কুঠির সবাই হেকিমি-দাওয়াই মেখে বিছানায় শুতে লাগলো। আর কারোর গায়ে ঘামাচি হয় না। বেশ তেল-তেলা গা হয়ে গেল সকলের। তেল মেখে শুলে বেঙ্গলের মশাও আর কামড়ায় না।

গাঁয়ের চাষা-ভুষো লোকেরাও ভিড় করতে লাগলো কুঠি-বাড়িতে। এতদিন মশার উপদ্রবে সবাই ছট-ফট্ করেছে। জ্বর-জারি হয়েছে।

সবাই বলে—আমাকেও একটু তেল দাও সাহেব, মশার তেল—

বলতে গেলে কাশিমবাজার গাঁ থেকেই রোগ-ভোগ সব দূর হয়ে গেল। সাহেব রোগ সারায়, দাওয়াই দেয়, কিন্তু টাকা-পয়সা নেয় না।

কিন্তু লোকগুলো তা বলে নেমকহারাম নয়। মিনি-মাগনায় দাওয়াই নিতে তাদের বাধে। তারা ওষুধের বদলে অন্য জিনিস ভেট দিয়ে যায়। কেউ আনে একজোড়া মুরগী, কেউ গাছের বেগুন, পুকুরের মাছ। কেউ নতুন গুড়ের পাটালি। কেউ আবার নতুন গামছা এনে দেয়। নিজের তাঁতের হাতে বোনা গামছা, তাঁতের ধুতি, মিহি পাত্‌লা থান্।

ক্যাম্পবেল বললে—এ তো আজব দেশ ভাই, আমি লাহোর গেছি, দিল্লী গেছি, সব জায়গায় গেছি, কিন্তু বেঙ্গলের লোকদের মত মাই-ডিয়ার মানুষ তো কোথাও দেখিনি!

তারপর আবার বললে—ঠিক আছে ভাই, আমি এখানেই সেটেল্ করে গেলুম, এখান থেকে আর আমি নড়ছি না। এত ফুড, এত খাতির, এমন ক্লাইমেট কোথাও নেই, এই-ই আমার হোম, এই আমার হোম-ল্যাণ্ড—লং লিভ্ বেঙ্গল—

কিন্তু যারা ইতিহাস পড়েছে তারাই জানে এ সুখের দিন কপালে বেশিদিন সহ্য হলো না ইংরেজদের। ইংরেজদের সহ্য হলো না, তার কারণ আলাদা। তার জন্যে পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাস দায়ী। কিন্তু

ক্যাম্পবেলের কেন সহ্য হলো না, সেইটেই এ-উপন্যাসের কাহিনী।

আসলে 'গুলজারি বাঈ' যারা পড়বে, তাদের পক্ষে এই বেল্ সাহেবের চরিত্রটা বোঝা দরকার। যাদের পেছুটান বলে কিছু নেই, তারাই কেবল বিদেশ-বিভুঁইকে নিজের দেশ বলে মনে করে নিতে পারে।

আর নিজের দেশ না মনে করে নিতে পারলে কেউ ইংরেজ হয়ে খেজুর গাছে চড়ে বাঙালীদের মত খেজুর রস খেতে পারে?

আহা, বেল্ সাহেব খেজুর রস খেতে বড় ভালোবাসতো।

সাহেব বলতো—যদি দেশে ফিরে যাই তো এই খেজুর গাছের একটা চারা সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। ফ্রেণ্ডদের এই রস খাওয়াবো।

কত সব বন্ধু পাতিয়েছিল।

ইয়াসিন ছিল সাহেবের প্রাণের ইয়ার। ইয়াসিন খাঁ।

বলতো—ইয়াসিন, তুই আমার ডিয়ারেস্ট্ ফ্রেন্ড্ মাইরি, একটু খেজুর রস খাওয়া—

শেষকালে দুপুরবেলার খেজুর রসটাই বেশি পছন্দ করতো বেল্ সাহেব। সেই রসে একটু নেশার মত হয় বেশ। তার সঙ্গে একটু হেকিমি-দাওয়াই মিশিয়ে দিলে একেবারে ভড্কা।

কাশিমবাজার কুঠির সবাই সেই ভড্কা খাওয়া শুরু করে দিলে তারপর থেকে। ওদিকে ইংরেজদের কারবারও তখন রমরমা। সোরার কারবার, নুনের কারবার, তাঁতের কাপড়ের কারবার। কোম্পানীর আয় হচ্ছে খুব। প্রজারা এজেন্সির কমিশন হিসেবে মোটা-মোটা টাকা লুটছে।

সেই সঙ্গে বেলের নামও ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।

রোগ কার না আছে। শুধু ডাক্তারেরই অভাব। আর যা-ও বা দু'চার জন আছে তারা হাতুড়ে গো-বদ্যি। তাদের দিয়ে কোনও রকমে কাজ চালানো যায়, কিন্তু রোগ তাড়ানো যায় না।

সেই সময়েই হঠাৎ নবাবের দরবার থেকে লোক এল কাশিমবাজার কুঠিতে।

—তুমি কে?

—আমি মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারের মীর মুন্সী। এখানে হেমিক ক্যাম্পবেল সাহেবকে এত্তেলা দিতে এসেছি।

—নবাব-দরবারের খৎ আছে?

মীর মুন্সী জামার জেব্ থেকে সরকারী সীল-মোহর করা চিঠি বার করে দিলে।

কলেট সাহেব চিঠি পড়ে দেখলে তাতে লেখা আছে—হেকিম ক্যাম্পবেল সাহেব বরাবরেষু—

মোদ্দা কথা তাতে এই লেখা ছিল যে, চেহেল-সুতুনে গুলজারি বাঈএর বেমার হইয়াছে। হেকিম ক্যাম্পবেল সাহেবকে এত্তেলা দেওয়া যাইতেছে যে, তিনি যেন চেহেল-সুতুনে আসিয়া গুলজারি বাঈকে দেখিয়া দাওয়াই দিয়া যান। তাঁহার পারিশ্রমিক বাবদ তাঁহাকে তাঁর ন্যায্য স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া যাইবেক। ইতি…

ইয়াসিন খাঁ ক্যাম্পবেলের ইয়ার। খবরটা শুনে বললে—তোর বরাত ফিরে গেল ইয়ার—

ক্যাম্পবেল বললে—কেন?

ইয়াসিন বললে—অনেক মোহর পেয়ে যাবি, গুল্‌জারি বাঈ ভালো হয়ে গেলে ইনামও পাবি, চাই কি, নবাবের নজরে পড়ে গেলে সরকারি হেকিমি নোকরিও মিলে যেতে পারে। নবাবের পেয়ারের দোস্ত হয়ে যাবি, তখন কি আর আমাদের ইয়াদ থাকবে?

ক্যাম্পবেল বললে—আরে দূর, মোহর পেলে নোকরি পেলে কি আমি শাহান্‌শা বাদশা হয়ে যাবো? আমার এই ভাল, এই তোদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াই আর ফূর্তি করি—

কিন্তু ক্যাম্পবেল তো জানতো না যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত-ভাগ্যের সঙ্গে জড়াবে বলেই সে দুনিয়ার এত জায়গা থাকতে এই এখানে এসে হাজির হয়েছিল। এই বেঙ্গলে।

বেঙ্গল তখন রাজনীতির ষড়যন্ত্রের হট্-বেড্ হয়ে আছে। এক কথায় বাঙলা ভাষায় যাকে বলে বারুদখানা।

শুধু একটা দেশলাই-কাঠির তোয়াক্কা।

একটা দেশলাই-কাঠি জ্বললেই সমস্ত বেঙ্গল ফেটে গুঁড়িয়ে চৌচির হয়ে যাবে।

তখনও খবরটা কানে যায়নি ক্যাম্পবেলের। সে মাঠ-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইয়াসিন তাকে নিয়ে বনে-জঙ্গলে গাছ-গাছড়া দেখিয়ে বেড়ায়। কোন্ গাছের পাতার কী গুণ, কোন্ গাছের শেকড়ের কী কার্যকারিতা তা সে চিনতে চেষ্টা করে। চিবিয়ে চিবিয়ে পরখ করে।

হঠাৎ সেদিন কুঠি-বাড়িতে এসে শুনলে খবরটা।

কর্নেট বললে—যাও, নবাব-হারেমের ভেতরে গিয়ে বাঈ-সাহেবাকে দেখে এসো—

ক্যাম্পবেল বললে—কিন্তু বেগম-সাহেবারা কি আমার সামনে বেরোবে—?

কর্নেট বললে—না বেরোয় না বেরোবে, তোমার কী? তুমি মেডিসিন দিয়ে খালাস—

তা তাই-ই ঠিক হলো। ক্যাম্পবেল খবর পাঠিয়ে দিলে—সে যাবে—

চেহেল-সুতুন বড় অদ্ভুত জায়গা। কবে একদিন নবাব সুজাউদ্দীন এই প্রাসাদ তৈরি করে গিয়েছিল নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর পরে। সে-কথা তখন লোকে ভুলে গিয়েছে। নবাব সুজাউদ্দীন গেছে, নবাব সরফরাজ খাঁ গেছে, নবাব আলিবর্দী খাঁও গেছে।

কিন্তু চেহেল-সুতুন তার গৌরব নিয়ে তখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

সকাল-সন্ধ্যেয় সেই প্রাসাদের মাথায় নহবৎ বাজে আর মুর্শিদাবাদের লোক বুঝতে পারে ক'টা বেজেছে। দূর থেকে যে-চাষা মাঠে-ক্ষেতে-খামারে কাজ করে সেও সন্ধ্যেবেলার নহবৎ শুনলে বুঝতে পারে এবার ঘরে ফিরতে হবে।

তারপর আর একবার বাজে রাত দশটার সময়।

তখন মুর্শিদাবাদের রাস্তায় লোকজন সব ঘরে ফিরে গেছে। চারদিক ফাঁকা। চক্‌-বাজারে যারা বেলফুল বিক্রি করে বেড়ায় তারাও তখন আর নেই।

যে-গণৎকারটা সন্ধ্যেবেলা মাটির ওপর ছক্‌ কেটে মানুষের ভাগ্য-গণনা করতে বসেছিল, সেও পাতৃতাড়ি গুটিয়ে নিজের বাড়িতে চলে গেছে।

তারই মধ্যে মাঝে-মাঝে হয়ত কোতোয়ালীর লোক পাহারা দিয়ে ঘুরে বেড়ায় এদিক-ওদিক। কোথাও কোনও চোর-ডাকাত কারো বাড়িতে সিঁধ কাটছে কিনা তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে।

আর তার সঙ্গে আছে চর। চরের উপদ্রব।

মুর্শিদাবাদের শহরের আনাচে-কানাচে চরদের উপদ্রব বড় বেড়ে

গেছে নবাব আলিবর্দীর আমলের পর থেকেই। চারদিকেই হুঁশিয়ারি জানানো হয়ে গেছে খুব সজাগ থেকো। টুপীওয়ালাদের চর আজকাল বড় ঘোরাঘুরি আরম্ভ করেছে নবাব-দরবারের আমীর-ওমরাওদের বাড়ির ধারে-কাছে। তারা ইনাম দিতে আরম্ভ করেছে ওমরাওদের। তারা আশরফি ছড়াতে আরম্ভ করেছে সেখানে।

বিশেষ করে মহিমাপুরের দিকটাতেই বেশি নজর রাখে তারা। একটা তাঞ্জাম গেলেই হাঁক দেয়।

চিৎকার করে বলে—কৌন্ হ্যায় ?

ওধার থেকে তাঞ্জাম-ওয়ালাদের উত্তর আসে—জগৎশেঠজীর আওরৎবিবির—

বাস্, সঙ্গে সঙ্গে ছাড় হয়ে যায়। যাও।

সেদিন বিকেলবেলাই অমনি একটা তাঞ্জাম এসে থামলো চেহেল-স্তুনের সামনে।

পাহারাদার ফৌজী-সেপাই চেহেল-স্তুনের সামনে পাহারা দিচ্ছিল ঘোড়ার ওপর বসে। তাঞ্জামটা সিং-দরজায় আসতেই হাঁকলো—কৌন্ হ্যায় ?

তাঞ্জামওয়ালা হাঁকলো—হেকিম ক্যাম্পবেল সাহাব—

—পাঞ্জা আছে ?

—জী হুঁজুর!

তাঞ্জামওয়ালা পাঞ্জা বার করে দেখালে।

ফৌজী-সেপাই সেখানা পরখ করে দেখে ছাড় করে দিলে।

—যাও!

আর সঙ্গে সঙ্গে লোহার গেটখানা ফাঁক হয়ে গেল। তারপর তাঞ্জামওয়ালারা হেকিম সাহাবকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

পশ্চিমের যে মেঘখানাকে প্রথমে তুচ্ছ মনে হয়েছিল সেখানা যে এমন করে সমস্ত ভারতবর্ষটা গ্রাস করে ফেলবে তা নবাব আলিবর্দী খাঁ আভাসে বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন বলেই একদিন সাবধান করে দিয়েছিলেন নাতিকে।

নাতি নবাব মীর্জা মহম্মদ।

নবাব বলেছিলেন—টুপীওয়ালারা বড় সর্বনেশে লোক, ওরা এখেনে একবার যখন কারবার করবার সনদ নিয়েছে তখন শুধু কারবার করে

চুপ থাকবে না—

তিনি বুঝিয়েছিলেন—কারবার মানেই রাজ্য-অধিকার। দেশের ওপর প্রভাব বিস্তার না করতে পারলে ভাল করে ব্যবসাও করা যায় না। ব্যবসা করতে গেলেও রাজ্যের ওপর রাজনৈতিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা দরকার হয়ে পড়ে। সেই হস্তক্ষেপ ওরা করবে।

মা তখন পুরোদমে ইংরেজদের সঙ্গে কারবার আরম্ভ করে দিয়েছে, বেশ মোটা লাভ হচ্ছে সোরার ব্যবসায়। আমিনা বেগমের টাকা, আর ব্যবসা করে উমিচাঁদ। ইংরেজরা সোনা কেনে উমিচাঁদের কাছ থেকে। মোটা লাভ পায় নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উদ্দৌলার মা আমিনা বেগম।

কিন্তু নবাব আলিবর্দীর বিধবা বেগম তখন কোরাণ আর মসজিদ নিয়েই আছে।

মেয়ে ব্যবসা করে ইংরেজদের সঙ্গে সেটা পছন্দ হয় না নানী-বেগমের।

বলে—কাজটা ভাল নয় রে, মীর্জা চায় না যে তুই ওই ইংরেজ-টুপীওয়ালাদের সঙ্গে লেন-দেন করিস—ও যা চায় না তা তুই করিস কেন ?

কিন্তু মেয়ে শোনে না।

বলে—কিন্তু টাকা ? টাকা না থাকলে কেউ আমাকে খাতির করবে ?

—এত টাকা তোর কীসের দরকার শুনি ? বিধবা মানুষ তুই, তোর টাকার দরকার কীসের ? কত টাকা তোর চাই বল্ না, আমি দিচ্ছি—

—আমি তোমার টাকা নেব কেন বলো তো ?

—তাহলে মীর্জার টাকা নে। মীর্জা তো তোর ছেলে। ছেলের টাকা নিতে তো তোর আপত্তি নেই !

আমিনা রেগে যেত। বলতো—ছেলে ? ছেলের কথা বলছো ? ছেলে কি আমার ?

—ওমা, বলিস কী তুই ? ছেলে তোর নয় তো কার ?

—ও ছেলে তোমার। ছোটবেলা থেকে ওকে তো তুমি নিজের কাছে রেখে দিয়েছ, ও তোমার আর বাবার আদর পেয়ে পেয়ে তোমারই ছেলে হয়ে গিয়েছে। আমি শুধু নামে ওর মা—

নানীবেগম বলতো—এও আমার কপালে লেখা ছিল রে—

বলে আঁচলে চোখ মুছতো নানীবেগম।

এ-সব চেহেল-সুতুনের ভেতরের কথা। এ কেউ জানতো না বাইরে থেকে লোকে জানতো চেহেল-সুতুনের ভেতরে বেগমের রাশ সেখানে শুধু মজা আর ফুর্তি। বাঁদীরা আছে, খোজারা আছে, সরাব রূপ, রূপো আর জীবন-যৌবনের জোয়ার আছে। বাইরে থেকে লোকে বলতো—চেহেল-সুতুন ফুর্তির জায়গা। নবাব রাজ্য চালায় না, নবাব কিছু দেখে না। শুধু সুন্দরী-সুন্দরী বেগম নিয়ে তামাসা আর ফুর্তি করে।

তা কথাটা পুরোপুরি মিথ্যেও নয়।

ইংরেজ-কুঠিতেও সবাই তাই বলতো। বলতো—ইণ্ডিয়ার নবাবরা গোলাপ জলে চান করে, বেগমেরা দুধ দিয়ে গা পরিষ্কার করে। দুধে নাকি চামড়া নরম থাকে। ভেতরে যে-সব সুন্দরী থাকে তারা কখনও সূর্য দেখতে পায় না। সোনা-হীরা আর মুক্তো দিয়ে মোড়া তাদের গা। তারা যখন চলে তখন ময়ূরের মত নাচে। তাদের জন্যে যে-সব বাঁদী থাকে তারাও নাকি অপূর্ব সুন্দরী। তাদের সঙ্গেও বাইরের লোকে দেখা করতে পারে না। পুরুষ-মানুষ যদি কেউ ভেতরে যেতে পারে সে শুধু খোজারা, যাদের পৌরুষ বলে কিছু নেই।

কলেট সাহেবও তাই বুঝিয়ে দিয়েছিল ক্যাম্পবেলকে।

ক্যাম্পবেল জিজ্ঞেস করেছিল—তাহলে রোগীকে পরীক্ষা করবো কী করে?

কলেট বলেছিল—আড়াল থেকে—

—আড়াল থেকে কখনও রোগী দেখা যায়?

—দেখা না গেলেও দেখতে হবে। সেইটেই যে কানুন।

ক্যাম্পবেল বলেছিল—তাহলে আমার দ্বারা রুগী দেখা হবে না—

কলেট বলেছিল—না না—ও-কাজ কোর না, যাও, আমাদের হেড-কোয়ার্টার থেকে অর্ডার এসেছে নবাবদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে হবে। সেইজন্যেই তো তুমি যখন ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে মেশো, আমি তোমাকে এন্‌কারেজ করি—

ক্যাম্পবেল বলেছিল—তাহলে কি স্পাইং করতে যাবো আমি?

কলেট বলেছিল—একরকম তাই—স্পাইং করবে দোষ কী? আমরা এখানে ব্যবসা করতে এসেছি, ব্যবসার সুবিধের জন্যে দরকার

হলে স্পাইংও করবে।—ওরাও তো আমাদের পেছনে স্পাই লাগিয়েছে—

তারপর একটু থেমে বলেছিল—ওই যে ইয়াসিন, তোমায় ফ্রেণ্ড ও যে স্পাই নয় তা তোমার কে বললে ?

চম্‌কে উঠেছিল ক্যাম্পবেল কথাটা শুনে।

বলেছিল—না না, ওটা বাজে কথা। ইয়াসিন কখনও স্পাই হতে পারে না—

কলেট বলেছিল—পলিটিক্স্‌-এ সবই সম্ভব বেল্‌, সবই পসিব্‌ল্‌।

কথাটা শুনে ক্যাম্পবেলের মনে বড় ধাক্কা লেগেছিল। কিন্তু কিছু বলেনি। ডাক্তারি করে লোকের রোগ সারিয়ে আনন্দ পায় ক্যাম্পবেল, তার মধ্যে এত মতলব থাকতে পারে, তা সে ভাবতেও পারে নি।

কিন্তু সে-সম্বন্ধে ইয়াসিনকে কিছু বলে নি। চোদ্দ বছর বয়সে ইণ্ডিয়াতে এসেছিল সাহেব, তারপর অনেকদিন কেটে গেল, এখনও ইণ্ডিয়াকে ভাল করে চিনতেও পারলে না। কোথায় সেই লাহোর, কোথায় সেই দিল্লী, আর কোথায় এই কাশিমবাজার।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ঘরে-ঘরে তখন রোশনাই জ্বলে উঠেছে চেহেল-সুতুনে। বেগমদের ঘরে ঘরে সাজ-গোছের ধুম পড়ে গেছে।

হঠাৎ খোজা-সর্দার পীরালির ডাকে চমকে উঠলো মুমতাজ।

বললে—কে ? পীরালি ?

—জী হাঁ, বেগম-সাহেবা !

—কী খবর ?

—হেকিম সাহাব আসছে। তসরিফ ওঠাতে হবে।

তাড়াতাড়ি মুমতাজ পোষাকটা বদলে নিলে। বাইরের লোক !

বাইরের লোক বড় একটা চেহেল-সুতুনে আসে না। এলে সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। সাহেব-হেকিম আসবার কথা ছিল কাশিমবাজার থেকে। তাহলে এসেছে সে ? তাড়াতাড়ি পায়জামা, পেশোয়াজ আর জুতো পরে নিলে মুমতাজ।

বললে—তুমি যাও পীরালি খাঁ, আমি এখনি আসছি—

পীরালি খাঁ খবরটা দিয়ে চলে গেল।

একটা মখ্‌মল-মোড়া ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো পীরালি খাঁ হেকিম-

সাহেবকে।

ক্যাম্পবেল সাহেব চারদিক চেয়ে দেখলে। সারা রাস্তাটাই দেখতে দেখতে এসেছে। মনে হয়েছে যেন দুনিয়ার বাইরে অন্য কোনও দুনিয়াতে এসেছে সে। এরই তো নাম শুনেছে সে এত। এর কথাই তো কলেট বলে দিয়েছিল।

কোথা থেকে যেন গানের শব্দ আসছিল। গানের সঙ্গে তারের মিউজিক বাজছে। আরো দূর থেকে যেন নামাজ-পড়ার শব্দ কানে এল।

কী করবে বুঝতে পারলে না ক্যাম্পবেল।

পীরালিকে বললে—কই, গুলজারি বাঈ কোথায়? কার বেমার হয়েছে?

পীরালি খাঁ বললে—একটু সবুর ধরুন হাকিম-সাহাব, আসছে গুলজারি বাঈ—

ওপাশ থেকে যেন একটা আওয়াজ হলো। ঘণ্টা বাজার মতন। সেই শব্দটা পেতেই পীরালি খাঁ মখ্‌মলের পর্দাটা টেনে দিলে। টানতেই ভেতরটা দেখা গেল। ভেতরে রূপোর খাঁচার মধ্যে একটা বেড়াল বসেছিল। সত্যিকারের সিলভার, পিওর।

আর তার ওপাশে নেটের পর্দা। পাত্‌লা জালি। সেখানে একজন মেয়ে এসে দাঁড়ালো। বড় সুন্দরী মেয়েটা। খুব বিউটিফুল মনে হলো ক্যাম্পবেলের চোখে।

ওকেই দেখতে হবে নাকি? ওরই অসুখ হয়েছে? ওই মেয়েটার? ওরই নাম গুলজারি বাঈ?

পীরালি খাঁ রূপোর খাঁচার দরজা খুলে ভেতর থেকে বেড়ালটাকে কোলে করে বাইরে নিয়ে এল। নিয়ে এসে ক্যাম্পবেলের সামনে রাখলো।

ক্যাম্পবেল অবাক হয়ে গেছে।

বললে—এ বিল্লি নিয়ে কী করবো খোজা-সর্দার?

পীরালি বললে—এর-ই তো বেমার হেকিম-সাহাব। এই-ই তো গুলজারি বাঈ!

ক্যাম্পবেল সাহেব আকাশ থেকে যেন মাটিতে পড়ে গেল। এরই নাম গুলজারি বাঈ, এরই অসুখ করেছে? একে দেখতে এসেছে সে?

সাহেব পর্দার ওপারে চেয়ে দেখলে ? মেয়েটা তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করে—বেমার কার ? এই বিল্লির ?

—জী হাঁ।

এবার উত্তর দিলে সেই মেয়েটা। বড় মিষ্টি গলার সুর।

বললে—গুলজারি বাঈ নানীবেগমের বড় পেয়ারের বিল্লি। ওকে আপনি কিছু দাওয়াই দিয়ে দিন।

ক্যাম্পবেল বড় মুশকিলে পড়লো।

বললে—দেখুন বেগম-সাহেবা, আমি মানুষের রোগ দেখি, বেড়ালের হেকিমি তো করি না।

মুমতাজ বললে—মুর্শিদাবাদের অনেক হেকিম দেখে গেছে গুলজারিকে, কিন্তু কিছুতেই বেমার সারে নি। নানীবেগম বড় ভাবনায় পড়েছে, আপনি ওকে একটু ইলাইজ করে দিন মেহেরবানি করে—

সাহেব মনে মনে কী যেন ভাবতে লাগলো।

জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে এর ?

—বেমার হয়েছে।

—কী বেমার ? তকলিফ্ কী হচ্ছে ?

মুমতাজ বললে—কিছু খায় না আজ একমাস ধরে। কাবুল-মুলুকের বিল্লি। নবাব আলিবর্দী খাঁ নানীবেগম সাহেবার জন্যে ওকে কাবুল-মুলুক থেকে আনিয়েছিলেন। বড় আয়েসী বিল্লি, খালি দুধ খায় আর মেওয়া খায়—

বেড়ালটার দিকে চেয়ে দেখলে সাহেব। বড় সুন্দর দেখতে। সোনালি-রূপোলি গায়ের রং। ছোট ছোট পা। বাদামী গোল-গোল চোখ। গায়ে পুরু লোম। লোমে সমস্ত মুখ প্রায় ঢেকে গেছে।

ক্যাম্পবেল বললে—ক'দিন ধরে এর এমন বেমার হয়েছে বেগম-সাহেবা ?

মুমতাজ মিষ্টি গলায় বললে—আমি বেগমসাহেবা নই হেকিম-সাহাব, আমি নানীবেগমসাহেবার খেদমদ্‌গারনী।

অবাক হয়ে গেল সাহেব। বুঝতে পারলে না কথাটা।

জিজ্ঞেস করলে—তার মানে ?

মুমতাজ এবার পীরালির দিকে ফিরলে।

বললে—পীরালি, তুমি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াও তো।

পীরালি বললে—জী হাঁ—

বলে বাইরে চলে গেল। মুমতাজ এবার পর্দাটা সরিয়ে সামনে এল।

সাহেব এবার মুখোমুখি চেয়ে দেখলে। সাহেব একটু সম্মান দেখাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

মুমতাজ বললে—তকলিফ করে দাঁড়ালেন কেন্, বসুন। আমি বেগমসাহেবা নই।

—বেগমসাহেবা নন্ তো আপনি কী?

—আমি তো বললুম আপনাকে, আমি নানী বেগমসাহেবার খেদমদগারনী মুমতাজ।

সাহেব আরো হতবাক হয়ে গেল।

মুমতাজ বললে—এই গুলজারি বাঈএর খেদমদ্ করাই আমার কাজ। আমি দরবার থেকে তন্‌খা পাই এই কাজের জন্যে। আপনি আমার দিকে অমন করে চাইবেন না, গুলজারির দিকে চেয়ে দেখুন।

সাহেব এতক্ষণে লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিলে। বললে—আমাকে মাফ করবেন—

মুমতাজ বললে—কিছু মনে করবেন না হেকিম সাহেব, টোপি-ওয়ালাদের ওপর চেহেল সুতুনের নবাবের বড় গোসা। আপনি কিছু বেয়াদপি করলে তাতে আপনারই লোকসান হবে। তাই আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি—

ক্যাম্পবেল অনেকদিন ইণ্ডিয়ায় এসেছে, অনেক লেডীর চিকিৎসা করেছে, কিন্তু এমন ব্যবহার কখনও পায়নি, আর এমন করে বেরালের চিকিৎসার জন্যেও কেউ কল্ দেয়নি।

—পীরালি খাঁ!

হঠাৎ মুমতাজ খোজা-সর্দারকে ডেকে বসলো।

পীরালি খাঁ আসবার আগেই মুমতাজ আবার জালি-পর্দার ভেতরে চলে গেছে।

—হেকিম সাহেবকে বল গুলজারিকে যেমন করে হোক ভালো করতেই হবে।

ক্যাম্পবেল বুঝতে পারলে। বললে—কিন্তু আমি তো ম্যাজিক জানি না, ভেল্কিবাজি জানি না, ইলাইজ করতে চেষ্টা করবো—

—না হেকিম সাহেব, আমাদের গুলজারি বাঈ যদি না ভালো

হয়ে যায় তো নানীবেগম বড় কষ্ট পাবেন। বড় পেয়ারের বিল্লি নানীবেগমসাহেবার।

—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

—বলুন।

—এর জুড়ি আছে আপনাদের কাছে ?

—জুড়ি মানে ?

—জুড়ি মানে এর মরদ বেড়াল আছে ?

মুমতাজ বললে—না। আলিজাহাঁ ওই গুলজারিকে একলাই নিয়ে এসেছিল। সঙ্গে জোড়া আনেনি।

—কিন্তু এখন এর জুড়ি একটা জোগাড় করতে হবে মুমতাজ বাঈ। যখন একে আনা হয়েছিল তখন এর বয়েস ছিল কম, এখন বড় হয়েছে, জুড়ি না হলে এর তবিয়ত খারাপ হবেই।

মুমতাজ বললে—কিন্তু তার কোনও দাওয়াই নেই ?

—এ তো মেয়ে বেড়াল, মরদ-বেরাল না হলে কী করে থাকবে ? আপনি আপনার নানীবেগমসাহেবাকে সেই কথা বলে দেবেন।

—কিন্তু মরদ-বেড়াল এখন কোথায় পাবেন তিনি ?

ক্যাম্পবেল বললে—বাঙলার মসনদের নবাবের গ্র্যাণ্ডমাদার যদি না জোগাড় করতে পারেন তো আমি কোত্থেকে জোগাড় করবো মুমতাজ বাঈ ?

—আপনাদের ফিরিঙ্গি-কুঠিতে নেই ?

ক্যাম্পবেল বললে—না।

—নানীবেগমসাহেবা দাম দেবে, যত দাম লাগে দেবে, আপনি জোগাড় করে দিন না ?

—হেকিম-সাহাব !

হঠাৎ পীরালি সর্দার কথার মাঝখানে বাধা দিলে।

বললে—হেকিম-সাহাব,' শহরকা মরদ-বিল্লী হলে চলবে ?

—কোন্ শহর ?

পীরালি বললে—মুর্শিদাবাদ শহর ?

—দেশী বিল্লি ?

মুমতাজ পর্দার আড়াল থেকে আবার বললে—দেশী বিল্লী আমাদের চেহেল্-সুতুনের ভেতরেও আছে হেকিম-সাহাব, কিন্তু তাদের সঙ্গে জোড়-বাঁধতে দিই না আমি, নানীবেগমসাহেবার বারণ আছে—

—তা না করাই ভালো, ওরাও তো মানুষের মতো—

মুমতাজ বললে—আপনি একটু চেষ্টা করে দেখবেন ?

—আমি আর চেষ্টা করে কোথায় পাবো। তবে আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয় চেষ্টা করবো।

—আর দাওয়াই ? দাওয়াই দেবেন না ?

—আপনি যদি বলেন তো দাওয়াই আনতে পারি।

—কবে আনবেন ?

—যেদিন তাঞ্জামের ব্যবস্থা করে দেবেন।

—তাহলে জুম্মাবারেই তাঞ্জাম পাঠাতে বলবো নানীবেগম-সাহেবাকে।

তাই ঠিক রইল। ক্যাম্পবেল সাহেব সেদিনকার মত চলে এল চেহেল-সুতুন ছেড়ে। আবার বাইরে এসে তাঞ্জামে উঠলো। তারপর, ঘোড়ার পিঠে চড়ে সাহেব পৌঁছে গেল কাশিমবাজার কুঠিতে।

সবাই হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল ক্যাম্পবেলের জন্যে। কাশিমবাজার কুঠিতে সাহেবরা সেদিন আর কাজে বেরোয়নি। কুঠির ছোট সাহেবের যাবার কথা কলকাতাতে। কলকাতায় জরুরী ডেসপ্যাচ নিয়ে যাবার শেষ দিন।

কলেট বললে—আর একটু দাঁড়াও স্মিথ, দেখি বেল্ ফিরে এসে কী বলে—

স্মিথ বললে—কিন্তু ডেস্‌প্যাচ নিয়ে যেতে যে দেরি হয়ে যাবে। ফোর্ট উইলিয়মের ক্যাপটেন বড় ঝামেলা করে দেরি হলে।

—তা হোক, ডিপ্লোমেটিক ব্যাপারে শেষ-খবরটাও পাঠানো উচিত।

—পরের উইকে পাঠালে চলবে না ?

কলেট বললে—ক্যাপটেন তখন বলবে ইম্‌পর্ট্যাণ্ট নিউজ কেন এত পরে পাঠালে। ক্যাপটেন যে আবার কোম্পানীর হেড্-অফিসে সেই রকম ডেসপ্যাচ্ পাঠাবে!

এই ডেস্‌প্যাচই হচ্ছে কোম্‌পানীর আসল কারবার। চারদিক থেকে রিপোর্ট এনে তার থেকে আসল পয়েণ্ট নিয়ে ফাইন্যাল রিপোর্ট পাঠাতে হয় ইংলণ্ডে, কোম্‌পানীর হেড-অফিসে। রিপোর্ট যেতে ছ'মাস, তার উত্তর আসতেও ছ'মাস। ততদিনে দেশের হাল-চাল মতি-গতি সব কিছু বদলে গেছে। সব কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে।

হঠাৎ এসে হাজির হলো ক্যাম্পবেল।

ঘোড়া থেকে নেমেই এল কুঠির দফতরে।

—কী হলো? কী খবর বেল্?

বেল্ বললে—আরে, ফর নাথিং আমাকে এত ট্রাবল্ দিলে ওরা। কিছু হয়নি কারো—

—কিছু হয়নি মানে, ফিস দিয়েছে?

—হ্যাঁ, বলে পকেট থেকে একটা সোনার মোহর বার করে দেখালে।

বললে—মীর মুনসী সাহেব খাজাঞ্চীখানায় নিয়ে গিয়ে এটা দিলে। বললে, আবার ডেকে পাঠাবে। আবার যেতে হবে চেহেল-সুতুনে।

—কার অসুখ? কোন্ বেগমের?

—গুলজারি বাঈএর।

—নবাবের বেগম নাকি?

—আরে দূর, নবাবের বেগম হলে কি আর এক মোহর ফিস্ দেয়?

—তাহলে চেহেল-সুতুনের কোনও বাঁদীর?

—না, নবাবের গ্র্যাণ্ডমাদারের একটা ক্যাট্ আছে, বেড়াল।

—বেড়াল? ক্যাট্?

বেল্ বললে—হ্যাঁ, সেই বেড়ালটারই আদরের নাম গুলজারি বাঈ।

কলেট হতাশ হয়ে পড়লো। কলেট ভেবেছিল যখন ক্যাম্পবেলকে বেগমের অসুখের জন্যে ডেকেছে, তখন বেগমের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তাকে চেহেল-সুতুনের ভেতরে যেতেই হবে। হয়ত সেই সূত্রে নবাবের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। আর নবাবের সঙ্গে যদি দেখা না-ও হয় তো নবাবের আমীর-ওমরাও কারো সঙ্গে দেখা হবে। দুটো কথা হবে এবং যদি কোনও খবর আনতে পারে ক্যাম্পবেল তো সেটা ক্যাপটেনকে জানিয়ে দেবে।

স্মিথ তখনও দাঁড়িয়েছিল।

কলেট বললে—তুমি আর দাঁড়িয়ে আছো কেন, তুমি স্টার্ট করো যাও—বেড়ালের খবর পাঠিয়ে কোনও লাভ নেই ক্যাপটেনের কাছে।

সত্যিই, চেহেল-সুতুনে বেরালের অসুখের খবর নিয়ে কারো শিরঃপীড়া থাকার কথাও নয়। কিন্তু শিরঃপীড়া যদি কারো থাকে, সে নানীবেগমসাহেবার। নানীবেগমসাহেবা এমনিতে গা এলিয়ে দিয়েছে। আর কোনও কিছুতে তাঁর টান নেই। নাতি মীর্জার জন্যে

প্রথম-প্রথম ভাবনা হতো। রগচটা মানুষ, হঠাৎ ঝোঁকের বশে কিছু করে ফেললে তখন সারা চেহেল-সুতুন নিয়েই টানাটানি পড়বে। বাইরে যেমন মীর্জার দুষমন রয়েছে, ভেতরেও তেমনি।

যখন সবাই যে-যার মহলে ফুর্তি করছে তখন নানীবেগমসাহেবার মনে অশান্তির ঝড় বয়ে চলে।

একলা-একলাই কোরাণখানা খুলে পড়তে বসে।

কিন্তু তাতেও সব সময়ে মনটা বসে না। আস্তে আস্তে মহাল থেকে বেরোয়। তারপর টহল দিতে দিতে যায় নাত্‌বৌয়ের ঘরে। সেখানে লুৎফা চুপচাপ শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। আলো জ্বলছে, আর বউ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। নানীবেগমসাহেবাকে দেখতে পায়নি সে। না দেখুক, নানীবেগমসাহেবা আবার সেখান থেকে মেয়ের মহলের ঘরের দিকে যায়।

—বন্দেগী নানীবেগমসাহেবা।

খোজা সর্দার পীরালি খাঁ। নানীবেগবসাহেবা ফিরে দাঁড়ালো।

—কী খবর পীরালি চারদিকের সব খয়রিয়াত্‌ তো?

—জী নানীবেগমসাহেবা, সব খয়রিয়াত্‌।

—গুলজারি বাঈএর তবিয়ত্‌ কেমন?

—পীরালি বললে—কাশিমবাজার কোঠি থেকে ফিরিঙ্গি হেকিম সাহেব এসেছিল, ইলাইজ করে গেছে।

—দাওয়াই দিয়ে গেছে?

পীরালি বললে—না, আগ্‌লে হপ্তায় আবার হেকিমজী আসবে বলেছে দাওয়াই নিয়ে।

—মুমতাজ কোথায়?

—হুজুর বেমার-মহলে।

নানীবেগমসাহেবা যাচ্ছিল অন্যদিকে। কিন্তু মনে পড়তেই বেমার-মহলের দিকেই চলতে লাগলো।

—আচ্ছা, তুম যাও—

বেমার-মহলে বেমারীরাই থাকে। চেহেল-সুতুনে কারো অসুখ হলেই তাকে বেমার-মহলে পাঠানো হয়। বেমার-মহালে তাকে পাঠিয়ে দিয়ে তাকে দেখবার জন্যে চেহেল-সুতুনের হেকিমকে পাঠানো হয়। তার জন্যে পাঞ্জা বেরোয় মীর মুন্‌সীর দফ্‌তর থেকে হেকিম যদি ইলাইজ করতে না পারে তো তখন বৈদ্য আসে চক্‌-বাজার

থেকে। চক্ বাজারে বৈদ্যজীদের আড্ডা। তারা বেমারির নাড়ি টেপে, রোগ ধরে। তারপর জরি-বুটি দেয়। তাতেও যদি না সারে, তখন আসে ফিরিঙ্গি হেকিম। কাশিমবাজার কুঠিতে ফিরিঙ্গিদের আড্ডা। তাই শেষ পর্যন্ত কাশিমবাজারেই মীর মুনসীকে পাঠানো হয়েছিল ফিরিঙ্গি হেকিম সাহেবের জন্যে।

নানীবেগমসাহেবা চেহেল-সুতুনের গলিপথ দিয়ে বেমার-মহলের দিকেই পা বাড়ালো।

এ এক অদ্ভুত দুনিয়া। এই চেহেল-সুতুন। কে কোথায় কখন যাচ্ছে, কী করছে, কার সঙ্গে মিশছে, কার সঙ্গে ঝগড়া করছে, সব দেখা-শোনা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তবু এককালে নিজে এই সমস্ত দেখা-শোনা করছে নানীবেগমসাহেবা, কিন্তু নবাব আলিবর্দী খাঁ মারা যাওয়ার পর যেন কীরকম হয়ে গেল সব! এখন আর কিছু দেখে না নানীবেগমসাহেবা। যেমন চলছে চলুক। এখন যে-ক'দিন আল্লার নাম করে চালিয়ে নেওয়া যায়।

—মুমতাজ!

নানীবেগমসাহেবার ডাক শুনেই মুমতাজ ঘরের মধ্যে সোজা হয়ে বসলো। বড় ক্লান্ত লাগছিল সাহেব চলে যাওয়ার পর থেকেই। কোথায় কোন আমীর ঘরের ঘরণী ছিল মুমতাজ, আজ হতে হয়েছে চেহেল-সুতুনে নানীবেগমসাহেবার খেদ্‌মদ্‌গারনী।

আমীর সাহেব বড় পেয়ার করতো মুমতাজকে।

আমীর খুশ্‌রু ছিল আলিবর্দীর আমীর। কিন্তু আমীর খুশরু যখন ওড়িষ্যায় নবাবের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিল তখন জখম হয়ে যায়। জোয়ান আমীর, আমীরের রিস্তাদাররা ঠকিয়ে নিয়েছিল বিধবার সম্পত্তি। সেই সময়ে নবাবের বেগম বিধবা মুমতাজকে চেহেল-সুতুনে নিয়ে আসে।

আলিবর্দীর বেগমসাহেবা বলেছিল—তুমি এখানে থাকো বহেন, তোমার কোন ভয় নেই—

সুন্দরী মেয়েদের ভয় নেই এ-কথা বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

মুর্শিদাবাদের আমীর ওমরাও মহলে সুন্দরী মেয়েদের নাম নখের ডগায়। তারা খবর রাখে কার বাড়িতে কোথায় কোন্ কোণে

একটা খুব্‌সুরত আওয়াত্ আছে।

আমীর খুশরুর বিধবা বেগমকে নিয়ে তখন তোলপাড় চলেছে মুর্শিদাবাদে। নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলার ইয়ার-বক্সীরা মতলব করতে সুরু করে।

সফিউল্লা সাহেব অনেকদিন ধরে তাগ্‌ করে বসেছিল।

উড়িষ্যা থেকে যখন খবরটা এল যে আমীর খুশরু মারা গেছে তখনই আনন্দের চোটে সমস্ত দিন ধরে মদ খেতে লাগলো।

আনন্দের চোটে বলে উঠলো—শোভানাল্লা—

মীর্জা মহম্মদ তখনও নবাব হয়নি। ইয়ার-বক্সী নিয়ে তখন চারদিকে হৈ-হল্লা করে বেড়ায়।

বড় ইয়ার নেশার মহম্মদ।

মেজ ইয়ার সফিউল্লা। সবচেয়ে ছোট ইয়ার ইয়ার জান।

সফিউল্লা বললে—মুমতাজ বাঈকে আমি সাদি করবো ইয়ার—

মীর্জা মহম্মদ বললে—তা কর্।

সফিউল্লা বললে—করবো কী করে? নানীবেগম যে তাকে চেহেল-সুতুনে নিয়ে গিয়ে তুলেছে।

মীর্জা বললে—একটু সবুর কর—দেখি আমি কী বন্দোবস্ত করতে পারি।

কিন্তু সফিউল্লা জানতো মীর্জা মহম্মদকে বিশ্বাস নেই। সুন্দরী আওয়াত্ যদি একবার চেহেল-সুতুনে গিয়ে ওঠে তো মীর্জার নজরে সে পড়বেই। আর একবার মীর্জার নজরে পড়লে আর রক্ষে নেই।

নানীবেগমসাহেবাও তা জানতো।

মুমতাজকে ডেকে নানীবেগম বললে—তোমার কেউ আপনজন আছে? কোনও রিস্তাদার?

মুমতাজ বললে—নেই।

—তা কেউ যদি তোর না থাকবে তো এত রূপ নিয়ে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিলি কেন?

এ-কথার উত্তরে মুমতাজ আর কী বলবে?

নানীবেগম অনেক করে তাকে লুকিয়ে রাখতো প্রথম-প্রথম। নিজের কাছে কাছে নিয়ে শুতো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো। একলা ছাড়তো না চেহেল-সুতুনের মধ্যে।

খোজা সর্দারকে ডেকে বলে দিয়েছিল—মুমতাজকে খুব চোখে-

চোখে রাখবে পীরালি—

—জী বেগমসাহেবা।

নানীবেগম আরো বলে দিয়েছিল—বাইরে থেকে যদি কেউ আসে তো তার কাছে কাছে থাকবে, যেন মুমতাজ বাঈ-এর কাছে ঘেঁষতে না পারে।

পীরালি খাঁ বললে—জী।

পীরালির সব কথাতেই ওই একই উত্তর—জী।

তখনও কোনও কাজ দেয়নি নানীবেগম। সঙ্গে নিয়ে মসজিদে যেত। কোরাণ পড়ে শোনাতে বলতো।

জিজ্ঞেস করতো—তোর এ-সব কাজ ভালো লাগে তো?

মুমতাজ বলতো—হ্যাঁ, বেগমসাহেবা—

—ভালো না লাগলে আমাকে বলবি।

তারপর বলতো—একলা-একলা থাকতে তোর খুব খারাপ লাগছে, না রে?

মুমতাজ বলতো—না বেগমসাহেবা।

—না রে, খারাপ তো লাগবেই। যার আদমী মারা যায় তার মনে কি সুখ থাকে রে? সুখ থাকে না।

এমনি কত করে বোঝাতো নানীবেগম।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—তুই সাদি করবি মুমতাজ?

মুমতাজ চোখ নিচু করে ফেলেছিল। সে-কথার কোনও উত্তর দেয় নি।

নানীবেগম আবার জিজ্ঞেস করেছিল—সত্যি বল তুই, সাদি করবি?

মুমতাজ বলেছিল—না—

—লজ্জা করিসনি আমার সামনে। যদি তোর কাউকে পছন্দ হয়ে থাকে তো বল, আমি তাকে চেহেল-সুতুনে আনিয়ে মোল্লা ডাকিয়ে সাদি দিয়ে দেব—

মুমতাজ বলেছিল—না বেগমসাহেবা, আমি সাদি করবো না।

শেষে একদিন মীর্জাই কথাটা তুললো।

বললে—নানীজী, তোমাকে একটা কথা বলবো?

নানীজী বললে—কী বল্‌ না?

—সফিউল্লা মুমতাজকে বিয়ে করতে চায়।

—কে সফিউল্লা ?

মীর্জা বললে—আমার ইয়ার।

—তোর ইয়ার আমার মুমতাজকে দেখলে কী করে ?

—দেখেছে নানীজী। যখন আমীর শ্বশরু সাহেব বেঁচে ছিল তখনই দেখেছে, দেখে দিল্ বিগড়ে গেছে। কিন্তু এখন তোমার মেহেরবাণী।

সে-সব অনেকদিন আগের কথা। সে-সব দিনের কথা হঠাৎ আবার মনে পড়ে গেল মুমতাজের।

নানীবেগম একদিন এসে জিজ্ঞেস করলে—মুমতাজ, তুই সাদি করবি ?

মুমতাজ বললে—আমি তো তোমাকে বলে দিয়েছি নানীজী।

—ওরে, মেয়েরা কি মুখ ফুটে বিয়ের কথা বলতে পারে ?

মুমতাজ বললে—কেন ও-কথা বলছো তুমি নানীজী। আমি সাদি করবো না।

—সাদি না করে জীবন-ভোর এই চেহেল-সুতুনে পড়ে থাকবি নাকি ?

—তা পড়ে থাকলে দোষ কী ?

নানীবেগম বললে—কিন্তু চিরকাল তো আমি থাকবো না রে—

মুমতাজ বললে—তুমি যেখানে থাকবে, আমিও সেখানে থাকবো নানীজী, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না—

নানীজী মুমতাজের মাথাটা নিজের কোলে টেনে নিয়ে আদর করতে লাগলো।

বললে—ওরে, তা নয় বেটি, তা নয়, আমারও তো একদিন শেষ হবে। চিরকাল তো দুনিয়ায় কেউ বাঁচতে আসে নি। আমি মরে গেলে তোর কী হবে সেটা একবার ভেবেছিস ?

মুমতাজ তখন নানীজীর কোলের ভেতরে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। চোখ তার জলে ভরে গেছে।

বললে—তুমি না থাকলে আমিও থাকবো না নানীজী—আমারও বেঁচে দরকার নেই—

নানীজী বলতো—দূর, দুনিয়াদারির তুই কিছুই বুঝিস না রে বেটি, দুনিয়াদারি আলাদা চিজ্। সেখানে কেউ তোকে খাতির-খেদমত্ করবে না। দুনিয়া তার পাওনা-গণ্ডা কড়ায়-ক্রান্তিতে উশুল করে

নেবে। সে কেউ আটকাতে পারবে না—দিল্লীর বাদশাই বলে দুনিয়াদারির হাত থেকে রেহাই পায়নি, আর তুই তো কোন্ ছার!

মুমতাজ নানীবেগমের কথাগুলো বসে বসে তখন কেবল শুনতো আর আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতো।

মনে হতো এই নানীবেগমের আশ্রয়ের বাইরে গেলেই তাকে সবাই ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাবে। মনে হতো যেন সবাই তাকে গ্রাস করবে, সবাই যেন গিলে ফেলবে।

মাঝে মাঝে চেহেল-সুতুনের মধ্যে ভীষণ ভয় পেত মুমতাজ। কী যেন এক অজানা ভয়। মনে হতো এখানে সবাই তার শত্রু। আরো কত বেগম রয়েছে চেহেল-সুতুনে। পেশমন বেগম, মরিয়ম বেগম, গুলসন বেগম, বব্বু বেগম।

একদিন পেশমন বেগম ধরেছিল তাকে।

জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কে ভাই? নতুন এসেছ?

মুমতাজ বললে—না।

—তোমার নাম কী?

—মুমতাজ বাঈ।

—তোমার দেশ কোথায়?

মুমতাজ বললে—মুর্শিদাবাদ।

—মুর্শিদাবাদ?

পেশমন বেগম অবাক হয়ে গিয়েছিল।

বলেছিল—মুর্শিদাবাদ থেকে কেন তুমি ভাই মরতে এলে এখানে? কে নিয়ে এল? নবাবের আড়কাটি?

মুমতাজ বললে—না নানীবেগমসাহেবা আমাকে নিয়ে এসেছে—

—নানীবেগমসাহেবা? নানীবেগমসাহেবা কী করে তোমার তালাশ পেলে? কী মতলোব?

মুমতাজ বললে—আমার আদমী আমীর খশরু।

—তুমি আমীর খুশরু সাহেবের বিবি? তা এখানে এলে কেন ভাই?

সবারই ওই এক প্রশ্ন। সবাই যেন মন-মরা হয়ে থাকতো চেহেল সুতুনের ভেতরে। সরাব ছিল, আরক ছিল, বাঁদী খোজা সব ছিল, তবু যেন কারো মন ভরতো না।

তবু সন্ধ্যে হবার পরেই যেন অন্য চেহারা হয়ে যেত চেহেল-

সুতুনের। বাইরে নহবৎখানা থেকে নহবৎ বাজতে সুরু করতো আর ভেতরে তখন আতর-ওড়নী-জেবর-সরাবের বন্যা বয়ে যেত। মহলে মহলে রোশনাই জ্বলে উঠতো। ধুপ-ধুনো-গুগ্গুলের গন্ধে ভরে উঠতো বেগম-মহল। গানের সুর ভেসে আসতো, নাচের ছন্দ।

যারা আরো অনেক বুড়ি হয়ে গেছে, তারা গড়গড়ায় শুয়ে শুয়ে তামাক খেত। নবাব সুজাউদ্দীনের আমলের বেগম সব। এককালে রূপসী ছিল, খুবসুরত ছিল। এককালে রূপের জুলুস দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিল নবাব-আমীর-ওমরাওদের।

তখনও নেশা ছাড়তে পারেনি অনেকে। বুড়ি হয়ে গেছে, মুখের মাংস ঝুলে গেছে, বাতের দাওয়াই নিয়ে চলা-ফেরা করে, ভালো করে সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না তখন। কিন্তু নেশা ছাড়ে নি, বাঁদীরা শিয়রে বসে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। আর খোজারা রূপোর গড়গড়ার ওপর ঘন ঘন কলকে বদলে দিয়ে যায়।

একটু কানে শব্দ এলেই সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করে।

বলে—কে যায়? কৌন্?

মুমতাজ ভয়ে ভয়ে বলে—আমি।

—আমি কে? তুমরা নাম কেয়া? কাঁহাসে তুম আতি হো?

তারপরে যখন সব শোনে তখন বলে—কেঁও আয়ি বেটি? ইধার কেঁও আয়ি?

সকলেরই এক কথা। জীবনে যে একদিন কত আরাম করেছে, কত ফুর্তি করেছে, কত মেহ্ফিল উড়িয়েছে, সে-সব কাহিনী যেন তখন দুঃস্বপ্নের মত তাদের জর্জরিত করে দেয়।

—না বেটি, তুই আর ওদিকে যাস্নে। তুই আমার গুলজারি বাঈকে দেখ, গুলজারির খেদমত্ কর। একটা তবু কাজ হবে তোর।

নানীবেগমের বড় পেয়ারের বিল্লি।

গুলজারি বাঈ এককালে সৌখীন বেড়াল ছিল চেহেল-সুতুনে। এককালে তার জন্যে দিল্লি থেকে দামী আতর আসতো। নবাব আলিবর্দী যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন খাবার আগে গুলজারি বাঈকে ডাকিয়ে আনতো।

যেন একটা পশমের গোলা। সোনালী-সবুজ-রূপালী পশমের ডেলা একটা। নবাব খানা খেত। আর পাশে বসে থাকতো গুলজারি।

নবাব কথা বলতো গুলজারির সঙ্গে।

একপাশে বসতো বেগমসাহেবা আর একপাশে গুলজারি বাঈ।

নবাব গুলজারিকে জিজ্ঞেস করতো—এত গোসা কেন রে গুলজারি? কার ওপর গোসা?

নানীবেগম বলতো—ও আলি জাঁহার ওপর গোসা করেছে।

নবাব হাসতো। বলতো—কেন, আমি আবার কী কসুর করলাম?

—বা রে! তুমি যে ওর সঙ্গে দিনভর কথা বলোনি!

—ও, তাই বটে!

কিন্তু গুলজারি একটা অবলা বেরাল। ও কী করে বুঝবে নবাবি চালানো কী খতরনাক কাজ! ও কী করে বুঝবে দুনিয়াদারি কী জিনিস! চারদিকে দুষমন নিয়ে যে নবাব খাওয়ার সময় পান সেইটেই তো খোদার মেহেরবানি! আর শত্রু কি শুধু বাইরের? শত্রু ঘরের ভেতরেও যে আড়ালে লুকিয়ে আছে।

তারপর কতদিন কেটে গেছে। সে নবাবও নেই, সে চেহেল-সুতুনও নেই। সেই নানীবেগমও আর সে-নানীবেগম নেই। এখন সব বদলে গেছে। বাইরের ঠাট্ ঠিক তেমনি আছে। তেমনি করেই সকালে বিকেলে সন্ধ্যেয় সদর দরওয়াজার মাথায় নহবৎ বাজায় সরকারি নহবতিয়া। ভেতরে পীরালি খোজা-সর্দার তেমনি করেই খোজার দলকে নিয়ে পাহারা দেয়। কিন্তু মীর্জা মহম্মদ নবাব হওয়ার পরই তার ভেতরের চেহারা বদলে গিয়েছে।

মুমতাজ সেটা বুঝতে পারে।

নানীবেগমের মুখের চেহারাখানা দেখলেই সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

অনেকদিন রাত্রে নানীবেগমসাহেবার মহলে গিয়ে দেখেছে তার বাঁদী জুবেদা দরজার সামনে মেঝের ওপর পড়ে পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। আর নানীবেগমসাহেবা তখন আলোর সামনে বসে মুখ নিচু করে কোরাণ পড়ছে।

আস্তে আস্তে মুমতাজ আবার নিজের মহলের দিকে ফিরে আসে। এসে বিছানার ওপর গা এলিয়ে দেয়।

কিন্তু মুশ্‌কিল বাধলো গুলজারি বাঈ-এর বেমার হয়ে।

একদিন সোজা গিয়ে হাজির হলো নানীবেগমের কাছে।

—কী রে বেটি? কী হয়েছে?

মুমতাজ বললে—গুলজারি বাঈএর বেমার হয়েছে নানীজী।

—কই দেখি ?

নানীবেগমসাহেবা উঠলো। গুলজারি বাঈএর মহালের দিকে যেতে যেতে বললে—কী হয়েছে ?

মুমতাজ পেছন-পেছন যাচ্ছিল।

বললে—কিছু খাচ্ছে না নানীজী, দুধ খাচ্ছে না, গোস্ ভি খাচ্ছে না—

—মেওয়া ? শুখা মেওয়া ?

মুমতাজ বললে—তাও খাচ্ছে না, আমি সব রকম কোশিস্ করেছি—

—চল্ দেখি !

গুলজারি বাঈএর মহালে রূপোর খাঁচার ভেতরে তখন চুপ করে ঝিমোচ্ছিল গুলজারি।

নানীবেগম কাছে গিয়ে ডাকলে—গুলজারি—

গুলজারি চেনা গলার আওয়াজ পেয়ে ঘাড় তুলে একটু চাইলে।

নানীবেগম গুলজারীকে কোলে তুলে নিলে।

—কেয়া হুয়া তুমরা গুলজারি ? কেয়া তখ্‌লিপ্ ?

অনেকক্ষণ ধরে অনেক আদর অনেক খাতির করলে নানীবেগম। কিন্তু গুলজারির মন গললো না তবু। আবার গুলজারিকে রেখে দিলে খাঁচার ভেতর।

তারপর খোজা সর্দার পীরালিকে ডেকে বললে—মীর মুনশীকে খবর দে, হেকিম-সাহেবকে এত্তেলা দেবে। এসে যেন গুলজারিকে ইলাইজ করে।

বলে নানীবেগম আবার নিজের মহালের দিকে চলে গেল।

এর পর হেকিম-সাহেব এসেছে, মুর্শিদাবাদ চক্-বাজার থেকে কাফের বৈদ্জী এসেছে, মোটা টাকা নিয়ে গেছে মীর মুনশীর কাছ থেকে। দাওয়াইও দিয়েছে। কিন্তু গুলজারির অসুখ সারেনি। আরো গম্ভীর হয়ে গেছে গুলজারি বাঈ। আরো যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।

শেষকালে কাশিমবাজার কুঠি থেকে এল ফিরিঙ্গি হেকিম সাহেব।

নানীবেগমসাহেবা এসে ডাকলে, মুমতাজ—

—কী নানীজী !

—ফিরিঙ্গি হেকিম এসেছিল ?

—হ্যাঁ, নানীজী !

—দাওয়াই দিয়েছে ?

মুমতাজ বললে—দাওয়াই পাঠিয়ে দেবে বলে গেছে ?

—কী বললে দেখে ফিরিঙ্গি হেকিম ?

কী বলবে মুমতাজ, বুঝতে পারলে না।

নানীবেগম আবার জিজ্ঞেস করলে—সারবে ? বেমার ভালো হবে ?

মুমতাজ বললে—হ্যাঁ নানীজী। সাহেব বলে গেল এর একটা জোড়া চাই—

—কীসের জোড়া ?

—একটা মরদ বিল্লি আনতে হবে।

নানীবেগম বললে—মরদ বিল্লি তো চেহেল-সুতুনে অনেক আছে। মুর্শিদাবাদ সহরেও আছে। মতি-ঝিলেও আছে।

মুমতাজ বললে—তাতে চলবে না নানীজী। হেকিম-সাহেব বলেছে খাস-কাবুলের জাত্-বিল্লি আনতে হবে।

—সে কে আনবে ?

—বললে—তা জানি না নানীজী।

নানীবেগমও বুঝতে পারলে না সে বেরাল কোথা থেকে আসবে। কে আনবে। দিল্লির ভকীল-সাহেবকে খবর দিলে হয়ত কাবুল থেকে আনিয়ে দিতে পারে।

ভাবতে ভাবতে নানীবেগম আবার তার নিজের মহালের দিকে চলে গেল।

কিন্তু ক্যাম্পবেল সাহেব আসার পর থেকেই আবার যেন সব ভালো লাগতে লাগলো মুমতাজের। আবার যেন চেহেল-সুতুনের সব কিছু অন্যরকম চেহারা নিলে। মনে হলো সাহেব আর একবার এলে যেন ভালো হয়।

নানীবেগমসাহেবার কাছে গিয়ে ভাবলে বলবে। নানীবেগম-সাহেবার মহলে পর্যন্ত গেল।

নানীবেগম জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কিছু বলবি ?

মুমতাজের মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়েও বেরোল না যেন।

—গুলজারি কেমন আছে রে আজ ?

মুমতাজ বললে—ভালো নেই নানীজী।

নানীবেগম বললে—তুই মন খারাপ করিস নি। আমি আর

গুলজারির কথা অত ভাবতে পারি নে। আমার নিজের কথা কে ভাবে তার ঠিক নেই! আমি কতজনের কথা ভাববো? মীর্জার কথা ভাববো না ঘসেটির কথা ভাববো?

সত্যিই তো, তিন মেয়ে, তিন মেয়েই যেন শত্রু হয়ে উঠেছে আজ। সবাই মীর্জার দুষমন হয়ে উঠেছে। মীর্জার নিজের মা-ও যেন ছেলের নবাব হওয়া সহ্য করতে পারছে না।

—নানীজী।

—কী রে, আবার কিছু বলবি?

আচ্ছা নানীজী, ফিরিঙ্গি হেকিম-সাহেবকে আর একবার ডেকে পাঠাবো?

—তা ডাক্ না। পীরালিকে বল্, মীর মুনশীকে খবর দেবে!

কথাটা বলেই যেন বড় লজ্জায় জড়ো-সড়ো হয়ে পড়লো মুমতাজ। যেন আবার চোখাচোখি হয়ে গেল ফিরিঙ্গি সাহেবের সঙ্গে। চোখের সামনেই যেন ভেসে উঠলো চোখ দুটো। যেন সাহেব তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তার সর্বাঙ্গ দেখছে।

—নানীজী!

নানীবেগম এবার অবাক হয়ে গেছে। কোরাণ ছেড়ে কাছে এল। চিবুকটা ধরে মুখটা উঁচু করে দেখলে।

বললে—কি হয়েছে রে তোর? তোরও বেমার হলো নাকি? চোখ-মুখ এত লাল কেন রে?

মুমতাজ নানীবেগমের বুকের ওপর নিজের মুখটা ঢেকে ফেললে। মনের যত কথা ছিল সব যেন কান্না হয়ে উজাড় করে দিলে নানী-সাহেবার বুকের ওপর।

—তোরও বুখার?

কপালে হাত দিয়ে দেখলে মুমতাজের গা পুড়ে যাচ্ছে গরমে।

—তুইও আবার বোখার বাধিয়ে বসলি? তাহলে আমার গুলজারিকে কে দেখবে?

মুমতাজ নানীবেগমের বুকে মুখ গুঁজেই বললে—আমার বুখার হয়নি নানীজী, বুখার হয়নি।

—হয়নি বলছিস কেন? এই তো আমি দেখছি হয়েছে।

তারপর মুমতাজকে ধরে বেমার-মহলের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললে—তুইও আমাকে শেষ পর্যন্ত জ্বালালি? আমাকে কি কেউ

একটু শান্তি দেবে না? নিজের মেয়ে-জামাই-নাতি তুই সবাই মিলে আমাকে জ্বালাবি?

চলতে চলতে বেমার-মহলে গিয়ে একটা ঘরের বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে মুমতাজকে।

তারপর পীরালি খাঁকে ডেকে বললে—চেহেল-স্তুনের হেকিম-সাহেবকে ডেকে নিয়ে আয় তো—

—জী বেগমসাহেবা! বলে পীরালি খাঁ চলেই যাচ্ছিল।

কিন্তু মুমতাজ বললে—না নানীজী, তোমার পায়ে পড়ি হেকিম-সাহেবকে ডাকতে হবে না।

নানীবেগম রেগে গিয়ে বললে—হেকিম-সাহেবকে ডাকতে হবে না তো তোর অসুখ সারবে কী করে?

—না নানীজী, তুমি সেই ফিরিঙ্গি হেকিম-সাহেবকে ডাকাও। কাশিমবাজার কুঠির—সে ভালো হেকিম, আমার রোগ ধরতে পারবে।

নানীবেগম অবাক হয়ে গেল। বললে—কী করে বুঝলি?

—আমি জানি নানীজী, ওরা ফিরিঙ্গিরা বেশি জানে।

—ঠিক আছে, তাহলে তাই ডাকাই। বলে পীরালি খাঁকে বললে —তুই মীর মুনশিকে খবর দে, সেই কাশিমবাজার কুঠি থেকে ফিরিঙ্গি-হেকিমকে ডেকে আনবে।

পীরালি খাঁ হুকুম পেয়ে সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

সে এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠলো দু'জনের মধ্যে। একজন সুদূর কোন্ এক দ্বীপ থেকে ভবঘুরের মত একদিন বেরিয়ে পড়েছিল নিরুদ্দেশে পাড়ির উদ্দেশে, তারপর সে অনেক ঘাটের জল খেয়ে এখানে এই বাঙলাদেশে এসে আটকে পড়লো।

আবার ডাক পড়ে চেহেল-স্তুন থেকে, আবার সাহেব এসে হাজির হয় তাঞ্জামে। চেহেল-স্তুনের সবাই জেনে গেছে। সাহেবও জেনে গেছে, মুমতাজও জেনে গেছে।

সাহেব এলেই মুমতাজ বেমার-মহলের মধ্যে উঠে বসে।

সাহেব জিজ্ঞেস করে—কেমন আছো তুমি? হাউ আর ইউ?

অনেকদিন এসে এসে সেই প্রথম দিনের আড়ষ্টতা কেটে গেছে দু'জনেরই।

মুমতাজ বলে—আমার কথা কাউকে তুমি বলো নি তো সাহেব?

ক্যাম্পবেল্ তখন বুঝে নিয়েছে যে চেহেল-সুতুনের কথা বাইরের কাউকে বলতে নেই। তবু বললে—কাকে আবার বলবো?

মুমতাজ বলে—সেবার যে বললে কাকে তুমি বলে দিয়েছিলে?

—সে তো ইয়াসিন, আমার বন্ধু।

মুমতাজ বললে—কী বলেছিলে?

—বলেছিলুম তুমি খুব বিউটিফুল।

—বিউটিফুল মানে?

সাহেব একটা একটা করে ইংরিজী কথা শিখিয়ে দিয়েছিল।

বললে—বিউটিফুল মানে জানো না? বিউটিফুল মানে সুন্দর, খুবসুরত।

—তুমি আমার চেয়ে কিন্তু আরো সুন্দর! আরো খুবসুরত!

দু'জনেই হাসে।

ইয়াসিন প্রথম দিনেই জিজ্ঞেস করেছিল—কী রকম দেখতে?

—খুব বিউটিফুল!

—তোকে কেন ডেকেছিল? বেড়ালের রোগ তুই সারাতে পারবি বলেছিস?

—বলেছিলুম পারবো।

—কী করে সারাবি! বেড়ালের রোগের ওষুধ জানিস?

কাশিমবাজার কুঠির সাহেবরাও বলেছিল—তুমি যে বলে এলে রোগ সারিয়ে দেবে, তা সারাতে পারবে তো বেল্?

ক্যাম্পবেলের নিজেরও সন্দেহ ছিল সারাতে পারবে কি না। না পারে না পারবে। রোগ যদি নাও সারে দেখতে তো পাবে মুমতাজকে।

প্রথম দিন মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে গিয়েই খানিক অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপর একা একা কোথায় বেরিয়ে গেল টের পেলে না কেউ।

ইয়াসিন এসেছে দেখা করতে।

কলেট জিজ্ঞেস করলে—কী নিউজ ইয়াসিন?

ইয়াসিন বললে—খবর তো সাহেবের কাছে। সাহেব কোথায়? সাহেব আসেনি?

কলেট বললে—এসেছে।

—তাহলে গেল কোথায়?

—এই তো এখানে ছিল এতক্ষণ। নবাবের সেরেস্তা থেকে একটা মোতর ফিস্ পেয়েছে। খুব আহ্লাদ।

—আর কী হলো সেখানে? কার অসুখ?

কলেট বললে—একটা বেড়ালের।

—বেড়ালের অসুখের জন্যে সাহেবকে ডাকা? তাহলে গুলজারি বাঈ কে?

কলেট বললে—লেট নবাবের বেগমের ক্যাট্। সেই ক্যাটের নাম গুলজারি বাঈ। ভেরি স্ট্রেঞ্জ। তোমরাও তো কেউ জানতে না। আমি হোম-ডেস্‌প্যাচে তাই লিখে দিয়েছি।

—তা সাহেব গেল কোথায়? জিজ্ঞেস করলে ইয়াসিন।

কেউ জানে না কোথায় গেল। সেদিন সাহেবকে খুঁজেই পাওয়া যায় নি। সারাদিন গঙ্গার ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে কেবল।

ইয়াসিন পরের দিনও এল। সেদিনও জিজ্ঞেস করলে—বেল্ সাহেব কোথায়?

কলেট বললে—সে এখন খুব ব্যস্ত।

—কেন, বেল্-সাহেবকে তো কখনও ব্যস্ত দেখিনি। কিসের এত রাজ-কার্য তার?

কলেট বললে—সে বেড়াল খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা—

—বেড়াল? বিল্লি?

কলেট বললে—হ্যাঁ, একটা মদ্দা বেড়াল।

ইয়াসিন বললে—সে তো হাটে-মাঠে-বাজারে ছড়ানো আছে কাশিমবাজারে। ক'টা চাই?

কলেট বললে—হারেমের বেগমদের খেয়াল যখন হয়েছে তখন তা চাই-ই। আর যে-সে ক্যাট নয়, একেবারে কাবুল-ক্যাট্—

তা সত্যিই সে ক'দিন খুবই খুঁজেছে। মাঝখানে কলকাতাতেও গিয়েছিল। উমিচাঁদের বাড়িতেও গিয়েছিল একদিন।

উমিচাঁদ সাহেবকে দেখে অবাক। বললে—কী হলো সাহেব, আবার ফিরলে যে? কাশিমবাজার ভালো লাগলো না?

ক্যাম্পবেল্ বললে—আমি একটা কাজে এসেছি মিস্টার উমিচাঁদ, আমাকে হেল্‌প্ করতে হবে, পারবে?

—কী হেল্‌প্, বলো?

—একটা মদ্দা কাবুলি বেড়াল জোগাড় করে দিতে পারো?

—সে কী, বেড়াল কী করবে?

—আমার জন্যে নয়, চেহেল-সুতুনের হারেমের বেগমের জন্যে।

উমিচাঁদ বললে—আমি আনিয়ে দিতে পারি। আমার এজেন্ট আছে সেখানে। কিন্তু সে তো আসতে দেরি হবে।

—কত দেরি?

—তা তিন মাসের আগে নয়।

—অত দেরী করলে চলবে না, আমার আরো তাড়াতাড়ি চাই।

উমিচাঁদের কেমন সন্দেহ হলো। বললে—তোমার এত কিসের তাড়া সাহেব?

ক্যাম্পবেল্ বললে—আমি যে রোগী দেখছি—

—রোগী কে? কোন্ বেগম?

—বেগম নয় গুলজারি বাঈ।

—নানীবেগমের বিল্লি? তাই বলো! সেইজন্যেই তোমার এত তাড়া। আমি তাড়াতাড়ি আনিয়ে দেবার চেষ্টা করবো। কত টাকা দেবে?

ক্যাম্পবেল্ বললে—টাকা আমি দেব না, নানীবেগমসাহেবাই দেবে কত লাগবে বলো তুমি?

—একশো আশরফি।

—তা তাই-ই দিতে বলবো। নবাবের তো টাকার অভাব নেই।

—তাহলে কথা দিচ্ছ ঠিক?

—টাকা কি আগে দিতে হবে?

উমিচাঁদ বললে—আগে দিলেই ভালো হয়। কারবারি লোক আমরা, টাকা আগে দিলে কাজের সুবিধে হয়।

—ঠিক আছে, আমি আগাম টাকাই চাইবো নানীবেগমের কাছে।

বলে সেইদিনই কলকাতা থেকে আবার কাশিমবাজার কুঠিতে ফিরে এল সাহেব। এবার খুশী খুশী ভাব।

কলেট চেহারা দেখে অবাক।

জিজ্ঞেস করলে—কী হলো, ক্যাট্ পেয়েছ?

—পেয়েছি। উমিচাঁদ সাহেব জোগাড় করে এনে দেবে বলেছে।

কলেট বললে—উমিচাঁদের পাল্লায় পড়েছ তো, তাহলেই হয়েছে। লোকটা ডিস্অনেস্ট্, কত টাকা চেয়েছে?

—একশো গিনি। তা আমার কী? টাকা তো আমি পকেট থেকে দেব না, টাকা দেবে যার বেড়াল সে। নানীবেগমসাহেবার কি টাকার অভাব?

সেদিন ওই পর্যন্তই।

কিন্তু হঠাৎ মীর মুনশী আবার ডাকতে এল। আবার তলব হয়েছে চেহেল-সুতুনে।

—কী হলো মীর মুনশী? গুলজারি বাঈ কেমন আছে?

—আবার তলব হয়েছে, আর একবার যেতে হবে আপনাকে।

তা ভালোই হলো। আবার সেই তাঞ্জাম, আবার সেই পাঞ্জা।

বেমার-মহলে ঢুকেই কিন্তু অবাক হয়ে গেল ক্যাম্পবেল্।

—তোমার অসুখ?

মুমতাজ সেদিন হাসলো একটু।

সাহেব জিজ্ঞেস করলে—হাসছো কেন? অসুখ নয়?

—অসুখ না হলে কি তোমাকে মিছিমিছি ডেকেছি সাহেব।

—কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে না শরীর খারাপ!

পর্দার আড়ালে বসেই কথা হচ্ছিল।

সাহেব বললে—হাতটা বাড়িয়ে দাও তো, দেখি—

মুমতাজ তার হাতটা বাড়িয়ে দিলে জালি-পর্দার বাইরে। সাহেব নিজের হাত দিয়ে ধরলে তার হাতটা। বড় নরম ঠেকলো সাহেবের কাছে। মাখমের মত নরম আর সাদা হাত তার।

সাহেব অনেকক্ষণ ধরে হাতটা চেপে ধরে রইল।

মুমতাজ বললে—এতক্ষণ ধরে কী দেখছো?

সাহেব বললে—তোমার তো কিছু হয়নি।

—সত্যি আমার অসুখ হয়েছে, বিশ্বাস করো। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

সাহেব বললে—ও-কথা বোল না আমাকে, বলতে নেই।

—কেন, তোমার ভয় করছে?

সাহেব বললে—আমি তো ইণ্ডিয়ান নই, আমাকে ও-কথা বোল না। কেউ শুনতে পেলে তোমার ক্ষতি হবে।

—কেউ যাতে শুনতে না পায়, তার ব্যবস্থা করেছি।

—কী ব্যবস্থা?

—চেহেল-সুতুনে যে আমাদের খোজা-সর্দার পীরালি খাঁ আছে, তাকে রিশ্‌শত্ দিয়েছি।

—কেন মিছিমিছি ঘুষ দিতে গেলে? তোমার টাকা নষ্ট হলো।

মুমতাজ বললে—আমার কি টাকার অভাব সাহেব? আমার অনেক টাকা আছে। আমার স্বামীর অনেক টাকা ছিল, সে সব আমি সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসেছি, লাখ-লাখ টাকা। সে কেউ জানে না।

—তোমার যদি অত টাকা তো এই চেহেল-সুতুনে এলে কেন?

—ওই টাকার ভয়ে।

—শুধু টাকার ভয়?

মুমতাজ বললে—কিছু মনে কোর না সাহেব, টাকার ভয় তো ছিলই, আমার রূপেরও ভয় ছিল। আমি ইচ্ছে করলে আমার এই রূপ দিয়ে এই চেহেল-সুতুনে আগুন ধরিয়ে দিতে পারতুম। আমার স্বামী থাকলে আমার কোনও ভয় ছিল না, কিন্তু এখন যে আমি বিধবা।

সাহেব বললে—কিন্তু এখন কি ইচ্ছে করলেই এই চেহেল-সুতুন থেকে বেরোতে পারো?

মুমতাজ বললে—না এখন আর উপায় নেই।

তারপর একটু থেমে বললে—সেই জন্যেই তো তোমায় ডেকেছি সাহেব। তুমি আমাকে বাঁচাও—

সাহেব ভয় পেয়ে গেল। চারিদিকে অসহায়ের মত চাইতে লাগলো।

মুমতাজ বললে—তোমার কোনও ভয় নেই, এখানে কেউ আসবে না, আমি টাকা কবুল করে খোজাদের সরিয়ে দিয়েছি—সর্দার-খোজা বেমার-মহলের খিড়কীতে পাহারা দিচ্ছে—

সাহেব বললে—তুমি আমাকে আর লোভ দেখিও না মুমতাজ, আমি রাস্তার লোক, আমার টাকা-পয়সা-চাকরি কিছুই নেই। আমি কাশিমবাজার কুঠির সাহেবদের দয়ায় খেতে পাই।

—কিন্তু তুমি তো হেকিম, তুমি তো হেকিমি করো, ওদের দাওয়াই দাও।

সাহেব বললে—আমি হেকিম, কিন্তু টাকা তো নিই না কারো কাছ থেকে—আমি ইণ্ডিয়াতে এসেই হেকিমি শিখেছি, তাই টাকা নিতে লজ্জা করে।

—তোমার টাকার দরকার?

সাহেব হাসলো। বললে—আমার বন্ধু আছে কলেট, সে-ই আমাকে খাওয়ায়, পরায়—আমার টাকার দরকার নেই।

মুমতাজ বললে—এক কাজ করবে?

—কী কাজ?

মুমতাজ বললে—আমি আর এখানে থাকবো না। এখান থেকে চলে যাবো—

—কেন?

—আমার আর ভালো লাগছে না এখানে থাকতে।

সাহেব অবাক হয়ে গেল। বললে—কিন্তু গুলজারি বাঈ? তার জন্যে যে আমি সব বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলেছি—

—কী ব্যবস্থা করেছ?

—উমিচাঁদকে বলে কাবুল থেকে একটা জুড়ি আনতে বলে দিয়েছি!

মুমতাজ বললে—কে তোমাকে তা করতে বললে?

—তুমিই তো বলেছিলে, মনে নেই?

মুমতাজ বললে—কই, আমার কিছু মনে পড়ছে না। আমি সব ভুলে গেছি।

সাহেব বললে—তুমি ভুলে যেতে পারো, আমি কী করে ভুলবো? আমি এখান থেকে যাওয়ার পর থেকেই তো গুলজারি বাঈএর ব্যাপার নিয়ে ভাবছি—

—আশ্চর্য!

মুমতাজ বললে—সত্যিই আশ্চর্য—

—কেন, আশ্চর্য কেন?

মুমতাজ বললে—আশ্চর্য নয়? আমি একটা জলজ্যান্ত মেয়েমানুষ পড়ে রইলুম, আর তুমি কিনা একটা বিল্লিকে নিয়ে ভেবে অস্থির?

সাহেব বললে—তোমার কথাও তো ভেবেছি। যখনই গুলজারি বাঈএর কথা ভেবেছি তখনই তোমার কথা মনে পড়েছে,—

—কেন, গুলজারি বাঈএর কথা ভাবলে আমার কথা মনে পড়তো কেন?

সাহেব হাসলো। বললে—আমার মুখ থেকেই কথাটা শুনতে চাও?

মুমতাজ বললে—এখানে তো কেউ শুনতে পাচ্ছে না, বলো না। আমি তো পীরালি খাঁকেও এখানে আসতে বারণ করে দিয়েছি। বেমার-মহলে এখন কেউ নেই, শুধু তুমি আর আমি।

—ওর কথা ছেড়ে দাও, ও কি মানুষ?

সাহেব বললে—মানুষকেই বুঝি তুমি ভয় করো?

মুমতাজ বললে—মানুষই আমার শত্রু, তা জানো? আমি বিধবা হবার পর মুর্শিদাবাদের মানুষই আমাকে সবচেয়ে বেশি জ্বালিয়েছে। বিশেষ করে যারা বড়লোক।

—কে? তারা কারা?

মুমতাজ বললে—নবাবের ইয়ারবক্সীর দল, সফিউল্লা খাঁ, মহম্মদ নেশার, ওরা—সেদিন চেহেল-সুতুনে না এলে আমি তাদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারতুম না। আমি জানতুম যে একবার এখানে এলে আর বেরোন যায় না, তবু অন্য কোনও উপায় না পেয়ে এখানে এসেছি।

—এখন তো আর তারা তোমার নাগাল পায় না?

মুমতাজ বললে—এখনও সফিউল্লা সাহেব হাল ছাড়ে নি।

—সে কী?

—হ্যাঁ, সফিউল্লা সাহেব মনে করে আমি তো বেওয়ারিশ মাল, না-ঘাট্‌কা—না-ঘরকা, আমার ওপর এখনও তাই তার এক্তিয়ার আছে।

সাহেব জিজ্ঞেস করলে—তাহলে তুমি কী করবে?

—সেইজন্যেই তো বলছি সাহেব, আমায় তুমি বাঁচাও। আমার বেমার হোক আর না হোক, আমার কাছে মাঝে মাঝে তুমি এসো, আমি নানীবেগমসাহেবাকে বলে মীর মুনশীকে দিয়ে তোমার কাছে পাঞ্জা পাঠাবো।

হঠাৎ যেন কার পায়ের শব্দ হলো পর্দার ওপাশে।

কে?

মুমতাজ ভয় পেয়ে গেছে। ওখানে কে?

—মুমতাজ?

গলা শুনেই মুমতাজ চমকে উঠেছে। বললে—তুমি যাও সাহেব, আমি তোমাকে আবার ডেকে পাঠাবো মীর মুনশীকে দিয়ে।

সাহেব সেদিনও চলে এল চেহেল-সুতুনের বাইরে।

ঘটনাটা এমনি করেই গড়াচ্ছিল। কিন্তু আর এগোল না। হঠাৎ

কলকাতায় কোম্পানীর দপ্তর থেকে খবর এল ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের লড়াই বেঁধে গেছে ইউরোপে।

কলেট সেদিন সোজা চলে গেল কলকাতায়। যাবার আগে ডাকলে ক্যাম্পবেলকে।

বললে—তুমি কলকাতায় যাবে বেল্?

—কেন, আমি কলকাতায় গিয়ে কী করবো?

কলেট বললে—দেখ বেল্, আগে আমাদের একটা এনিমি ছিল, একজনের সঙ্গেই বোঝাপড়া করতে হচ্ছিল, এবার দু'টো ফ্রন্ট হয়ে গেল আমাদের—ড্রেক বড় ভাবনায় পড়েছে, ওদিকে এ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসন্ বলে একজন আসছে, আর সঙ্গে আসছে ক্লাইভ—

—ক্লাইভ? সে আবার কে?

—ম্যাড্রাসের কুঠির লোক। ম্যাড্রাসের সেণ্ট ফোর্ট ডেভিড্ কন্‌কার করবার পর তার খুব নাম-ডাক হয়েছে।

সত্যিই কলেটের মুখের ভাব দেখেই বুঝতে পারছিল ক্যাম্পবেল্ তার খুব ভয় হয়েছে। ফ্রেঞ্চরা মুর্শিদাবাদের নবাবের ফ্রেণ্ড, তারা যদি চেষ্টা করে তো ফিরিঙ্গিদের হটিয়ে দিতে পারে কলকাতা থেকে।

—যাবে না?

—আমি ভাই যেতে পারবো না।

—কেন, কাশিমবাজারে তোমার কী?

—জায়গাটা আমার ভাল লেগে গেছে।

—কেন, কাশিমবাজারে ভাল লাগবার কী আছে?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে ক্যাম্পবেল্ বললে—এখানে অনেক ডাক্তারি-ওষুধ আছে, এখানে অত পলিটিক্স নেই কলকাতার মতন। কলকাতায় কেবল কে কার সর্বনাশ করবে তারই ষড়যন্ত্র চলছে দিন রাত।

তারপর হঠাৎ বললে—একটা কাজ করতে পারবে কলকাতায় গিয়ে?

—কী?

—মিস্টার উমিচাঁদের সঙ্গে তোমার দেখা হবে?

কলেট বললে—দেখা হবেই, সে-ই তো এই সব কন্‌স্‌পিরেসি চালাচ্ছে। সে নবাবেরও ফ্রেন্‌ড্ আবার আমাদেরও ফ্রেন্‌ড্। সে নবাবের সব মুভমেণ্ট্ আমাদের জানাচ্ছে।

—তাহলে এক কাজ কোর, তাকে বলে দিও সেই কাবুলি-ক্যাট্ আর দরকার হবে না।

—কেন? গুলজারি বাঈ ভালো হয়ে গেছে?

—না, ভালো হয়ে যায় নি, কিন্তু তার আর দরকার নেই।

—দরকার নেই কেন? সেদিন যে চেহেল-সুতুনে গেলে? সে কাকে দেখতে—

—সে গুলজারি বাঈ নয়, মুমতাজ বেগমকে দেখতে।

—মুমতাজ বেগম? সে আবার কে?

—সে গুলজারি বাঈয়ের কেয়ার-টেকার।

—কী অসুখ তার?

—অসুখ নয়। অসুখের নাম করে সে আমাকে প্রায়ই ডেকে পাঠায়।

—তার মানে?

—তুমি কাউকে বোল না কলেট, সে আমাকে ভালবাসে—সি লাভস্ মি—

—হোয়াট্ ডু ইউ মীন? চম্‌কে উঠেছে কলেট।

—ইয়েস, আই মীন হোয়াট আই সে—

—আর তুমি? তুমিও তাকে ভালবাস নাকি?

—ইয়েস আই ডু—

কলেট চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, কিন্তু কথাটা শুনেই আবার বসে পড়লো।

বললে—সত্যি?

—হ্যাঁ সত্যি—

কলেট বললে—তুমি খুব অন্যায় করেছ বেল্। ইট্ ইজ্ অ্যান অফেন্স, এ ক্রাইম। তুমি ইউরোপীয়ান, আর সে একজন ইণ্ডিয়ান। শুধু তাই নয়, সে নবাবের প্রপার্টি। তাকে নিয়ে ইলোপ করলে তোমারই শুধু ফাঁসি হবে তাই নয়, আমাদের কোম্পানীরও ক্ষতি হবে—কোম্পানীকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে।

ক্যাম্পবেল্ চুপ করে রইল।

—আমি রিকোয়েস্ট্ করছি তুমি আর চেহেল-সুতুনে যেও না। ডোন্ট্ গো দেয়ার।

ক্যাম্পবেল্ মাথা নিচু করে রইল।

—আর, যদি তুমি যেতে চাও তাহলে আমার এখানে আর তোমার থাকা চলবে না। কোম্পানী যদি জানতে পারে তো তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলবে, আমি হাজার চেষ্টা করলেও তোমাকে এখানে রাখতে পারবো না।

ক্যাম্পবেল্ তখনও মাথা নিচু করে রয়েছে।

কলেট বললে—কী হলো, যাবে? উত্তর দাও—

ক্যাম্পবেল্ কিছুই উত্তর দিলে না। তখনও ঠিক তেমনি করে চুপ করে রইল।

কলেট সেই দিনই চলে গেল কলকাতায়।

কলেট নেই, কেউ নেই, সমস্ত কুঠি-বাড়িটা সেদিন বড় ফাঁকা মনে হলো ক্যাম্পবেলের কাছে। কাশিম-বাজারের আকাশে সেদিনও অনেক তারা উঠলো, অনেক ভাবনা পাখা মেলে আকাশে উড়তে লাগলো। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন বড় সুন্দর হয়ে উঠলো ক্যাম্পবেলের চোখের সামনে।

—সাহেব, সাহেব—ইয়াসিনের গলা! ইয়াসিনের সঙ্গে আর তখন কথা বলতে ইচ্ছে হলো না সাহেবের। ডাকুক! সে সাড়া দেবে না আর। অনেক দিনের সঙ্গী ইয়াসিন। অনেক আড্ডার শরিক সে।

কুঠির দরোয়ান বললে—কে?

ইয়াসিন জিজ্ঞেস করলে—সাহেব আছে, বেল্ সাহেব?

দারোয়ান বললে—সায়েব ঘুমিয়ে পড়েছে—

—এত সকাল সকাল শুয়ে পড়েছে?

—জী হাঁ।

—আর কলেট সাহেব?

—কলেট সাহেব কলকাতায় চলে গেছে—

ইয়াসিন অগত্যা ফিরে গেল। সাহেবের কানে সব কথা পৌঁছুল। কিন্তু তবু উঠলো না, তবু নড়লো না বিছানা থেকে। মনে হলো সবাই মিলে যেন মুমতাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করেছে। সবাই তার শত্রু, তারও শত্রু।

কিন্তু ইয়াসিন অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। সাড়া না পেয়ে রাত্রে চলে গেল নিজের বাড়িতে।

বাড়িতে গিয়েও ঘুম হলো না তার। আবার বেরোল।

মেমুদকে ডাকলে। বললে—দেখ্, আমি মুর্শিদাবাদ যাচ্ছি, কাল ফিরবো।

মেমুদ বললে—ঠিক আছে হুজুর—

রাত্রের মুর্শিদাবাদ। কোতোয়াল হুকুম দিয়ে দিয়েছে সহরে কড়া পাহারা দিতে হবে। দিন-কাল ভাল নয়। যে-কোনও মুহূর্তে ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে হামলা করতে রওনা হতে পারে নবাব।

রাস্তায় যে যায় তাকে খাড়া করে দেয়। জিজ্ঞেস করে—কে?

তারপর নাম-ধাম-কুলুজী জেনে নিয়ে ছেড়ে দেয়। সন্দেহ হলেই রাতটার মত কোতোয়ালিতে আটক করে রাখে। বড় হুঁশিয়ার হয়ে আছে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলা মুলুক। সে সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। এখানে নবাব কম-বয়েসী বলে তোমরা ওঁৎ পেতে আছো কখন মসনদ কেড়ে নেবে, কখন নবাবকে খুন করে মতিঝিল দখল করবে।

কিন্তু চারদিকে ফিরিঙ্গিদের চরও ঘুরছে, তারাও ওঁৎ পেতে আছে সব জায়গায়। কেউ হেকিম সেজে, কেউ ফকির সেজে পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—সফিউল্লা সাহেব?

সফিউল্লা সাহেব এমনিতেই বাড়ি থাকে না। বাড়ি থাকলে চলেও না সফিউল্লা সাহেবের। নবাবের দিন-কাল খারাপ চলেছে এখন। ইয়ার-বক্সীদের পাশে থাকা চাই। মেহেদী নেশার, সফিউল্লা, ইয়ার জান ওরাই হলো তার দিন-রাত্রির সঙ্গী। মতিঝিলের দরবারে যতক্ষণ না নবাব ঘুমিয়ে পড়ে ততক্ষণ তার পাশে থাকতে হয়।

তারপর যদি বাড়ির কথা মনে পড়ে তো তখন বাড়ি আসে। নইলে বাড়ি আসার দরকারও হয় না তাদের কারো।

সেদিনও অনেক রাত্রে বাড়ি এসেছিল সফিউল্লা সাহেব। হঠাৎ মনে হলো বাইরে কে যেন ডাকলে।

—কে?

জানালা দিয়ে সাড়া দিলে সফিউল্লা সাহেব।

—আমি সাহেব, আমি, ইয়াসিন, ইয়াসিন খাঁ—

—কৌন ইয়াসিন? কাঁহাকা ইয়াসিন?

—কাশিমবাজারের ইয়াসিন খাঁ মুহম্মদ।

—কী খবর ? এত রাত্তিরে ?

—খোদাবন্দের সঙ্গে মুলাকাত করতে এসেছে গরীব। একটা জরুরী কথা ছিল। জরুরী কথা শুনেই ঘুম ছুটে গেল সফিউল্লা সাহেবের। জরুরী খবর একটা পেলে নবাবকে তা দিয়ে খুশী করা যায়। যত ষড়যন্ত্রের খবর চারদিক থেকে আসছে সব মীর্জার শোনা চাই।

তাড়াতাড়ি বৈঠকখানার দরওয়াজা খুলে দিয়ে বাইরে এল সফিউল্লা সাহেব। বললে—এসো, দুনিয়ার হাল-চাল বাতাও—

—হাল-চাল বড়ি খারাপ জনাব। সব বরবাদ করে দিতে চায় ফিরিঙ্গি কোম্পানী।

—কী-রকম ? বোস বোস, আয়েস করে বোস। কুঠিওয়ালা সাহেব কোথায় ?

ইয়াসিন ততক্ষণে আয়েস করে চৌকির ওপর বসেছে।

বললে—সেই খবর বলতেই তো এসেছি জনাব। ভাবলাম রাতে-রাতে আসাই ভালো। চারিদিকে যেমন ফিরিঙ্গিদের চর ঘুরছে দিন-রাত, কেউ আবার দেখে ফেলতে পারে।

—বলো, কী খবর ? জবর খবর তো ?

ইয়াসিন বললে—কুঠিওয়ালা কলেট সাহেব কলকাতায় গেছে—

—কেন ?

—মনে হচ্ছে উমিচাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে। ফিরিঙ্গিরা শায়েদ মুর্শিদাবাদে হামলা করতে পারে।

সফিউল্লা বললে—কী যে বেওকুফের মত কথা বলো তুমি ইয়াসিন। চন্দননগরে ফ্রেঞ্চরা আছে কী করতে ? ফ্রেঞ্চরা তো নবাবের দোস্ত্।

—তা জানি না জনাব, লেকিন কলেট সাহেব কাশিমবাজারে নেই।

সফিউল্লাও ভাবতে লাগলো কলকাতায় চলে যাওয়ার পেছনে কলেট সাহেবের কী মতলোব থাকতে পারে।

ইয়াসিন বললে—আর একটা খবর হুজুর, ক্যাম্পবেল্ সাহেবকে মনে পড়ে ?

খুব মনে পড়ে—বললে সফিউল্লা। সেই শালা হেকিমটা ?

—জী হাঁ জনাব।

তারপর একটু থেমে বললে—জনাবের সব ইয়াদ আছে দেখছি। আর আমীর খুশরুর বিধবা বেগমকে ইয়াদ আছে ? সেই মুমতাজ

বেগম ?

—খুব মনে আছে ইয়ার। মনে আবার নেই ?

—সেই তারই খবর বলছি। ক্যাম্পবেল্ সাহেব তো হেকিমি করতে গিয়েছিল চেহেল-সুতুনে। জানেন তো ? সে খবর তো আপনাকে বলেছি।

—হ্যাঁ, সে তো নানীবেগমসাহেবার বিল্লি গুলজারি বাঈএর বেমারের জন্যে।

ইয়াসিন বললে—নেহি হুজুর, বেমারের বাত পুরো ধাপ্পা।

—ধাপ্পা ?

—জী হাঁ জনাব। আস্‌লি বাত হচ্ছে মুমতাজ বাঈ। তাকে সাহেব পেয়ার করতে আরম্ভ করেছে। সাহেবের দিল বিগড়ে গেছে তার জন্যে।

—কৌন্ কহা তুমকো ?

—কলেট সাহেব।

—সাচ বাত ?

—জী হাঁ জনাব, একদম আসলি সাচ বাত।

সফিউল্লা সাহেব কথাটা শুনে কী যেন ভাবলে আপন মনে। তারপর বাড়ির ভেতরে গেল। সেখান থেকে যখন ফিরলো তখন তার হাতে এক মুঠো মোহর।

ইয়াসিনের দিকে মোহরগুলো এগিয়ে দিয়ে বললে—এগুলো নাও, পিছে ঔর মিলে গা। আরো জবর খবর দিয়ে যেও, আমার আরো খবর চাই—

ইয়াসিন মোহরগুলো নিজের কুর্তার পকেটে পুরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে—তকলিফ্, মাপ করবেন জনাব, জরুরী খবর বলেই এত রাতে জনাবের ঘুম ভাঙিয়ে তক্‌লিফ্ দিলুম।

তারপর আর দাঁড়ালো না সেখানে। মুর্শিদাবাদের রাস্তায় পড়ে টাকাগুলো পকেট থেকে বার করলে। গুণতে লাগলো এক-এক করে। কত দিলে জনাব।—এক-দো-তিন-চার···

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আবার যথারীতি ডাক পেয়ে ক্যাম্পবেল্ এসেছে চেহেল-সুতুনে।

মুমতাজের তখনও বেমার সারেনি। বেমার হলেই সুবিধে বেশি।

বেমার হলেই ফিরিঙ্গি হেকিম সাহেবকে ঘন-ঘন ডাকা যায়। বেমার মহলে থাকলেই একটু নিরিবিলি কথা বলা যায় হেকিম সাহেবের সঙ্গে—

সেদিন সব ঠিক-ঠাক বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। অনেক মোহর, অনেক জেবর, অনেক সোনা-চাঁদি একটা পুটলিতে বেঁধে কাছে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। সাহেব এলেই তার হাতে সব তাকে দিয়ে দেবে।

ক্যাম্পবেল্ কিন্তু এর জন্যে তৈরি ছিল না।

বললে—এ সব কী হবে ?

মুমতাজ বললে—তোমার টাকা-কড়ি নেই বলছিলে, তাই তোমাকে দিলাম। আমাদের সংসার চালাতে তো অনেক টাকা খরচ হবে—

—আমাদের সংসার মানে ?

মুমতাজ হাসলো।

বললে—বারে, তুমি সত্যিই একটি বোকা। যখন তোমার সঙ্গে আমার সাদি হবে তখন সংসার করতে টাকা খরচ হবে না ?

—তুমি আমাকে সাদি করবে ?

—এত কথার পর তুমি এই কথা বলছো ? সাদি না করে কি তোমার রাখেল্ হয়ে থাকবো ? আমি যে তোমার বিবি হতে চাই।

ক্যাম্পবেল্ সাহেব এবার ভয় পেয়ে গেল। বললে—কিন্তু এ যে অনেক টাকা !

মুমতাজ বললে—অনেক টাকা না হলে তুমি দেশে ফিরে যাবে কী করে ? জাহাজ-ভাড়ার টাকা লাগবে না ? বাকি টাকা দিয়ে তুমি একটা জাহাজ কিনবে

—জাহাজ কিনে কী করবো ?

তারপরের কথা ভাবতেও যেন ভয় করছিল ক্যাম্পবেলের। মুমতাজের সামনে বসেই থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো সে। এ ব্যাপার যে ঘটবে তা তো কল্পনাও করে নি সে।

মুমতাজ বললে—তুমি তোমার জাহাজ নিয়ে ডাকাতি করবে সেই জাহাজে। পারবে না ? হজ্ যাত্রীর জাহাজ আটক করতে পারবে না ?

—তুমি বলছো কী ?

মুমতাজ এবার উঠে বসলো। আর যেন তার লজ্জা-সরমের বালাই রইলো না। বললে—তুমি যদি আপত্তি করো আমি এই চেহেল-সুতুনের মধ্যেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হবো।

ভয় পেয়ে ক্যাম্পবেল্ একটু পিছিয়ে আসবার চেষ্টা করলে।

—বলো, টাকা নেবে তুমি ?

একেবারে দুহাতে সাহেবের হাতটা চেপে ধরেছে মুমতাজ। —বলো, কথা বলো, উত্তর দাও।

—আমাকে দু'দিন ভাবতে দাও তুমি, দুটো দিন একটু সবুর করো! আমার বন্ধু কলেটকে জিজ্ঞেস করি, আর এক বন্ধু আছে ইয়াসিন, তাকেও জিজ্ঞেস করতে হবে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

—খবরদার! বলে মুমতাজ সাহেবের মুখটা চেপে ধরলে।

—তোমার কি কিচ্ছু বুদ্ধি নেই? এসব কথা কি কাউকে বলতে আছে? এসব ব্যাপারে কি কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়? চেহেল-সুতুনের খবর কি বাইরের কাউকে দিতে আছে? তাতে যে তুমিও খুন হয়ে যাবে, আমাকেও ওরা খুন করে ফেলবে!

—কিন্তু আমাকে একটু ভাবতে সময় দেবে তো!

—ভাববার যে আর সময় নেই।

—দুটো দিন, দু'দিনের মধ্যেই আমি তোমায় জানিয়ে দেব।

—কিন্তু তুমি জানো না, আমি কী বিপদে পড়েছি—

—কী বিপদ?

মুমতাজ বললে—সফিউল্লা খাঁ খবর পেয়ে গেছে—

—কীসের খবর? কে সফিউল্লা খাঁ?

—নবাবের দোস্ত্, খবর পেয়েছে যে আমি হজ করতে যাবার চেষ্টা করছি, নানীবেগমসাহেবাকে বলেছি, তিনিও রাজি হয়েছেন।

ক্যাম্পবেল্ বড়ো মুশকিলে পড়লো। বললে—কিন্তু আমি যে জাহাজ কিনবো, জাহাজের যে আমি কিছুই জানি না।

—তুমি ফিরিঙ্গি, তার ওপর পুরুষমানুষ, তুমি একটা জাহাজও কিনতে পারবে না?

—আমি যে কখনো জাহাজ কিনিনি, জাহাজে চলে হিন্দুস্থানে এসেছি শুধু—আর ডাকাতি কী করে করবো তাও বুঝতে পারছি না!

—তা হোক তুমি এগুলো নাও, এ তোমাকে নিতেই হবে।

—আর দুটো দিনও সময় দেবে না?

—দুটো দিন সময় দিলে, টাকাগুলো সব সফিউল্লা খাঁ খেয়ে ফেলবে —আমি তার ভয়েই বেমার-মহলে পড়ে আছি অসুখের ভান করে।

—তাহলে ঠিক আছে, তুমি দিচ্ছ তাই নিচ্ছি—বলে পুঁটলিটা

নিলে নিজের কাছে।

মুমতাজ বললে—আমি খোজা সর্দার পীরালী খাঁকে দিয়ে খবর দেব কবে আমি হজে যাচ্ছি, কোন তারিখে জাহাজ মুর্শিদাবাদ থেকে ছাড়ছে—

—তুমি একলা হজে যাবে ?

মুমতাজ বললে—না, নানীবেগমসাহেবাকেও রাজি করিয়েছি, নানীজীও সঙ্গে যাবে।

—ঠিক আছে, আজ তাহলে আমি উঠি—

—তোমাকে আমার ছাড়তে ইচ্ছে করছে না সাহেব, তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে আর পারছি না। তাহলে তোমাকে আমি খবর দেব, বুঝলে ? তুমি ওই টাকা নিয়ে একটা জাহাজ কিনে ফেলবার চেষ্টা করো। ও আমার নিজের টাকা, এ টাকা তুমি তোমার টাকা বলেই মনে করো। বলে সাহেবের সঙ্গে বেমার-মহলের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল।

সাহেব পেছন ফিরে বললে—সেলাম আলাইকুম—

মুমতাজ হাসলো। বড় করুণ সে হাসি। কিন্তু সেলাম করতে ভুলে গেল সে।

তাঞ্জামটা দাঁড়িয়েছিল। সাহেবকে নিয়ে আবার চলতে লাগলো চেহেল-সুতুনকে পেরিয়ে বাইরের দিকে।

বাঙলা-মুলুকের সে এক বড় দুর্দিন। মুর্শিদাবাদের মানুষ অস্থির হয়ে দিন কাটায়। এক-একদিন এক-এক রকম গুজব রটে। এক-একদিন রটে ফিরিঙ্গিরা মুর্শিদাবাদে হামলা করতে আসছে। আবার এক-একদিন রটে যায়—নবাব কলকাতায় যাচ্ছে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই করতে—

ভয়ে-ভয়ে কাটে দিন, ভয়ে-ভয়ে কাটে রাত। নবাব আলিবর্দী মারা যাওয়ার পর থেকেই যেন সব ওলোট-পালোট হয়ে গেছে।

হঠাৎ কোনও কোনও দিন মাঝ-রাতে হৈ-হৈ আওয়াজ ওঠে ফৌজী-সেপাইদের ছাউনীতে। লোকের ভয়ে আঁৎকে ওঠে—ওই বুঝি ফিরিঙ্গিরা এল।

বাপেরা মেয়েদের ডাকে—ওরে, ওঠ্ ওঠ্—

ছেলে-মেয়ে-বউ সবাই ঘুম ভেঙে উঠে থর-থর করে কাঁপতে

থাকে। আবার হয়ত সেই বর্গীদের আসার মত ঘর-বাড়ি সব ছেড়ে-ছুড়ে পালাতে হবে।

সফিউল্লা, মেহেদী নেশার, ইয়ারজান ওদের অত ভয় করে চলাফেরা করতে হয় না। মাঝ-রাতেও ওরা বুক ফুলিয়ে হাঁটে।

সেদিন নানীবেগমসাহেবার দরবারে খোজা-সর্দার পীরালি খাঁ গিয়ে দাঁড়ালো।

—কৌন?

—পীরালি খাঁ নানীসাহেবা—

—সফিউল্লা সাহেব এসেছে?

—জী হাঁ—

নানীবেগমসাহেবা উঠলো। তারপর আস্তে আস্তে দরবার-মহলের দিকে চলতে লাগলো। সফিউল্লা সাহেব ক'দিন থেকেই এত্তেলা পাঠাচ্ছিল।

—বন্দেগী নানীবেগমসাহেবা।

—কী খবর সফিউল্লা?

—আমি নানীবেগমসাহেবার কাছে অনেকবার দরবার করেছি, এবার একটা খবর দিতে এসেছি।

—কীসের খবর বলো?

—মুমতাজ বেগমের খবর।

নানীজী বললে—তা সে তো মীর্জার কাছেই বলতে পারতে বাবা তুমি। আমার কাছে কেন? আমি তো আর কিছু দেখি না এখন।

—মীর্জা মামুদ এখন খুব ব্যস্ত নানীজী, তাই আপনার কাছে দরবার করতে এসেছি।

—কী দরবার বলো?

—আপনি কি মক্কায় হজ্ করতে যাবেন নানীবেগমসাহেবা?

—কে বললে?

—আমি সব শুনেছি, আপনার সঙ্গেই মুমতাজ বাঈও যাচ্ছে তো?

নানীজী বললে—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কী করে জানলে?

সফিউল্লা বললে—আমায় কাশিমবাজার কুঠির চর ইয়াসিন খাঁ সব বলেছে।

—কিন্তু হজ্ করতে যাওয়া কি অন্যায়?

—অন্যায় নয় নানীজী। কিন্তু শুনলুম মুমতাজ বাঈ অন্য মতলোব

করেছে।

—কী মতলোব ?

—কাশিমবাজার কুঠির ফিরিঙ্গি-হেকিম ক্যাম্পবেল্ সাহেবকে সব টাকা দিয়ে দিয়েছে জাহাজ কেনবার জন্যে।

—জাহাজ কিনবে কেন ? জাহাজ কিনে কী হবে ?

—ডাকাতি করে মুমতাজ বাঈকে নিয়ে পালাবে। সাদি করবে—

নানীবেগমসাহেবা যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

বললে—সব সত্যি কথা ?

—হ্যাঁ, সব ঠিক।

—সব ইয়াসিন খাঁ বলেছে ?

—জী হাঁ, আমাদের সরকারী চর, কাশিমবাজারের ইয়াসিন খাঁ।

নানীবেগমসাহেবা বললে—তাকে ডেকে আনতে পারো ?

—জী হাঁ, সে তো সদরেই দাঁড়িয়ে আছে—

—ডাকো তাকে।

সফিউল্লা খাঁ তাকে ডাকতে গেল চেহেল-সুতুনের বাইরে।

কিন্তু কোথা থেকে যে কী কাণ্ড হয়ে গেল তা মুমতাজও জানতে পারলে না, কাশিমবাজার কুঠির ক্যাম্পবেল্ সাহেবও জানতে পারলে না।

একটা জাহাজ। একটা জাহাজ কেনবার জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগলো সাহেব।

কলেট বললে—জাহাজ কিনে কী করবে তুমি ? এত জিনিস থাকতে জাহাজ ?

ইয়াসিনকেও বলেছিল জাহাজের কথা। ইয়াসিনও প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

—জাহাজ ? জাহাজ কিনে তুমি কী করবে সাহেব ? এত জিনিস থাকতে জাহাজ ? ডাকাতি করতে বেরোবে নাকি ? ডাক্তারি ছেড়ে ডাকাতির পেশা ধরবে ?

ক্যাম্পবেল্ বলেছিল—না, জাহাজ আমার চাই।

শেষে জাহাজের খোঁজে কলকাতায় চলে গেল একদিন। কলকাতায় পৌঁছে একেবারে উমিচাঁদ সাহেবের বাড়ি। উমিচাঁদ দেখে অবাক।

—তুমি ? এ্যাদ্দিন কী করছিলে ? কোথায় ছিলে ?

ক্যাম্পবেল্ বললে—আমায় একটা জাহাজ কিনে দিতে পারো

উমিচাঁদ সাহেব ?

—জাহাজ ? জাহাজের কথা শুনে উমিচাঁদ অবাক হয়ে গেল।

বললে—জাহাজ কিনে কী করবে তুমি ? ডাক্তারি ছেড়ে তুমি ডাকাতি করবে নাকি ?

—না উমিচাঁদ সাহেব, জাহাজ আমার একটা জরুরী দরকার। যত টাকা লাগে আমি দেব, আমার কাছে অনেক টাকা আছে, টাকার অভাব আমার নেই। এই দেখ—

বলে পোঁটলাটা উমিচাঁদের চোখের সামনে খুলে ফেললে।

—এ কী, এত মোহর, এত গয়না ? এসব কার ? কোত্থেকে পেলে ?

ক্যাম্পবেল্ বললে—সে-সব কাউকে বোলবো না, এ এখন আমার প্রপার্টি, এ টাকা দিয়ে আমাকে একটা জাহাজ কিনে দাও—

উমিচাঁদ বললে—কিন্তু জাহাজের তো অনেক দাম—

—কত দাম ?

উমিচাঁদ বুঝতে পারলে সাহেব কোথাও মজেছে।

বললে—তোমার সেই কাবুলি-ক্যাট্ আর কিনবে না ?

—না, এখন জাহাজ কিনবো, ক্যাটের আর দরকার নেই।

—ঠিক আছে, তুমি আমার কাছে টাকাগুলো রেখে যাও, যা দাম লাগে রেখে, বাকিটা তোমাকে ফেরত দেব—

সাহেব উঠলো। তখনি আবার ফিরে যেতে হবে কাশিমবাজারে। বললে—গুড্ বাই—গুড্ বাই—

উমিচাঁদ তখন গয়নার পুঁটলিটা বেঁধে নিয়েছে। বললে—আর একটু বসবে না ? ভাল ড্রিঙ্ক ছিল আজ—

সাহেব তখন উঠে পড়েছে। বললে—না সাহেব, আমার আর সময় নেই, হয়ত চেহেল-সুতুন থেকে আবার ডাক আসবে—

—গুলজারি বাঈএর বেমার সেরেছে ?

ক্যাম্পবেল্ যেতে যেতে পেছন ফিরে বললে, না—

উমিচাঁদ তখন সকলের আড়ালে নিজের ঘরে ঢুকেছে। অন্ধকার ঘরে আলোটা নিজের হাতেই জ্বাললে। তারপর সিন্ধুকটা খুললে।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকলে।

—কে ?

—আমি জগমোহন হুজুর।

তাড়াতাড়ি সিন্ধুকটা আবার বন্ধ করে দরজা খুলে বাইরে আসতেই

দেখে জগ্‌মোহন দাঁড়িয়ে আছে।

—হুঁজুর, সেই ফিরিঙ্গি হেকিম-সাহেব আবার এসেছে—

—ফিরিঙ্গি হেকিম সাহেব?

বাইরে আসতেই দেখে ক্যাম্পবেল্‌ সাহেব দাঁড়িয়ে আছে।

—কী খবর?

ক্যাম্পবেল্‌ হাঁফাতে হাঁফাতে বললে—সাহেব, নবাব আসছে কোম্পানীর সঙ্গে লড়াই করতে—

—সে কী?

সাহেব বললে—রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম কলকাতা থেকে সব লোক পালাচ্ছে, নবাবের ফৌজ আসছে কলকাতার কেল্লার দিকে, হালসীবাগানের দিকে আসছে—

উমিচাঁদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। বললে—আচ্ছা তুমি ভেতরে এসো, দেখি কী করতে পারি!

ক্যাম্পবেল সাহেব বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। আর ওদিক থেকে নবাবের ফৌজ ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে কলকাতার দিকে।

চেহেল-সুতুনের ভেতরে তখন আর এক উৎসব চলেছে। সফিউল্লা সাহেব বর সেজে এসেছে। চেহেল-সুতুনের ভেতরেই সাদির বন্দোবস্ত করেছে নানীবেগমসাহেবা।

মৌলভী হাজির।

মুমতাজ বাঈ নিজের মহলে তখন সাজছে। সাজতেই তার সময় লাগছে অনেকক্ষণ।

আজ বেগমদেরও উৎসব। নহবৎখানায় লগনের রাগ বাজাচ্ছে নহবতিয়া। পেশমন বেগম, ববব্‌ বেগম, লুৎফা বেগম সবাই সেজেছে মুমতাজ বেগমের সাদির জন্যে। আবার অনেকদিন পরে একটা উৎসব অনুষ্ঠান হচ্ছে চেহেল-সুতুনে।

খোজা-সর্দার পীরালি খাঁর কাজের আর শেষ নেই।

মৌলভী সাহেব আবার তাগাদা দিলে—কই, কাঁহা, নয়ি বিবি কাঁহা—

নানীবেগমসাহেবা জুবেদাকে তাগাদা দিলে। বললে—ওরে, মুমতাজকে ডেকে নিয়ে আয়, এত দেরি করছে কেন সাজতে?

সফিউল্লা, মেহেদী নেশার, ইয়ারজান, তারাও এসেছে। সফিউল্লা

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে মুমতাজের জন্যে।

হঠাৎ জুবেদা এসে খবর দিলে—নানীজী সর্বনাশ হয়ে গেছে—

—কী সর্বনাশ রে?

—মুমতাজ বাঈ জহর খেয়েছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের বাঙলা-মুলুকের একটা মেয়ের জীবন শেষ হয়ে গেল নিঃশব্দে। একদিন কোন্ দূর থেকে একটা ছেলে ঘুরতে ঘুরতে এদেশে এসে পড়েছিল। কোথায়ই বা রইল সে, আর কোথায়ই বা রইল সেই মুমতাজ বাঈ। সামান্য গুলজারি বাঈকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী সুরু হয়েছিল তা সেই মর্মান্তিক পরিণতিতেই বুঝি সমাধি-লাভ করলো।

যখন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার আক্রমণে ফিরিঙ্গি-ফৌজ কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে, যখন উমিচাঁদের বাড়িটাও আগুন লেগে দাউ-দাউ করে জ্বলছে, তখন কেউ জানতে পারলো না আর একজনের দাবদাহর যন্ত্রণা। সে মুমতাজ বাঈ। মুমতাজ বাঈ ততক্ষণে সমস্ত যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে উঠে শান্তির সন্ধান পেয়েছে। ইতিহাসে তাই মুমতাজ বাঈএর নাম কেউ লিখে যায় নি। ক্যাম্পবেল্ সাহেবের নামেরও উল্লেখ করেনি। এমন কি যাকে উপলক্ষ্য করে এই কাহিনী গড়ে উঠেছে, সেই গুলজারি বাঈএরও উল্লেখ নেই কোথাও। চেহেল-সুতুনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্মৃতিও সকলের মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছে।

—:*:—